আফগানিস্তান ও তালিবান

এ.জেড.এম.শামসুল আলম

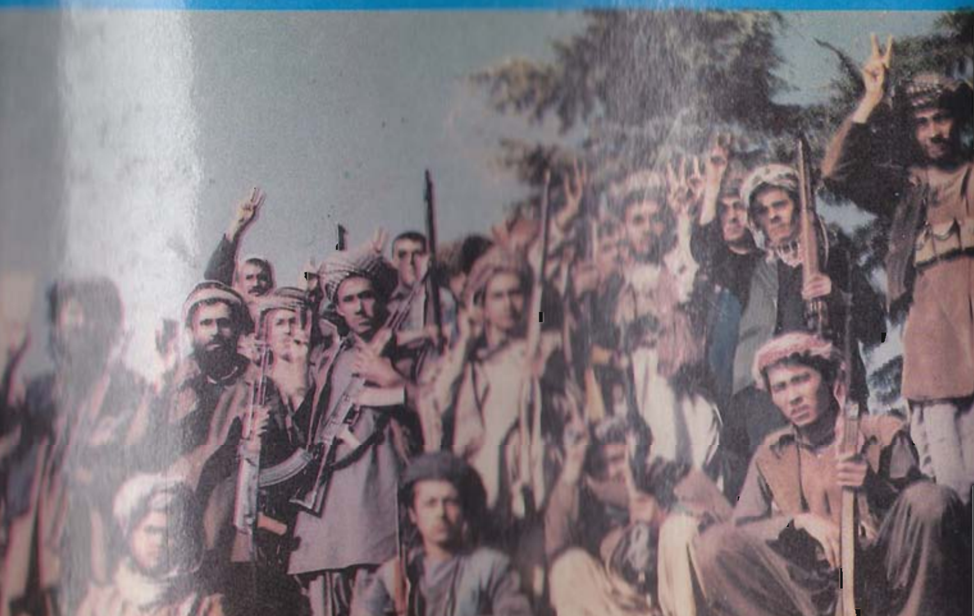

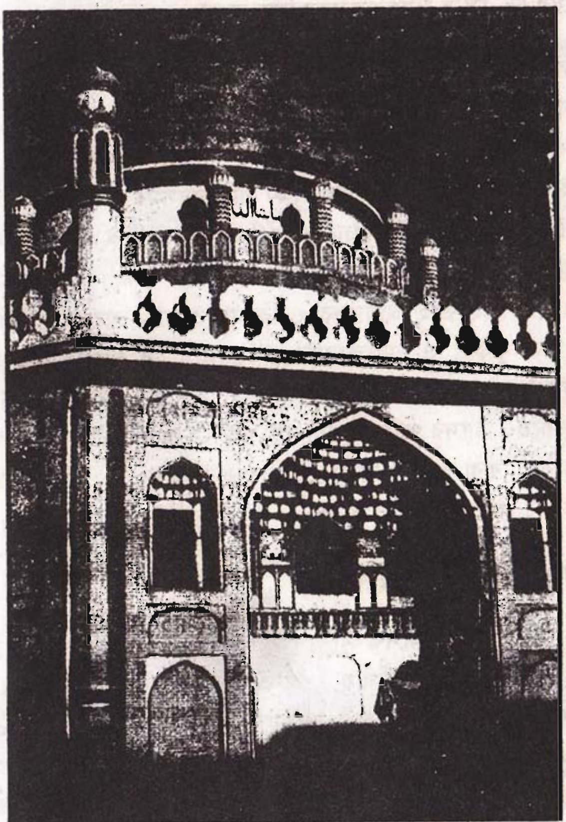

আহমদ শাহ আবদালীর মাজার

আহমদশাহ আবদালী

১৭৬১ সালের ১৪ই জানুয়ারী প্রায় একলক্ষ সৈন্য নিয়ে আহমদ শাহ আবদালী ঐতিহাসিক পানিপথের প্রান্তরে সম্মিলিত মারাঠা শক্তির মোকাবেলা করেন। মারাঠারা সাধারণতঃ সম্মুখ সমর পরিহার করে গেরিলা পদ্ধতিতে বিভিন্ন মুখী আক্রমণ পরিচালনা করেন। কিন্তু এ যুদ্ধে মারাঠা কনফেডারেন্সি তাদের বিজয় সম্বন্ধে এত নিশ্চিত ছিলেন যে, তারা নিয়মিত সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হন। দিল্লী হতে ৩০ মাইল উত্তরে ঐতিহাসিক পানিপথ প্রান্তরে আহমদ শাহ আবদালী সম্মিলিত মারাঠা শক্তিকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে দেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভি, সি'র সাক্ষাৎকারের কিছু অংশ

আল্ হামদু লিল্লাহ। আমাদের প্রচুর স্কুল কলেজ মাদ্রাসা বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। আমাদের বর্তমান শিক্ষা নীতির মূল কথা হচ্ছে ইসলাম ও আধুনিক বিজ্ঞানের সমন্বয়। আমাদের ইসলামী সরকার দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে অত্যন্ত গুরুত্ব দিচ্ছে। আগামী কিছু দিনের মধ্যেই ইনশা আল্লাহ আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে এমন সকল ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, পদার্থ বিজ্ঞানী, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক বের হবেন যারা সাথে সাথে আলেমে দ্বীন ও হবেন। আমরা সে চেষ্টাই চালিয়ে যাচ্ছি। বিজ্ঞানের সাথে যেহেতু ইসলামের সংঘাত নেই তাই আমাদের ও বিজ্ঞানের সাথে শত্রুতা থাকার কথা নয়। আমাদের সংঘাত কুফরী ও নাস্তিক্যবাদী আকিদাসমূহের সাথে। বর্তমানে প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন হাজার ছাত্রকে এবং সকল মাদ্রাসা ছাত্রদের জন্য ফ্রি শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাদের থাকা খাওয়া বই-খাতা সবই বায়তুল মালআলে ইসলামীর পক্ষ থেকে ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আমি যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভি, সি, এতে সাড়ে চার হাজার ছাত্রকে সব ফ্রি দেওয়া হয়ে থাকে।

সাবেক সামরিক অফিসারের কিছু কথা

অতীতে সেনা অফিসারদের অনেক সুযোগ সুবিধা ছিলো। প্রকৃতপক্ষে শাসকরা যখন সাধারণ মানুষের উপর আস্থা হারায়, তখনই সেনাবাহিনীর উপর নির্ভরশীল হয়। তালেবান সরকার অফিসারদের বিলাসী সুযোগ-সুবিধা বন্ধ করে সাধরণ মানুষের জন্য সার্ভিস উন্নত করেছে। সরকার মানুষের জান-মাল, ইজ্জত, শিক্ষা ও চিকিৎসার দায়িত্ব হাতে নিয়েছে। সরকারী নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে জিনিস পত্রের মূল্য বৃদ্ধি হ্রাস করা হয়েছে। চুরি, ডাকাতি, ঘুষ, সুদ ইত্যাদি বন্ধ হয়ে গেছে। যদি কেউ অন্যায়ও করে তবে তার প্রকাশ্য শাস্তির বিধান রয়েছে। এ কারণে দেশ থেকে অন্যায় ও অপরাধ দূর হয়ে গেছে। আমার বিশ্বাস যদি দশ বছর দেশটি এমনি করে চলে, তবে আফগানিস্তান এশিয়ার মধ্যে একটি উন্নত দেশ হয়ে যাবে। সব চাইতে বড় কথা তালেবান সরকারের কোন ঋণ নেই।

আফগানিস্তানের অতীত ইতিহাস ও বর্তমান প্রেক্ষাপট

আফগানিস্তান ও তালিবান

এ. জেড. এম. শামসুল আলম

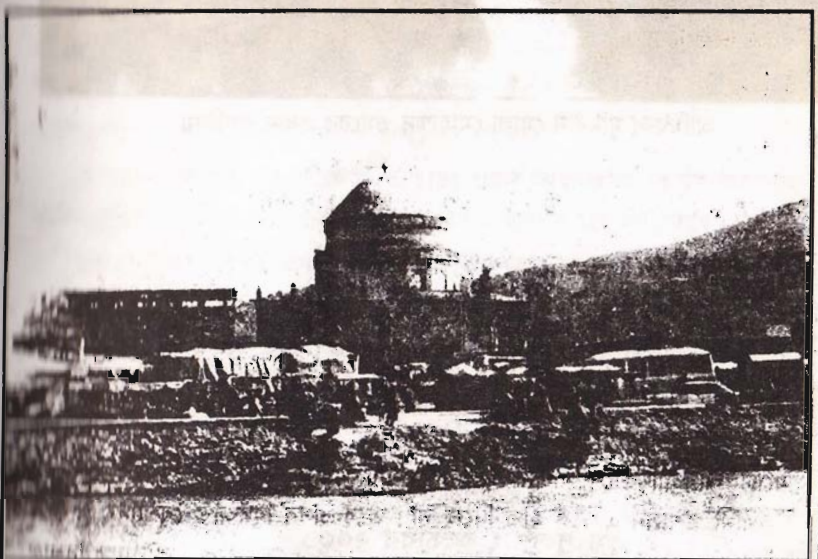

দরিয়ায়ে কাবুল তীরে কাবুল বাজার

১২/১৩ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা—১১০০

ভূমিকা

'আফগানিস্তান ও তালিবান' শীর্ষক পুস্তকটি আফগানিস্তান এবং তালিবান সংক্রান্ত তথ্যের একটি সংকলন। এ তথ্যবহুল পুস্তকটি আফগানিস্তান এবং তালিবানদের সম্বন্ধে বস্তুনিষ্ঠ ধারণা লাভে এবং উন্নততর প্রবন্ধ রচনায় সহায়ক হতে পারে। এ পুস্তকের প্রথম সংস্করণ 'আফগান তালিবান' নামে প্রকাশিত হয়েছিল। দু'মাসের মধ্যেই পুস্তকটি শেষ হয়ে যায়। মুহাম্মদ সালেহ উদদীনের বিশেষ অনুরোধে বেশ কয়েকটি নতুন প্রবন্ধ তৃতীয় সংস্করণে যোগ করে দেয়া হলো।

তালিবানদের জন্য আমাদের অনেকের দরদ এবং অনুভূতি অতি গভীর। কিন্তু তথ্যের অভাবে তাদের সম্পর্কে বা সমর্থনে কোন অভিমত প্রকাশ করা কঠিন। অন্য দিকে পাশ্চাত্য দুনিয়ায়, এমনকি মুসলিম বিশ্বের বহু চিন্তাবিদ ও নন্দিত রাজনৈতিক তালিবানদের সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য প্রকাশ করে থাকেন।

আমাদের দেশের পত্র-পত্রিকায় পাশ্চাত্য প্রচার মাধ্যমগুলো কর্তৃক সরবরাহকৃত তালিবানবিরোধী মিথ্যা খবর প্রকাশ করা অনেকটা ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সংবাদপত্রে থাকে সংবাদের সমাহার। সংবাদপত্র ছাড়া অন্য কোন প্রকাশনায় তত বেশি খবর বা সংবাদের আধিক্য দেখা যায় না। এক অর্থে বলা যায়, সাংবাদিকতা হলো সংবাদের আধিক্য সংক্রান্ত পেশা।

আজকাল বহু সংবাদপত্রে ঘটনার সংবাদ যতটুকু থাকে, মিথ্যা থাকে তারচেয়ে বেশি। আর তা যদি ইসলাম বিরোধী হয়, তবে তো কথাই নেই। সাংবাদিকতাকে বহু সাংবাদিক আজকাল 'মিথ্যাধিকতায়' পরিণত করে ফেলেছেন।

মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছোট-বড় অসংখ্য ইসলামী রাজনৈতিক দল, সংস্থা এবং আন্দোলন রয়েছে। এ আন্দোলনগুলোর পিছনে বহু নিবেদিত প্রাণ নেতা-কর্মী, অনেক চিন্তাবিদ ও দার্শনিক যুগ যুগ ধরে সাধনা করে যাচ্ছেন। কেউ কারাবরণ করছেন এবং কেউ শাহাদতবরণ করেছেন। সুদান ও ইরান ভিন্ন অন্য কোথাও তারা সরকার গঠন করতে পারেননি।

আমাদের দেশে ইসলামী শিক্ষার জন্য প্রধান দু'ধরনের শিক্ষা কোর্স এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে। একটি হলো আলিয়া মাদ্রাসার সিলেবাস অনুসরণকারী মাদ্রাসা। অপর-টি দেওবন্দ মাদ্রাসার সিলেবাস অনুসরণকারী কওমী মাদ্রাসা। **আলিয়া নেসাব বা** সিলেবাসের প্রথম মাদ্রাসা 'কলিকাতা মাদ্রাসা' গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়ারেন হেস্টিং-এর নির্দেশে এবং ইংরেজ প্রিন্সিপালের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয় ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে।

আফগানিস্তানে আলিয়া নেসাবের মাদ্রাসা নেই। ফোরকানিয়া মক্তব এবং দেওবন্দ লাইনের উচ্চতর মাদ্রাসার মাঝামাঝি এক ধরনের মাদ্রাসা আফগানিস্তানে আছে। এগুলোকে বলা হয় কুরআনী মাদ্রাসা। কুরআনী মাদ্রাসার শিক্ষাকোর্সের মেয়াদ হলো ২২ মাস এবং তদূর্দ্ধ। তালিবানদের মধ্যে আছে দেওবন্দ লাইনের মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষক। বেশির ভাগ ছাত্র বা তালিবান হলো কুরআনী মাদ্রাসার তরুণ ছাত্র।

তালিবানরা নিজেরাই যে তরুণ তা নয়, তাদের আন্দোলনও সময়ের দিক থেকে কনিষ্ঠতম আফগান মুজাহিদ আন্দোলন। আমরা অনেকে আফগানিস্তানের কুরআনী মাদ্রাসাকে আমাদের দেশের ফোরকানিয়া মাদ্রাসার ন্যায় মাদ্রাসা বলে ভুল করে থাকি। ফোরকানিয়া মাদ্রাসা শিশুদের জন্য। আফগানিস্তানের কুরআনী মাদ্রাসা শিশুদের জন্য নয় বরং তরুণদের জন্য।

অনুন্নত দেশসমূহে ছাত্র আন্দোলন অতি প্রবল। এ আন্দোলনগুলোতে অংশ নিয়ে থাকেন পাশ্চাত্য ধারায় শিক্ষিত স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ। বাংলাদেশের ইতিহাস লিখতে হলে ১৯৫২ সনের ছাত্র আন্দোলনে যেতে হয়। ভাষা আন্দোলনের চেতনা বিকশিত না হলে বাংলা ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদী চেতনা এতো প্রবল হতো না এবং পরিণতিতে বাংলাদেশেরও সৃষ্টি হতো না।

মাদ্রাসার ছাত্ররা মুসলিম বিশ্বে এমন কোন বড় আন্দোলন করেছে বলে মনে হয় না, যার পরিণতিতে কোন দেশে ইসলামী সরকার কায়েম হয়েছে। ইসলামী আন্দোলনসমূহের নেতৃত্ব বর্তমানে বয়স্ক এবং মৃত্যুপথযাত্রী শ্রদ্ধাভাজন প্রবীণদের হাতে। বাংলাদেশে যুবকরা অন্যান্য আন্দোলনের নেতৃত্বের আসনে এসে গেছেন। কিন্তু ইসলামী আন্দোলনগুলো এখনও শ্রদ্ধেয় মুরুব্বী এবং প্রবীণদের করতলে।

সিন্ধু বিজয়কালে মুহাম্মদ বিন কাসিমের বয়স ছিল ১৭। সুলতান মাহমুদ এবং ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদবখতিয়ার খিলজীর বয়স অনেক হয়ে গিয়েছিল। তারা ১৭ বছর বয়সের তরুণ সিন্ধু বিজয়ী বীর মুহাম্মদ বিন কাসিমের স্মৃতি এবং বীরত্বের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ ১৭ সংখ্যাটি দিয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন।

সুলতান মাহমুদ ১৭ বার ভারত আক্রমণ করেছিলেন। ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বখতিয়ার খিলজী ১৬ জন ঘোড়সওয়ার নিয়ে নদীয়ায় লক্ষণ সেনের রাজধানী এবং প্রাসাদে প্রবেশ করেছিলেন। তালিবান আন্দোলনের নেতা মোল্লা মোহাম্মদ উমরের বয়স ৩৭ (জন্ম ১৯৬০ খৃঃ)।

আমাদের প্রাণপ্রিয় রাসূল (সাঃ)-এর জন্ম হয় ৫৭০ খৃষ্টাব্দে। তিনি ৪০ বছর বয়সে নবুয়ত পেয়ে ইসলামী আন্দোলন শুরু করেছিলেন। হযরত আবু বকর রাঃ (জন্ম ৫৭৩ খৃঃ), হযরত উমর রাঃ (জন্ম ৫৮৩ খৃঃ), হযরত উসমান রাঃ (জন্ম ৫৭৬ খৃঃ) হযরত আলী রাঃ (জন্ম ৬০০ খৃঃ) এবং অধিকাংশ মক্কী সাহাবী ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হতে বয়সে ছোট।

হযরত জায়েদ (রাঃ), খাব্বাব (রাঃ), সুহাইল (রাঃ) শুয়াইব (রাঃ), তালহা (রাঃ), আবদুর রহমান বিন আউফ (রাঃ), জুবাইর (রাঃ), সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রাঃ), আবু উবাইদা ইবনে জাররাহ (রাঃ) প্রমুখ সাহাবীবৃন্দ সকলেরই বয়স রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হতে কম ছিল।

বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন উম্মুল মোমেনীন বিবি খাদিজা (রাঃ)। তাঁর বয়স ছিল মহানবীর বয়স হতে ১৫ বছর বেশী। হযরত আব্বাস (রাঃ)-এর বয়স ছিল ৫ বছর বেশী। হযরত হামজা (রাঃ) ছিলেন রাসূলের দুধভাই এবং প্রায় সমবয়সী। হযরত আব্বাস (রাঃ) এবং আবু সুফিয়ান (রাঃ) বয়সে রাসূল (সাঃ) অপেক্ষা বড় হলেও ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন অনেক পরে।

আফগান তালিবানরা বিংশ শতাব্দীতে যতটুকু সফলতা অর্জন করেছেন, ইসলামের হাজার বছরের ইতিহাসে তরুণদের দ্বারা পরিচালিত অন্য কোন আন্দোলনে তেমন দেখা যায় না। আফগান তালিবান আন্দোলন শুধু বর্তমান মুসলিম বিশ্বের নয়, ইসলামের ইতিহাসের একটা গৌরবোজ্জল অধ্যায়। তালিবানদের আদর্শ এবং প্রেরণার উৎস হলো আল্লাহ, রাসূল (সাঃ) এবং সাহাবায়ে আজমাইন।

আমরা আশা করি তালিবানদের সংগ্রাম, সাধনা, জিহাদ ও কুরবানী মুসলিম বিশ্বের, বিশেষ করে বাংলাদেশের মাদ্রাসা ছাত্রদের চোখ এবং মুখ খুলে দিবে। বাংলাদেশের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্ররা যেভাবে ইতিহাস সৃষ্টি করছে, বাংলাদেশের মাদ্রাসা ছাত্ররা ইন্‌শাল্লাহ তা করতে পারবে। আল্লাহ যেন আমাদেরকে 'সুম্মুন', 'বুক্মুন', 'উমযুন' না করে রাখেন, রাব্বুল আলামিনের কাছে এই মোনাজাত করছি। মহান আল্লাহ আমাদেরকে গাজী এবং শহীদ হওয়ার মন-মানসিকতা ও তৌফিক দান করুন।

এ. জেড. এম. শামসুল আলম

কান্দাহারে নির্মিতব্য (ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়) জামেয়া ওমর

কাবুল শহরের আবাসিক এলাকা

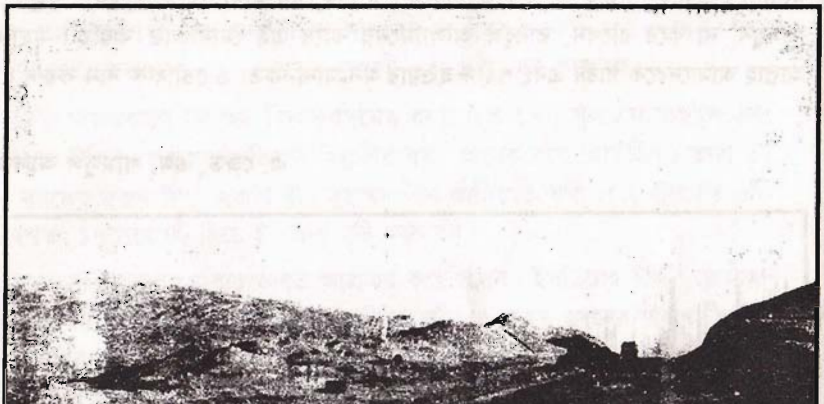

কাবুল খোস্ত রাজপথ

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়
দেশ ও ভাষা

১। আফগান ভূ-প্রকৃতি ১১
২। আফগান আঞ্চলিক পরিচিতি ১৫
৩। অধিবাসী ও ভাষা ২১

দ্বিতীয় অধ্যায়
উপজাতি

৪। পাখতুন বা পাঠান উপজাতি ২৪
৫। আফগান তাজিক উপজাতি ২৯
৬। আফগান হাজারা উপজাতি ৩১
৭। উজবেক ও গিলজাঁই উপজাতি ৩৭

তৃতীয় অধ্যায়
অতীত ইতিহাস

৮। আলেকজান্ডার থেকে বাবুর ৪০
৯। ইরান-আফগান সম্রাট নাদির শাহ ৪৬

আবদালী দুররানী রাজবংশ

১০। আফগান সম্রাট আহমদ শাহ আবদালী ৪৯
১১। আফগান আবদালী দুররানী রাজ বংশ ৫৪

বারাকজাঁই বংশ

১২। আমীর দোস্ত মোহাম্মদ খান ৬০
* প্রথম ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধ (১৮৩৮-৪২ খৃঃ) ৬৪
১৩। বারাকজাঁই বংশের প্রতিষ্ঠাতা আমীর শের আলী ৬৬
* দ্বিতীয় ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধ (১৮৭৮-৮০ খৃঃ) ৬৭

চতুর্থ অধ্যায়

প্রগতিবাদ ও সমাজতন্ত্র

১৪। আফগান বাদশাহ আমানুল্লাহ খান ৭১

* তৃতীয় ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধ (১৯১৯ খৃঃ) ৭৩

১৫। রাজতন্ত্র হতে সমাজতন্ত্র ৭৭

১৬। মধ্য এশিয়ায় রুশ আধিপত্য ৮১

১৭। আফগানিস্তানে কম্যুনিস্ট শাসন ৮৮

পঞ্চম অধ্যায়

মুজাহেদীন

১৮। মুজাহেদীন এবং তালিবান নেতৃবৃন্দ৯৩

১৯। মুজাহেদীন শাসন হতে তালিবান সরকার ৯৭

ষষ্ঠ অধ্যায়

তালিবান

২০। তালিবান পরিচিতি ও কর্মকাণ্ড ১০১

২১। তালিবানদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার ১০৬

২২। তালিবান প্রশাসন ও শান্তি-শৃঙ্খলা ১০৮

২৩। তালিবান ও মানবাধিকার ১১০

সপ্তম অধ্যায়

বৈদেশিক সম্পর্ক

২৪। আফগান ভূমিতে সাম্রাজ্যবাদী খেলা ১১৪

২৫। আফগান বৈদেশিক সম্পর্কের ক্রমবিবর্তন ১১৬

২৬। ইরান, পাকিস্তান ও তালিবান ১২০

২৭। রাশিয়া, মধ্য এশিয়া ও তালিবান ১২৪

২৮। বন্ধুহীন তালিবান১২৭

২৯। স্বনির্ভরতা, পরমত সহিষ্ণুতা ও সমঝোতা ১২৯

৩০। তালিবান সরকারের কূটনৈতিক স্বীকৃতি ১৩০

৩১। তালিবান বিজয়ের শেষ বাঁকে ১৩৭

১

আফগান ভূ-প্রকৃতি

পারস্যরাজ সাইরাজ (খৃঃ পূঃ ৫৫০-৫২৯) ও দারিয়াসের (৫২১-৪৮৫ খৃঃ পূঃ) সাম্রাজ্যের পূর্ব প্রান্তের প্রদেশকে বলা হতো খোরাসান। ফার্সি খোর শব্দের অর্থ হলো আলো, সূর্য। সূর্য পূর্বদিকে উদিত হয়। পূর্ব দিগন্তে সূর্য উদিত হয় বলে পারস্যের পূর্ব দেশের নাম হয়েছিল খোরাসান। কাবুলিস্তান, জাবুলিস্তান, নুরিস্তান, কোহিস্তান, কাফিরিস্তান, বেলুচিস্তান, হেরাত, গজনী, হাজারাজাত, কান্দাহার, পাকতুনিস্তান, তাজিকিস্তান, সিজিস্তান ইত্যাদি খোরাসান-এর অংশ বিশেষ ছিল। এখনও ইরানের পূর্ব সীমান্ত প্রদেশের নাম খোরাসান, প্রধান শহর মাশহাদ। প্রাচীন খোরাসান মুলুকের আধুনিক নাম আফগানিস্তান। তাজিকদের বাসভূমিকে বলা হয় তাজিকিস্তান। তুর্কদের বাসস্থানকে বলা হয় তুর্কিস্তান। তদ্রূপ আফগানিস্তান হলো আফগানদের বাসস্থান।

অবস্থান ও সীমানা

প্রাচীন খোরাসান রাজ্যের পূর্ব সীমায় ছিল ভারত, পশ্চিমে ও উত্তরে ইয়াজদ মরুভূমি, উত্তরে আমুদরিয়া নদী, তাজিকিস্তান, দক্ষিণে আরব সাগর, দক্ষিণ-পশ্চিমে সিজিস্তান মরুভূমি। স্তান শব্দটি আধিক্য অর্থেও ব্যবহৃত হয়। গুলিস্তান অর্থ হলো ফুলের বাগান, যেখানে বহু ফুল দেখা যায়। যে এলাকায় পাহাড়-পর্বত বেশী সে অঞ্চলকে কুহিস্তান বলা হয়।

বর্তমান আফগানিস্তানের পশ্চিমে ইরান, উত্তর-পশ্চিমে তুর্কমেনিস্তান, উত্তরে উজবেকিস্তান এবং তাজিকিস্তান, পূর্বে চীন এবং পূর্ব ও দক্ষিণে পাকিস্তান অবস্থিত। পামীর মালভূমি আফগানিস্তানের উত্তর-পূর্ব কোণের ওয়াকাহান করিডোরে ঠিক উত্তরে। ওয়াকহানের দক্ষিণে অবস্থিত পাকিস্তানের চিত্রল ও গিলগিট এলাকা।

আফগানিস্তান উত্তর-দক্ষিণে ২৯.৩০ এবং ৩৮.০ অক্ষাংশে, পূর্ব-পশ্চিমে ৬১ এবং ৭৫ দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত।

তাজিকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান এবং উজবেকিস্তান – এই তিনটি রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে তাজিকিস্তান-আফগান সীমানা দীর্ঘতম, এর পরিমাণ প্রায় ১৫০০ কিলোমিটার। চীন-আফগান সীমানা অতি অল্প, প্রায় একশ কিলোমিটার।

রাষ্ট্রীয় নাম

মধ্যযুগে এবং মুসলিম জাহানে 'আফগানিস্তান' শব্দটি তেমন পরিচিত ছিল না। খোরাসান প্রদেশ বা এর অংশ হিসেবেই এতদ্ অঞ্চল পরিচিত ছিল। সুলতান মাহমুদ আফগানরাজ বলে ইতিহাসে খ্যাত নন। তার পরিচয় গজনীর সুলতান মাহমুদ হিসেবেই। ভারত বিজেতা শিহাবুদ্দিন মুহাম্মদ ঘোরি আফগান হিসেবে ইতিহাসে চিহ্নিত হননি। ঘোর রাজ্যের রাজা ছিলেন বলে তিনি এবং তার বংশের সকল রাজাই ঘোরী নামে অভিহিত।

জহিরুদ্দিন মুহাম্মদ বাবুর আফগান রাজা হিসেবে খ্যাত হননি। তার পরিচয় কাবুল-কান্দাহাররাজ হিসেবে। জাবুল, কাবুল, কান্দাহার, হেরাত, সিজিস্তান, ঘুর, গজনী, বালখ, বাদখশান ইত্যাদি বর্তমান আফগানিস্তানের এক একটি প্রদেশ।

আহমদ শাহ আবদালীই ইতিহাসে প্রথম খ্যাতনামা আফগানরাজ হিসেবে পরিচিত হয়েছেন। বস্তুতঃ তিনিই আফগানিস্তানের সর্বপ্রথম স্বাধীন এবং সার্বভৌম সম্রাট। তিনি ছিলেন কান্দাহারের অধিবাসী এবং খাঁটি আফগান। তৎপূর্বে রাজা নাদির শাহ, শিহাবুদ্দিন মুহাম্মদ ঘোরিও সুলতান মাহমুদের রাজ্য আরো বড়ো ছিল। তারা আফগান বাসিন্দা হলেও তাদের বংশের আদি উৎস আফগানিস্তানের বাইরে।

নগরাঞ্চল

রাজধানী কাবুল ব্যতীত আফগানিস্তানের প্রধান শহর চার[৮]। এগুলো হলো ঃ

(১) জালালাবাদ, (২) কান্দাহার, (৩) হেরাত এবং (৪) মাজার-ই শরীফ। আফগানিস্তানের দু'টি প্রধান শহর জালালাবাদ এবং কাবুল পেশোয়ারের নিকটবর্তী। কাবুল ও পেশোয়ারের মাঝামাঝি স্থানে অবস্থিত নান গ্রাহার প্রদেশের রাজধানী জালালাবাদ।

আফগানিস্তানে প্রদেশের সংখ্যা ৩১। অধিকাংশ প্রাদেশিক রাজধানী প্রদেশের নামেই নামকৃত।

বোলান পাশ গিরিপথ হয়ে পাকিস্তান হতে কান্দাহারে যেতে হয়। খাইবার পাশ গিরিপথ দিয়ে যেতে হয় জালাবাবাদ হয়ে কাবুলে।

বেলুচিস্তানের রাজধানী কোয়েটা শহরের নিকটবর্তী শহর হলো আফগানিস্তানের স্পিন বুলডাক এবং কান্দাহার। স্পিন বুলডাক কোয়েটা এবং কান্দাহারের মাঝামাঝি। হেরাতের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত ইরানের বিখ্যাত মাশাদ শহর। আফগানিস্তানের পশ্চিমাংশে অবস্থিত ইরানের নিকটবর্তী শহর হলো হেরাত। উজবেকিস্তানের দক্ষিণ সীমান্তবর্তী বলখ প্রদেশের উত্তরাংশে আধুনিক শহর মাজার-ই শরীফ এখন বলখ প্রদেশের রাজধানী।

কাবুল থেকে বিমানপথে অনেকটা সমান দূরত্বে অবস্থিত দক্ষিণে কান্দাহার এবং পশ্চিমে হেরাত। উত্তরে সালাং টানেল দিয়ে হিন্দুকুশ পর্বত অতিক্রম করে মাজার-ই শরীফ যেতে হয়। পথের ডান পাশেই পূর্বদিকে আছে পাঞ্চশির উপত্যকা। পাঞ্চশির অধিবাসিরা মূলতঃ তাজিক গোত্রভুক্ত। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে হিন্দুকুশ পর্বতের পেট কেটে তৈরি হয় সালাং ট্যানেল বা সালাং পাশ। এ ট্যানেলের মুখ কাবুল হতে ১২০ কিলোমিটার।

পূর্বদিক হতে দেশের এগারটি গিরিপথ বা ট্যানেল হলো— (১) কোয়াক, (২) খরকনল, (৩) তিল, (৪) সালাং, (৫) বাজাহ, (৬) কাওয়াস (৭) কাহারদার (৮) বামিয়ান, (৯) আক্রবতি, (১০) পেলু, (১১) দান্দান শিবান। এ গিরিপথগুলো ছাড়া হিন্দুকুশ পর্বতের উত্তর-দক্ষিণে যাতায়াত অনেকটা অসম্ভব। হিমালয় পর্বতের ভিতরে এ ধরনের গিরিপথ না থাকায় হিমালয়ের উত্তর-দক্ষিণের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন।

নদ-নদী

আফগানিস্তানে উল্লেখযোগ্য সুদীর্ঘ নদী নেই। পূর্বাঞ্চলের নদীগুলোর মধ্যে রয়েছে কাবুল, কুনার, পাঞ্চশীর, বাশগুল, লোঘার, কুরাম, কুনদার ইত্যাদি। কাবুল নদীর উৎপত্তিস্থান কোহ-ই মাজার পাহাড়। এ নদী পাকিস্তানের আটকের নিকট সিন্ধু নদীতে পতিত হয়।

দক্ষিণ ও মধ্যাঞ্চলের নদীগুলো হলো আরগানদাব, আরগাসান, হেলমন্দ। হেলমন্দ আফগানিস্তানের দীর্ঘতম নদী। কোহ-ই বাবা পাহাড় হতে উৎপন্ন হয়ে হেলমন্দ নদী মধ্য আফগানিস্তানে ৯০০ মাইল প্রবাহিত হয়ে আফগান-ইরান সীমান্তের হামুন সাবেরী হ্রদে পতিত হয়।

পশ্চিমাঞ্চলের নদীসমূহ হলো— খাশরুদ, ফারারুদ, হারুতরূদ; হারিরূদ, মুরগাব ইত্যাদি। রুদ শব্দের অর্থ নদী। হারীরূদ নদী উত্তরাঞ্চলের কারাকুম মরুভূমিতে শেষ হয়।

উত্তরাঞ্চলের নদীসমূহ হলো— সুরখাব, কোকা, পাঞ্জা, আমুদরিয়া বা অক্সাস। আমুদরিয়া আফগানিস্তানে ৬০০ মাইল পর্যন্ত উত্তর সীমানা নির্দেশক নদী।

আমুদরিয়ার নদীর উৎপত্তি স্থান পামীর মালভূমি। ১৫৭৮ মাইল প্রবাহিত হয়ে এটা আরল হ্রদে পতিত হয়। বালখ এবং বাদকশানে এ নদীর অববাহিকা হলো প্রায় ৯৩ হাজার বর্গ মাইল। আমুদরিয়া উপত্যকা গ্যাস ও খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ। উত্তরাঞ্চলে ইরান হতে পামীর মালভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত সমভূমিতে ব্যাপক চাষাবাদ হয়।

বৃক্ষলতা

আফগানিস্তানের উত্তর অঞ্চলের পর্বতমালা বৃক্ষাচ্ছাদিত। হিন্দুকুশ পর্বতের ফার গাছের সারি অতি নয়নাভিরাম। দক্ষিণে ফার গাছ দেখা যায় না। পার্বত্য অঞ্চলের অনেকাংশ শীতকালে বরফাচ্ছাদিত থাকে। ফলে শীত অত্যধিক। দক্ষিণ ও সমুদ্রোপকূলের এলাকা অনেকটা বৃক্ষশূন্য। পর্বতে মাটি অপেক্ষা পাথর বেশী হওয়ায় দক্ষিণাঞ্চলে গাছপালা কম। হাজারাজাত অঞ্চল বৃক্ষলতাহীন কঠিন শিলায় গঠিত শুষ্ক, নগ্ন, বৃক্ষছায়াহীন। দক্ষিণাঞ্চল মালভূমি, মরুভূমি এবং উপ-মরুভূমি।

দক্ষিণের বৃক্ষশূন্য পার্বত্য এবং মরু অঞ্চলের আবহাওয়া অত্যন্ত শুষ্ক ও উষ্ণ। আরব সাগর হতে উদ্ভূত জলীয় বাষ্পবাহী বায়ু পূর্বাঞ্চলের হিন্দুকুশ পর্বতের শাখা-প্রশাখায় বাধাপ্রাপ্ত হয়ে উত্তর-পশ্চিমে প্রবাহিত হতে পারে না। এমনকি দক্ষিণেও নয়। ফলে আফগানিস্তানে বৃষ্টিপাত কম।

পর্বত, মালভূমি, উপত্যকা

হিন্দুকুশ পর্বতমালার শাখা-প্রশাখা কোহ, বান্দ ইত্যাদি নামে মধ্য আফগানিস্তানের প্রায় সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে। এ পর্বতমালার শুরু পামীর মালভূমি। হিন্দুকুশের পশ্চিমাংশ কোহ বাবা বা বাবা পর্বত নামে পরিচিত। হিন্দুকুশের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ শাহ ফুল্লাদী (১৬,৮৭০ ফুট) কোহ বাবায় অবস্থিত। একই পর্বতশ্রেণীর আরো পশ্চিমে সম্প্রসারিত অংশ হলো বন্দ আমীর, বন্দ ভবন, পারাপামিসাস। হিরাতের পশ্চিমে কোহ-ই সফিদ ও হেরাতের উত্তরে এবং হারিরুদের পূর্ব তীরের সিয়াহ বুবুক।

পারাপামিসাস পর্বতের উল্লেখ গ্রীক পরিভ্রাজক টলেমীর বর্ণনাতে আছে। জালালাবাদের দক্ষিণে অবস্থিত সফেদ কোহ পর্বতমালা। হেরাতের পশ্চিমের কোহ-ই সফিদ এবং জালালাবাদের পূর্ব দিকের সফেদ কোহ এক নয়। প্রথমটি দেশের পশ্চিম প্রান্তে অপরটি দেশের পূর্বপ্রান্তে। সর্বোচ্চ শৃঙ্গ সিকারাম। উচ্চতা ১৫,৬০০ ফুট। এটা আফগানিস্তানের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ শৃঙ্গ। চারিখার এবং কাবুলের মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত কোহ-ই দামান।

কাবুলের দক্ষিণে সুলেমান এবং সফেদ কোহ পর্বতমালা। সফেদ শব্দের অর্থ সাদা। শ্বেত পাথর পাওয়া যায় বলে এই পর্বতের নাম হয়েছে সফেদ পর্বত।

সুলাইমান পর্বতমালার সর্বোচ্চ শৃঙ্গ সুলাইমান। উচ্চতা ১১,২০০ ফুট। আফগানিস্তানের অন্যান্য পার্বত্যভূমি হলো হেলমন্দের দক্ষিণ তীরে কোহে মালিক শিস, মুরগাব নদীর পূর্বতীরের বন্দ-ই তুর্কিস্তান।

জনগণ পর্বতের অন্তবর্তী উপত্যকায় নিজেদের বাসস্থান গড়ে তুলেছে। পার্বত্য অঞ্চলেই একাধিক পাহাড়ের মাঝে গভীর খাদ এবং উপত্যকা দেখা যায়। পাহাড়ের মধ্যবর্তী কিছু কিছু উপত্যকা ছাড়া আফগানিস্তানের অধিকাংশ অঞ্চল অসমতল-পাহাড়ী। আফগানিস্তানের ৭৫% স্থান তৃণভূমি. যাতে কোটি কোটি ছাগল ও ভেড়া প্রতিপালিত হয়। পর্বতঘেরা উপত্যকায় আবহাওয়া স্নিগ্ধ। উত্তরাংশের উপত্যকায় গ্রীষ্মকাল আরামদায়ক এবং বসন্ত অতি মনোরম।

২

আফগান আঞ্চলিক পরিচিতি

আফগানিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চল বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হতে ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত। আফগানিস্তানে ইসলাম প্রচারিত হওয়ার পর যে অঞ্চলের জনগণ আদৌ ইসলাম গ্রহণ করেনি সে অঞ্চল কাফিরিস্তান নামে পরিচিত ছিল। এখন আফগানিস্তানের জনসংখ্যার প্রায় ৯৯.৫ ভাগ মুসলমান। কাফিরিস্তানের লোকেরা এখন আর কাফির নয়। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে আমীর আবদুর রহমানের শাসনামলে সকল কাফির আনুষ্ঠানিক এবং চূড়ান্তভাবে ইসলাম গ্রহণ করে। তবু 'কাফিরিস্তান' শব্দটি আফগান ইতিহাস-ঐতিহ্যে স্থায়ী আসন গেড়েছে। ইসলাম প্রচারের পর ঐ এলাকার নাম দেয়া হয় নুরিস্তান, আলোর দেশ।

আফগানিস্তানের কোন কোন এলাকা কোহিস্তান বা পাহাড়ের দেশ নামে পরিচিত। একটি অঞ্চল ইয়াগিস্তান বা দুর্ভেদ্য এলাকা নামে পরিচিতি। ইয়াগিস্তান অর্থ দুর্ভেদ্য বা অজেয়। এখন কোন এলাকাই দুর্ভেদ্য নয়।

মরুভূমি এলাকা সিস্তান বা সিজিস্তান নামে পরিচিতি।

ইতিহাস-ঐতিহ্যগতভাবে অঞ্চলের নামকরণ আমাদের দেশেও আছে। যেমন— সমতট, বরেন্দ্রভূমি, মহাস্তানগড়, গৌড়, পান্ডুয়া, চট্টলা, কামরূপ, কামাখ্যা, রাঢ়, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুম্ম, প্রসুম্ম ইত্যাদি। এগুলো বর্তমানের কোন এলাকা নিয়ে তা স্পষ্ট নয়। তবে আন্দাজ করা যায়। সমতট বলতে আমরা সাধারণতঃ বুঝি কুমিল্লা, নোয়াখালী, বরিশাল, ফরিদপুর। বরেন্দ্রভূমি বলতে রংপুর, রাজশাহী, মহাস্তান বলতে বগুড়া, গৌড় ও পান্ডুয়া বলতে নওয়াবগঞ্জ, দিনাজপুর বুঝে থাকি। বিক্রমপুর, চলনবিল, ভাটি নামেও কোন প্রশাসনিক এলাকা নেই।

ইতিহাস-ঐতিহ্যগত এবং ভৌগলিক নামকরণ ছাড়াও প্রশাসনিক নামেই আজকাল একটি দেশের বিভিন্ন অঞ্চল পরিচিত। আফগানিস্তানও এর ব্যতিক্রম নয়। প্রশাসনিক সুবিধার জন্যে আফগানিস্তান ৩১টি প্রদেশে বিভক্ত।

১৬টি প্রদেশের নামেই নামকরণ হয়েছে রাজধানী শহরের। ১৫টি প্রদেশের রাজধানী শহরের নাম প্রদেশের নাম হতে ভিন্ন। নিম্নে আফগানিস্তানের প্রদেশসমূহের নাম উল্লেখ করা হলো। যে যে প্রদেশের রাজধানীর নাম প্রদেশের নাম হতে ভিন্ন, ঐ সমস্ত প্রদেশের রাজধানীর নাম প্রদেশের নামের পর বন্ধনীতে দেয়া হলো ।

আফগান প্রশাসনিক প্রদেশসমূহ

(১) কাবুল, (২) কান্দাহার, (৩) হেরাত, (৪) বালখ (রাজধানী মাজার-ই শরীফ), (৫) গজনী, (৬) ঘুর (চেকচেরান), (৭) বাদকশান (ফয়জাবাদ), (৮) কুনার (আশাদাবাদ), (৯) নানগ্রাহার (রাজধানী জালালাবাদ), (১০) কাপিসা (মাহমুদ রাকি), (১১) পারওয়ান (চারিকার), (১২) লাঘমান(মেটেরলাম), (১৩) বাঘলান (পুলি খুমরি), (১৪) টাকহার (টোলোকান),(১৫) কন্দুজ, (১৬) সামানগান (আইবাক), (১৭) যাউজযান, (১৮) ফারিয়াব (মাইমানা), (১৯) বাদঘীস (কালাই নও), (২০) ফারাহ, (২১) নিমরোজ,(২২) হেলমান্দ, (২৩) উরুজগান, (২৪) বামিয়ান, (২৫) ওয়ারডাক (মুদান শহর) (২৬) লোগার (পুলি আলম), (২৭) পাকতিয়া, (২৮) পাকটিকা, (২৯) জাবুল, (৩০) সারিপুল, (৩১) খোস্ত ইত্যাদি।

৩১টি প্রদেশের মধ্যে ২২টির নেতৃত্ব তালেবানদের হাতে (১৯৯৬)। উত্তরের কয়েকটি প্রদেশের প্রশাসন নিয়ন্ত্রণ করেন জেনারেল আবদুর রশিদ দোস্তাম।

কাবুল

হিন্দুকুশ পর্বতের দক্ষিণে কাবুল প্রদেশ অবস্থিত। কাবুল উপত্যকা চারিদিকে পাহাড়ে ঘেরা। এর উত্তরে হিন্দুকুশের গৌরবান্দ, পশ্চিমে কোহ-দামান, আরগাংদেহ, দক্ষিণে আলতিমুর, সফেদকোহ, পূর্বে কাবুল নদী, পুনার নদী, চিত্রল উপত্যকা। সামরিক দিক থেকে অনেকটা নিরাপদ স্থানে অবস্থিত কাবুল।

কাবুল অঞ্চলের অপর নাম রোহ। রোহ এবং কোহ এই দু'টি সমার্থক শব্দ। রোহ অর্থ পর্বত, উচ্চভূমি, পার্বত্য এলাকা। রোহ বা পর্বত এলাকার লোকদেরকে বলা হয় রহিলাই বা রোহলাই। সমগ্র পাঠান বা পাকতুন এলাকা একসময় রোহ নামে পরিচিত ছিল। পাঠান বা পাকতুনগণ রোহলাই নামেও অভিহিত হত।

সুলায়মান পর্বতমালা কান্দাহার-জাবুল-গজনী অঞ্চলে অবস্থিত। পাঠানগণ এ অঞ্চলে বসবাস করে। অতীতে প্রশাসনিক কেন্দ্র ছিল গজনী, কান্দাহার। মুঘল এবং দুররানীর শাসনামলে কাবুল রাষ্ট্রের রাজধানী মর্যাদা লাভ করে।

আফগানগণ নিজেদেরকে হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর দৌহিত্র রাজা সৌল এর পৌত্র "আফগান"-এর বংশধর বলে দাবী করে। রাজা সৌল ছিল বাদশাহ সোলায়মানের বংশধর। 'ভৃগু-সংহিতায়' আফগান নামে এক জাতির উল্লেখ পাওয়া যায়। ভৃগু-সংহিতা রচিত হয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে। অনেক ভাগ্য বিপর্যয়ের পর হযরত মুসা (আঃ)-এর বংশধরগণ আফগানিস্তানে এসে বসতি স্থাপন করে। নিজেদেরকে তারা সোলায়মানি পরিচয় দিয়ে থাকেন।

জাবুল

আফগানিস্তানের দক্ষিণের সমগ্র অঞ্চল অর্থাৎ গজনী, সিজিস্তান, ঘোর কান্দাহার ইত্যাদি এলাকা একসময় জাবুল বা জাবুলিস্তান নামে পরিচিত ছিল। সফেদ কোহ পর্বতের দক্ষিণ-পশ্চিমে গজনী, উরুজগান। গজনীর দক্ষিণে বর্তমান জাবুল প্রদেশ।

নানগ্রাহার

জালালাবাদ নগরী আফগানিস্তানের নানগ্রাহার প্রদেশের রাজধানী। নানগ্রাহার নামটি অতি প্রাচীন। ফার্সী শব্দ নও এবং আরবী শব্দ নাহার (নদী) মিলে সংযুক্ত শব্দ নানগ্রাহার হয়েছে। নানগ্রাহার বা জালালাবাদে নয়টি নদী নেই। তবে ক্ষুদ্র পাহাড়ীয়া ঝর্ণা টাইপের নদী আছে। মরুভূমির লোকদের নিকট পাহাড়িয়া চেরা বা খাল ও নদীর অনুরূপ।

কোহিস্তান ও ইয়াগিস্তান

কোহ শব্দের অর্থ পাহাড়। কোহিস্তান অর্থ পার্বত্য অঞ্চল। কাবুলের উত্তরে হিন্দুকুশ পর্বতের পাদদেশের ঢালু এলাকা কোহিস্তান নামে পরিচিত। কোহিস্তানের পাশাপাশি অঞ্চল ইয়াগিস্তান। কাবুলের পূর্বদিকে কুনার নদী। কুনার নদী এবং হিন্দুকুশের মাঝামাঝি অঞ্চল হলো ইয়াগিস্তান। ইয়াগিস্তান অর্থ দুর্ভেদ্য এবং অজেয় এলাকা। এ এলাকা জয় করা বিদেশী অভিযানকারীদের দুঃসাধ্য ছিল বলে এ এলাকার নাম হয় ইয়াগিস্তান। ইয়াগিস্তান, কোহিস্তান, কাফেরিস্তান ইত্যাদি এলাকার কোথায় শুরু এবং কোথায় শেষ তা অনেকটা অস্পষ্ট।

কাফিরিস্তান/নুরিস্তান

হিন্দুকুশ পর্বতের উত্তর পূর্বকোণের অংশ কাফিরিস্তান নামে পরিচিত ছিল। কাফিরিস্তান অর্থ কাফেরদের এলাকা। সম্রাট বাবুরের সময় সোয়াত পর্যন্ত ঐ এলাকার লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করেনি। ইসলাম প্রচারের পর যে সমস্ত দুর্গম এলাকায় সুফী মিশনারীগণ পৌঁছেননি, ঐ সমস্ত এলাকা কাফিরিস্তান নামে পরিচিত ছিল। এখন যদিও সমগ্র আফগান জনগণ মুসলমান, তবু কাবুলের পূর্ব-উত্তর দিকে বেশ কিছু এলাকা কাফিরিস্তান নামে পরিচিত।

লাগবান ও কুনার প্রদেশ এবং পাঞ্জশীর নদী পূর্ববর্তী অঞ্চলের বেশ কিছু এলাকা নুরিস্তান নামে পরিচিত। কাফিরিস্তানের সম্পূর্ন এলাকা এখন নুরিস্তানের অন্তর্ভূক্ত। তবুও কাফিরিস্তান নামটি জনস্মৃতিতে টিকে আছে।

কান্দাহার

কান্দাহার হেলমন্দ নদীর দান। কান্দাহারের আঙ্গুর বেদানা এবং অন্যান্য ফলমূল বিদেশে রপ্তানী হয়। কান্দাহার শহরে মুঘল সম্রাট বাবুর তার স্মৃতিস্তম্ভ রেখে গেছেন পাথর কেটে ৪০ সিঁড়ির উপরে স্থাপিত মঞ্চে। তাতে পাথরে তিনি তার বিজয়গাথা লিখে রেখেছেন। হেলমন্দের উপনদী আরগানদাব এবং টারনাকের মধ্যবর্তী উপত্যকায় অবস্থিত কান্দাহার নগরী। প্রাচীন যামীন দাওয়ার প্রদেশ বর্তমান কান্দাহারের অন্তর্ভূক্ত।

সিস্তান/সিজিস্তান

বর্তমান জাবুল প্রদেশের দক্ষিণে আফগানিস্তানের নিম্ন অঞ্চল সিজিস্তান বা সিস্তান নামে পরিচিত। বেলুচিস্তান থেকে ইরান পর্যন্ত বিস্তৃত হেলমন্ড উপত্যকা সিস্তানের অংশ। হামুন হ্রদের চারিদিকের অঞ্চল সিস্তান নামে অভিহিত। হেলমন্ড নদী সিস্তান মরুতে হারিয়ে গেছে। আফগানিস্তানের কোন নদী পাহাড়, মরুভূমি বা মালভূমি অতিক্রম করে আরব সাগরে মিলিত হতে পারেনি। সিস্তান একটি অনুন্নত এলাকা। এখানে কোন বড় শহর নেই। বৃক্ষ-লতাহীন এ অঞ্চল। বৃষ্টিপাত খুবই কম। সিজিস্তানের এক অংশ এখন ইরানের অন্তর্ভূক্ত।

ঘুর

ঘুরের অধিবাসীরা মঙ্গোল বলে কথিত। তারা এখানে এসেছিল চেঙ্গিশ খাঁর সাথে। নিজেদের মধ্যে আন্তঃবিবাহ হয় বলে তাদের শারীরিক বৈশিষ্ট্য এখনও অক্ষুণ্ন রয়েছে। ঘুর-এর অধিবাসীরা শীয়া মুসলিম।

ঘুর প্রদেশের অবস্থান কাবুলের পশ্চিমে, হেরাতের পূর্বে বালখ-এর দক্ষিণে, কান্দাহারের পশ্চিম-উত্তরে। মঙ্গোলদেরকে হাজারা মঙ্গোল বলা হয়।

হাজারা এবং হাজার সম্পর্কযুক্ত শব্দ। বর্তমান হাজারা জাতিভুক্ত হাজার হাজার তাতারী মঙ্গোল যে অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছিল সে অঞ্চলকে হাজারাজাত বলা হয়। ভারত বিজেতা সুলতান শিহাবউদ্দিন মুহাম্মদ ঘোরি হাজারা জাতের ঘুর রাজ্যের রাজা ছিলেন। বিভিন্ন দিকে অসংখ্য ছোট-বড় পাহাড় ছিল বলে এ অঞ্চল জয় করা কষ্টকর হয়।

হিরাত

প্রাচীন পারস্য সম্রাট হৈরভের নামানুসারেই হয়েছে হিরাত নগরীর নাম। আলেকজান্ডারের অভিযানের পূর্বে হিরাত নগরীর নাম ছিল আরতাকানা। হিরাত অতীতে একসময় খোরাসান প্রদেশের রাজধানী ছিল।

পর্বত এবং সমতল ভূমি নিয়ে গঠিত হেরাত প্রদেশ। হেরাতের অবস্থান সিজিস্তানের উত্তরে। হেরাত এলাকা দক্ষিণে সাবসওয়ার এবং উত্তরে তুর্কিস্তান পর্যন্ত বিস্তৃত। আহমদ শাহ্ আবদালী হেরাতকে আফগান রাজ্যভুক্ত করেন।

হিরাত শহর অনেকটা মরুভূমি বেষ্টিত। কিন্তু হারিরুদ নদীর অববাহিকায় অবস্থিত বলে হিরাত বৃক্ষছায়া শোভিত অতি সুন্দর শহর। বেশ কয়েকটি ছোট-বড় নদীর অববাহিকায় অবস্থিত এ অঞ্চল অতীতকাল থেকে ছিল সম্পদশালী। ফলে বিজেতাদের দৃষ্টি এ অঞ্চলের দিকে আকর্ষিত হয়। হারিদের বাসস্থান হেরাত। হেরাতের উপর দিয়ে হারিরুদ ও মুরগাব নদী প্রবাহিত। উত্তরে মুরগাব নদীর তীরে অবস্থিত তুর্কমেনিস্তানের বিখ্যাত মার্ভ নগরী।

হিরাতের আদিবাসীরা ইরানী এবং তাজিক আরব। ঘোরী, হারী ও তাতারী মঙ্গোলগণ চেংগিশ খাঁর সঙ্গে এ অঞ্চলে এসেছিল বলে কেউ কেউ বলে থাকেন।

হিরাত নগরীর উপকণ্ঠে রয়েছে বিখ্যাত সুফি দার্শনিক কবি জামীর মাজার। জামী নামেই মোল্লা নুরুদ্দিন আবদুর রহমান মুসলিম বিশ্বে খ্যাত। জন্মস্থান জাম শহরের নামানুসারে তার নাম হয় জামী। তার কাব্যগ্রন্থ ইউসুফ-জুলায়খা এবং লাইলী-মজনু খুবই জনপ্রিয় ও মর্মস্পর্শী রচনা।

পুরান হিরাত শহরে রয়েছে তৈমুর লঙের পুত্র শাহরুখপত্নি (১৪০৪-৪৭ খৃঃ) গওহর শাদের মাজার। রাণী গওহর শাদ বিদুষী রমনী ছিলেন। তিনি বহু মসজিদ এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। হিরাতে তার প্রতিষ্ঠিত মসজিদ এবং কলেজ পর্যটকদের জন্যে আকর্ষণীয় স্থান। ইরানের মাশহাদ শহরে রাণী গওহর শাদ মসজিদ এখনও তাঁর স্মৃতি বহন করে।

আফগানিস্তানের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের মরুভূমি দেশের প্রায় এক চতুর্থাংশ জুড়ে আছে। হিরাত অঞ্চল অনেকটা গাছপালাহীন ধূসর মরুভূমি। গবাদি পশুর মধ্যে মরুভূমির বাহন উটই প্রধান। হিরাতে তৈরী দুম্বার চামড়ার কারাকুলি টুপি খুবই জনপ্রিয়।

বালখ্

বালখ্ প্রদেশের রাজধানী মাঝারী-ই শরীফ। এ প্রদেশের পূর্ব নাম ছিল তুর্কিস্তান। আরও অতীতে এ অঞ্চলের নাম ছিল বেকট্রিয়া (গ্রীক)। কুহ্‌বাবার উত্তর দিকে আমুদরিয়া পর্যন্ত এ এলাকা বিস্তৃত। বালখের অধিবাসীগণ উজবেক, তুর্কমন, তাজিক, মঙ্গোল। বালখ্ বিভিন্ন সময়ে ইরানিয়ান এবং আরব সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আহমদ শাহ্ আবদালীর আমলে সর্বপ্রথম বালখ্ নগর আফগান রাজ্যভুক্ত হয়। পরবর্তীতে আফগান আমীর দোস্ত মোহাম্মদ বালখ্ প্রদেশকে আফগানিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করেন।

হিন্দুকুশ পর্বতের উত্তর দিকে অকসাস বা আমুদরিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত বালখ্ প্রদেশ। উত্তর-পশ্চিমে এই অঞ্চল সারাখস মরুভূমি এবং তুর্কিস্তান পর্যন্ত বিস্তৃত। পশ্চিমে হেরাত এবং পূর্ব-দক্ষিণে কাবুলের সাথে এর সহজ সংযোগ রয়েছে। বলখ্ অঞ্চলকে বলা হয় আফগান তুর্কিস্তান। অধিবাসীরা তাজিক, মঙ্গোল, উজবেক, তুর্ক, তুর্কমেন। ঐতিহ্যগতভাবে তারা যোদ্ধা ও সাহসী হওয়ার কথা। বলখ্ উর্বর এবং সমতল ভূমি। কৃষিপ্রধান উপজীবিকার কারণে হয়ত জনগণ অনেকটা আরামপ্রিয় এবং বিলাসী।

বাদখশান

আফগানিস্তানের পূর্ব-উত্তর কোণের প্রদেশ হলো বাদখশান। হিন্দুকুশের উত্তরে, তুকিস্তানের পূর্বে, আমুদরিয়া নদীর বাম-দক্ষিণ তীরে বাদখশান প্রদেশ। এর উত্তরে পামির মালভূমি ও চিত্রল। কুনদুজ, আমুদরিয়া নদী,ওয়াহন নদী এবং পাঞ্জা নদী এর উপর দিয়া প্রবাহিত। এই প্রদেশটি সর্বপ্রথম আহমদ শাহ্ আবদালী আফগান রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন এবং পরবর্তীতে দোস্ত মোহাম্মদ এ প্রদেশ চূড়ান্ত বিজয় করেন। বাদখশান খনিজ সম্পদ সমৃদ্ধ প্রদেশ। রুবি, নীলকান্তমনি (Turquoise) এবং মূল্যবান পাথরে সমৃদ্ধ এই পর্বতমালা। উন্নতমানের লৌহ এই অঞ্চলে পাওয়া যায়। জনসাধারণ তাজিক এবং আর্য। বাদখশান সুন্দর সবুজ মনোরম দেশ। পর্যটকদের নিকট খুবই আকর্ষণীয়।

৩

অধিবাসী ও ভাষা

আফগানিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসংখ্যা হলো পুশতুন। পাকিস্তান এবং আফগানিস্তানের পাঠানগণ গোঁড়া সুন্নী। তাদের সঙ্গে ইরানের শিয়াদের বেশকিছু মতপার্থক্য আছে।

পুশতুনরা লেখাপড়া করতে যায় আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয় (মিসর), পাকিস্তানের মাদ্রাসাসমূহে এবং ভারতের দেওবন্দ মাদ্রায় বা ফিরিঙ্গি নগরের অন্যান্য দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। শিয়ারা আকৃষ্ট হয় ইরানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দিকে।

জনসংখ্যা

আফগানিস্তানের আয়তন ২ লক্ষ ৫২ হাজার বর্গমাইল। আয়তনের দিক দিয়ে দেশটি বাংলাদেশ হতে প্রায় ৫ গুণ বড়। কিন্তু অধিকাংশ এলাকা বিশেষ করে উত্তরের এলাকা পর্বতময়। আফগানিস্তানের জনসংখ্যা ২ কোটি ৫৬ লক্ষ (১৯৯৬ খৃঃ)। ১৯৭৯ সনে জনসংখ্যা ছিল অনেক কম। তখন জনসংখ্যার সম্প্রদায় বা গোত্রগত সংখ্যা ছিল নিম্নরূপ ঃ

১. পুশতন ৭০ লক্ষ ২. তাজিক ৩৫ লক্ষ ৩. হাজারা ১৫ লক্ষ এবং
৪. উজবেক ১৩ লক্ষ ৫. তুর্কমেন ৩ লক্ষ ৬. ব্রাহুই ২ লক্ষ ৭. বালুচী ১ লক্ষ এবং ৮. নূরস্তানী ১ লক্ষ। আফগানিস্তানে কখনও census বা জরীপ হয়নি। তাই বিভিন্ন পরিসংখ্যানের তথ্যাদি অনুমান নির্ভর মাত্র।

আফগানিস্তানে গ্রামের সংখ্যা ১৮ হাজার। এগুলো সাধারণতঃ দেশের উর্বর এলাকায় অবস্থিত। জনসংখ্যার ৯০% পল্লীবাসী। নাগরিক জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকই রাজধানী কাবুলে বাস করে।

ভাষা

অন্যান্য বহু দেশের ন্যায় আফগানিস্তানও এক ভাষাভাষি বা এক গোত্রীয় দেশ নয়। আফগানিস্তানে বহুসংখ্যক ভাষা এবং উপভাষা থাকলেও প্রধান দু'টি ভাষা হলো পুশতুন এবং ফারসী। বহুকাল পর্যন্ত আফগানিস্তান ছিল খোরাসান নামে অভিহিত ইরানের একটি প্রদেশ। আহমদ শাহ আবদালী দূররানীর পূর্বে আফগানিস্তান স্বতন্ত্র, স্বাধীন সার্বভৌম দেশ হিসেবে পরিচিত ছিল না।

আফগানিস্তানের রাষ্ট্রভাষা ফারসী। কাবুল শহরের স্থানীয় ভাষার নাম দারি। এটা ফারসী ভাষারই একটি উপ-ভাষা। জালালাবাদ-কান্দাহার অঞ্চলের ভাষা পুশতুন। উত্তর-পূর্ব কোণে তাজিকদের ভাষা তাজিক।

উত্তর-পশ্চিম অংশের অধিবাসীরা উজবেক গোত্রভুক্ত। আবদুর রশিদ দোস্তাম তাদের নেতা। এই অঞ্চলের ভাষায় উজবেক ভাষার প্রভাব বেশী। উজবেক অঞ্চলের প্রধান শহর হলো বালখ্ প্রদেশের রাজধানী মাজার-ই শরীফ।

পুশতুনরা বাস করে দেশের দক্ষিণে এবং দক্ষিণ-পূর্ব অংশে। কান্দাহার হলো তাদের এলাকার সবচেয়ে বড় শহর। তাদের কাছাকাছি গোত্র হলো বেলুচি ; বেলুচিস্তানের নিকটবর্তী এলাকায় তাদের আবাস। নেতৃত্ব নিয়ে অতীতে পুশতুন এবং উজবেকদের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব ছিল। অন্যপক্ষে দেশের পূর্বাঞ্চলের তাজিক এবং পুশতুনরা জমিদার এবং তাজিকেরা কৃষক। কোন কোন এলাকায় দেখা যায় পুশতুনরা যাযাবর এবং সূদী ব্যবসায়ী।

রাজধানী কাবুলে কোন একটি বিশেষ গোত্রের একচ্ছত্র আধিপত্য নেই। যেমন আছে কান্দাহারে পুশতুনদের, মাজার-ই শরীফে উজবেকদের, বাদখশানে তাজিকদের এবং হেরাতে ফার্সিয়ানদের।

সোভিয়েত বিপ্লবের পর উজবেকিস্তান, তাজিকিস্তান এবং তাজিকিস্তান থেকে ১৯২৮ খৃঃ পর্যন্ত সময়ে হিজরত করে বহু তাজিক এবং উজবেক আফগানিস্তানে স্বগোত্রীয় লোকদের এলাকায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। তারা হিজরত করে এসেছেন বলে অধিকতর ইসলামী চেতনাসম্পন্ন। মুহাজিরগণ স্থানীয় অধিবাসী থেকে আর্থিকভাবে অধিকতর উন্নত।

তাজিক অঞ্চলে গোত্রীয় নেতা হলেন মুজাহিদ নেতা প্রকৌশলী আহমদ শাহ মাসুদ (জন্ম ১৯৪৮ খৃঃ) এবং রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক বোরহানুদ্দীন রব্বানী।

তাজিক ভাষাভাষীগণ প্রশাসনিক চাকরীতে বেশী, পুশতুনগণ সামরিক বাহিনীতে সংখ্যায় অধিক।

পশ্চিমের হেরাত অঞ্চলের ভাষা মূলতঃ ফারসী। এ অঞ্চলের অধিবাসীরা অধিকাংশই শিয়া মনোভাবাপন্ন। হেরাতের নেতা হলেন ইসমাইল খান। তিনি শিয়া, তবে দলগতভাবে বোরহানুদ্দীন রব্বানীর জমিয়াত-ই ইসলামীর সমর্থক।

শিয়া নেতা আবদুল আলী মাজারী তালেবানদের হাতে নিহত হন।

হাজারা গোত্র অধিকতর দরিদ্র। তাদের জমি পুশতুন যাযাবরগণ ক্রয় করে নেয়। কাবুল শহরে সাধারণতঃ নিম্নস্তরের কাজগুলো হাজারা গোত্রের লোকেরাই করে থাকেন। হাজারাগোত্র বাস করে কাবুলের পশ্চিম হাজারাজাত অঞ্চলে উরুজগান, বামিয়ান, ঘুর প্রদেশে।

ঘুর এবং হেরাত প্রদেশের অধিবাসীগণ পুশতু অপেক্ষা ফারসী ভাষা চর্চা বেশী করে থাকেন। বাদখশান, তাজিকিস্তান, হাজারাজাত, ঘুর, বেলুচিস্তান, মাকরান, সিস্তান ইত্যাদি অঞ্চলে নিজস্ব আঞ্চলিক ভাষা থাকা সত্ত্বেও ফারসীর আধিপত্য বিরাজমান।

যদিও চেঙ্গিশ খান পারস্য সম্রাট হতে খোরাসান জয় করে নিয়ে ছিলেন কিন্তু পারস্য ভাষা মঙ্গোলদেরকে জয় করে নেয়। মঙ্গোলদের ভাষা ছিল অনুন্নত এবং উপভাষা স্তরের। কালক্রমে তারা মাতৃভাষা ভুলে ফারসীকে নিজস্ব ভাষা হিসেবে গ্রহণ করে। বৃটিশ সাম্রাজ্যের অবসান ঘটলেও এখনও প্রাক্তন বৃটিশ কলোনীগুলোতে ইংরেজী ভাষার আধিপত্য কোনদিক দিয়ে হ্রাস পায়নি।

ইরানী প্রভাবিত ভাষাসমূহ

বেলুচিস্তান সংলগ্ন এলাকা এবং দক্ষিণের মরুভূমি অঞ্চলে বালুচ ভাষা কিছুটা প্রচলিত। কাবুলের দক্ষিণের লুগার উপত্যকায় ও কানিগুরাম অঞ্চলে উরমুড়ী ভাষা অবলুপ্ত প্রায় হলেও অজ্ঞাত নয়।

কাবুলের উত্তরে কয়েকটি গ্রামের কথ্য ভাষা হলো প্যারাচি। বাদাখশানের পাহাড়ী এলাকায় পামির ভাষার স্মৃতি এবং শব্দ টিকে আছে।

অন্যান্য অখ্যাত ভাষার মধ্যে রয়েছে মুনজান এ মুনজী ভাষা, চিত্রলের কাছাকাছি এলাকায় ইদগা, ওয়াখানে ওয়াখী উপভাষা। আমুদরিয়া এবং ওয়ারদোজ এলাকায় প্রচলিত আছে সাংলেচী, যেবাকী, ইশকাশমী, শুগনী, রোশানী উপভাষা।

ইন্দো-আর্য ভাষা

ইন্দো-আর্য ভাষাসমূহ পূর্ব উত্তর আফগানিস্তানে অবলুপ্তির পথে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে লাহ্‌দা, পাশাই, গাওয়ার কাটি, কাতি ওয়াইগালী, আশকুন, প্রসূত ইত্যাদি। উত্তর আফগানিস্তানে উজবেকী, তুর্কমানী, কিরঘীজি ভাষা প্রচলিত। তাজিকি এবং বালখ্ এলাকার যাযাবরদের মধ্যে এখন আরবী ভাষা প্রচলিত। পুশতুন এবং ফারসীই হলো দেশের প্রায় ৮০% মানুষের ভাষা। অন্যান্য ভাষার লোকেরা পুশতুন অপেক্ষা ফারসী ভাল বোঝেন। আফগানিস্তানে ভাষার সংখ্যা ২০টির কম নয়। উপ-ভাষা (dialect) আরো বেশী।

পুশতুন, ফারসী এবং তাজিক ও উজবেকী এই চার ভাষার প্রভাব আফগানিস্তানের সাংস্কৃতিক জীবনে সুস্পষ্ট।

৪

পাখতুন বা পাঠান উপজাতি

পাখতুন, তাজিক, হাজারা, উজবেক, তুর্ক, তুর্কমেন, ঘুর, গুজার, জাঁঠ, হিন্দকী, কোহিস্তানী, সিজিস্তানী, সুলেমানী, গিলজাই, সাদ্দোজাঁই, ইউসুফজাঁই, হারী, নূরীস্তানী, ওয়াজিরি, হারাভী, খাত্রিনী, শিবৃরানী, কাকার, তোরী, হাজারাজাঁই, ইত্যাদি বহু গোত্রের বাসভূমি আফগানিস্তান। যে উপজাতি আফগানিস্তানে পাখতুন নামে অভিহিত তাদেরকে পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে বলা হয় পাঠান।

বিহার ও আরব, ইরান থেকে যারা বাংলাদেশে এসে বসতি স্থাপন করেছে, তিন জেনারেশন পর তারা বাংলাকে নিজেদের মাতৃভাষা হিসেবে গ্রহণ করলে বাঙ্গালী হয়ে যায়। বরং পশ্চিম থেকে আগত বলে কিছুটা খান্দানী বাঙ্গালী হিসেবে স্বীকৃত হয়। আফগানিস্তানে তেমন নয়। বরং বহিরাগতরা হাজার বছর তাদের মধ্যে থাকলেও ভিন্ন গোত্রীয় নামে পরিচিত হয় এবং তাদের বিয়ে-শাদী যথাসম্ভব স্বীয় গোত্রের মধ্যে অনুষ্ঠানের চেষ্টা করা হয়।

বাংলাদেশী মুসলিমদের মধ্যে জাতিভেদ প্রথা নেই যেমন আছে হিন্দুদের মধ্যে। কিন্তু হিন্দুদের পোষাক-পরিচ্ছদ, আচার আচরণ, কৃষি, সংস্কৃতি সংক্রান্ত হিন্দুয়ানী অনেক কিছুই আছে আমাদের মধ্যে। আফগানিদের মধ্যে হিন্দুয়ানী পোষাক-পরিচ্ছদ, বিয়ে-শাদীর অনুষ্ঠান, গান-বাজনা, নৃত্যগীত ইত্যাদি সংক্রান্ত শির্কী আচরণ কম। কিন্তু হিন্দুদের জাতিভেদ প্রথা অনেকটা পুরো মাত্রাই আফগান সমাজে বিদ্যমান।

বিয়ে-শাদীর ক্ষেত্রে বাংলাদেশে পাত্রের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চরিত্র, স্ত্রী প্রতিপালন ক্ষমতার উপর যতবেশী গুরুত্ব দেয়া হয়, বংশের উপর ততটা নয়। আন্তঃজেলা বা বহুদূরের এলাকার ক্ষেত্রে পাত্র-পাত্রীর বংশমর্যাদা তেমন একটা বিবেচ্য নয়। কিন্তু পাকিস্তানে বা আরো পশ্চিমে গিয়ে আফগানিস্তানে হিন্দুদের ন্যায় নিজ গোত্রের বাইরে প্রেমের বিয়ে না হলে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন হওয়া ব্যতিক্রম ঘটনা।

আন্তঃগোত্রীয় এবং আন্তঃআঞ্চলিক বিবাহ না থাকার কারণেই হয়ত আঞ্চলিক বাঙ্গালী মুসলিম সমাজে গোত্রীয় স্বাতন্ত্র তেমন নেই। কিন্তু আফগানিদের মুসলিম পরিচয় ছাড়াও প্রায় সকলেরই একটি গোত্রীয় বা

উপজাতীয় পরিচয় আছে। তাজিক, পাখতুন, পাঠান, উজবেক, তুর্কমেন প্রায় সকলের মধ্যেই উপজাতীয় পরিচয় এবং স্বাতন্ত্র চেতনা অত্যন্ত প্রবল যা এশিয়ার অন্যান্য মুসলিম দেশে ততটুকু দেখা যায় না।

ইসরাইলী উৎস

আফগানিস্তানের শতশত ক্ষুদ্র-বৃহৎ উপজাতিদের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো এবং শক্তিশালী উপজাতি হলো পাখতুন বা পাঠান। দ্বিতীয় বৃহৎ উপজাতীয় গোষ্ঠি তাজিক। পাখতুনগণ জনসংখ্যার দিক থেকে তাজিকদের দ্বিগুণ। প্রধান দু'টি উপজাতি পাখতুন এবং তাজিকগণ তাদের উৎস সন্ধান করে বনি ইসরাইল এবং হযরত মুসা (আঃ)-এর বংশধরদের মধ্যে।

সুদূর অতীতকালের কোন এক ইসরাইলী নবী বর্তমান পাঠানদের কোন পূর্ব পুরুষকে পাঠান উপাধি দিয়েছিলেন। ঐ নবীর বাসস্থান ছিল সিরিয়ায়। সিরিয়ার ভাষায় পাঠান শব্দের অর্থ নৌকা বা জাহাজের হাল বা রাডার। এই পাঠান শব্দই পাখতুন বা পাঠান উপজাতির নামের উৎস বলে অধিকাংশ পাখতুন বা পাঠান বুদ্ধিজীবী মনে করেন।

বেবিলনের সম্রাট নেবুচান্দ নজর বনি ইসরাইলের একটি দলকে বন্দী এবং দাস হিসেবে মেডিয়া রাজ্যে নিয়ে আসেন। দাসত্ব হতে মুক্তির সন্ধানে তারা পূর্ব দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। তরা শেষ পর্যন্ত ইরান পার হয়ে আফগানিস্তানে এসে স্থায়ী নিবাস স্থির করে।

নেবুচান্দ নজর এর ইসরাইলী বন্দীদের পুরো কবিলার দারা-পুত্র-পরিবার বিজেতাদের দাস শ্রেণীভুক্ত হয়। আফগানিস্তানে হিযরতকারী ইসলাইলী বন্দীদের আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে বিয়ে-শাদীর ফলে যে সন্তান হতো, তারা পাখতুন বা পাঠান নামে পরিচিত হতো। কিন্তু ইসরাইলী এবং আফগানিস্তানের স্থানীয় লোকদের সঙ্গে বিয়ে-শাদীর ফলে যে সন্তান হতো তারা অনারব বা তাজিক নামে অভিহিত হতো।

ইসরাইলী পাখতুনদের যারা পশ্চিমে সিজিস্তান এবং হেরাতে বসতি স্থাপন করে তারা পোপালজাঁই এবং আলিকজাঁই নামে পরিচিত। পূর্বদিকে তোবা পাহাড় অর্থাৎ কান্দাহারের নিকটে যারা বসতি স্থাপন করে, তারা আচাকজাঁই এবং সাদ্দোজাঁই বা দুররানী নামে অভিহিত হয়। যারা কাবুল অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে তারা হয়েছে বারাকজাঁই। কাবুলের পূর্বদিকে মহামন্দ পার্বত্য অঞ্চলে যারা বসতি স্থাপন করে তারা মাহমান্দজাঁই বা মহমন্দজাঁই নামে পরিচিত হয়।

আরো উত্তর-পূর্ব দিকে বাজাউর, সোয়াত এবং বুনার অঞ্চলে যারা আসে তার ইউসুফজাঁই নামধারণ করেন। পেশোয়ার অঞ্চলে বসবাসকারী পাখতুনগণ পাঠান নামে পরিচিত হয়। পুশতু ভাষায় জাঁই শব্দের অর্থ বনু, বনি, পুত্র, বংশধর, কবিলা।

আর্য উৎস

ইরানী এবং আফগানীরা নিজেদেরকে প্রাচীন আর্যদের বংশধর বলেও দাবী করে থাকেন। ইরানের শাহানশাহ রেজা শাহ পাহলবী আর্য মেহের বা আর্যসূর্য উপাধি ধারণ করেছিলেন। কাবুলের যে ময়দান বা স্কোয়ারে ডঃ নজিবুল্ল্যাহকে ফাঁসি দেয়া হয় তার নাম আরিয়ানা স্কোয়ার। আরিয়ানা অর্থ আর্য। টলেমী (খৃঃ পূঃ ২য় শতাব্দী) তার ভূগোলে বর্তমানে আফগানিস্তান অঞ্চলকে আরিয়ানা বলে উল্লেখ করেছেন।

ইসরাইলী আফগানদের পরবর্তী বংশধরদের এক দল হিন্দুস্তানে এসে এ দেশের জনগণের মধ্যে মিশে যায়। আরেক দল আফগানিস্তানের ঘুর প্রদেশে বাসস্থান নির্ধারণ করে। তারাও পরে ভারতে প্রবেশ করে। অপর দল রাজপুত হিসেবে ভারতে থেকে যায়। এরা সূর্যবান বা সূর্যবংশীয় বলে নিজেদেরকে পরিচয় দেয়।

সূর্যবাউর বা সূর্যবান বা সূর্যবংশীয় বলে পাখতুন চিন্তাবিদগণের একটি অংশ আত্মপরিচয় দিয়ে থাকেন। মহাভারতের উপাখ্যান রচিত হয়েছে সূর্যবংশীয় এবং চন্দ্রবংশীয়দের যুদ্ধ কেন্দ্রীক। সূর্যবংশয়ীরা পরাজিত হয়ে আফগানিস্তানে চলে যায়। সূর্যবংশী আফগান পাখতুনগণ গঙ্গাতীর ত্যাগ করে আফগানিস্তানের হেলমন্দতীরে এবং কাবুল-কান্দাহার অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। হেলমন্দ নদী হিন্দুকুশ পর্বত হতে প্রবাহিত হয়ে সিস্তান বা সিজিস্তান মরুপথে ধারা হারিয়ে ফেলে।

পুশতু ভাষা ইন্দো-ইউরোপীয়া ভাষা গ্রুপের অর্থাৎ বিভাগের অন্তর্ভুক্ত বিধায় পাখতুনদের আর্য সম্পর্কটি অধিকতর গ্রহণযোগ্য হয়েছে।

ভারতীয় আর্য পাখতুন বা পাঠানদের বহু গোত্র আফগানিস্তানে প্রত্যাবর্তন করে ঐ দেশে বসতি স্থাপন করে। তাদের পূর্বপুরুষদের গোত্রীয় পরিচয়ও তারা সংরক্ষণ করেছে।

বর্তমান পাঠান বা পাখতুন বা পুশতুনদের মধ্যে কয়েকটি ক্ষুদ্র গোত্র আছে যাদের মূল ভারতে বলে তারা দাবী করে। এদের মধ্যে রয়েছে ক্ষত্রিনা (ভারতীয় ক্ষত্রিয়), শিওরানী (ভারতীয় শিবের অনুসারী), কাকার (পাঞ্জাবের গাকার),

তোরী (তুয়রী রাজপুত্র)। এ সমস্ত পাঠান বা পাখতুন উপগোত্রগুলো সুলেমান পর্বত এবং আফগান পূর্বাঞ্চলে বেলুচিস্তানের কাছাকাছি অঞ্চলে বাস করে এবং তারা মুসলিম।

ওয়াজি, লোহানী, কাকার, গিলজাঁইও পাঠানগণ পারিন্দিয়া বা পারবিন্দিয়া নামেও পরিচিত। ফারসী ভাষায় পারবিন্দিয়া অর্থ হলো ব্যবসায়ী। আফগানিস্তান এবং পাকিস্তানের মধ্যে সীমান্ত ব্যবসায়ী কারাভা এরাই পরিচালনা করে থাকে। কাবুলের সূদী ব্যবসায়ীরা সুদূর বাংলাদেশে চল্লিশের দশকেও মহাজনী কাজ কারবার চালাতো।

গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস পাকতিয়া এবং পাকতিন বলে যাদের উল্লেখ করেছেন তারা আফগানিস্তানের পাখতুন। গজনী প্রদেশের পূর্বদিকের দু'টি প্রদেশের নাম পাকতিয়া এবং পাকটিকা।

পাখতুন পুশতুন, পাঠান ইত্যাদির শাব্দিক পার্থক্য

বর্তমানে পাঠান বা পাখতুনগণ তাদের পূর্ব পুরুষ হিসেবে এক ব্যক্তিকে চিহ্নিত করে। তার নাম ছিল কায়েস বা কিস। তিনি মদীনায় গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) তার নাম রাখেন আবদুর রশিদ। এই আবদুর রশিদকে তিনি তার কবিলার পথ প্রদর্শক হিসাবে নিয়োগ করেন। রশিদ শব্দের অর্থ পথ প্রদর্শক। পথ-এর ইংরেজী প্রতিশব্দ 'পাথ'। সংস্কৃত শব্দ 'পথ', ইংরেজী শব্দ 'পাথ' পারসী শব্দ 'পাঠান' কাছাকাছি শব্দ। পথ শব্দটি হতে পাঠান শব্দের উৎস হতে পারে।

পাঠান শব্দটি পাশত শব্দ হতে উদ্ভুতও মনে করা হয়। তাজিক এবং পারসী ভাষায় পাশ্ত শব্দের অর্থ হলো পাছা, পশ্চাত বা পিছন দিক। পাখতুনগণ সুলেমান পর্বতমালার পশ্চাত বা পশ্চিম দিকে বসবাস করতো বলে তাদেরকে পশ্চতান বলা হতো। এই পশ্চতান শব্দটি রূপান্তরিত হয়ে পুশতুন এবং পাঠান শব্দে পরিণত হয়েছে।

পাখতুন, পাখতুনা, পুশতুন, পুকতা, পুকতো, পুসতা, পুসতো, ইত্যাদি শব্দসমূহের বিভিন্নরূপ অর্থ এবং ব্যাখ্যা আছে। পাখতুন শব্দটি একবচন। এর বহুবচন হলো পাখতুনা। 'খা' শব্দের অর্থ দেশ। পাখতুন বা পুশতুনগণ তাদের দেশকে বলে পাখতুন খা। ভাষাকে বলে পুশতু।

পুকতা বা পুকতু শব্দের অর্থ হলো উচ্চভূমি। পাখতুন বা পুসতুন অর্থ হলো পর্বতবাসী বা উচ্চভূমিবাসী। পাকতুনিস্তান বা পাখতুন ভূমির বা পূর্বাঞ্চলে পাখতুনদের পরিচয় প্রকাশে শব্দে ব্যবহার হয় পাখতুন, তুচ্ছার্থে পুকতা।

অপেক্ষাকৃত পশ্চিমের কান্দাহারী ভদ্র অঞ্চলে নরম শব্দ পুশতুন শব্দ ব্যবহার হয় মানুষ বুঝাতে। কিন্তু ভাষা বুঝাতে কাবুল অঞ্চলে ব্যবহৃত শব্দ হলো পুশতা এবং কান্দাহার অঞ্চলে ভাষা বুঝাতে ব্যবহৃত হয় পুতু বা পুকতো বলে।

পুকতা ও পুকতো, পুশতা ও পুশতো শব্দাবলীর পার্থক্যটি অনেকটা আমাদের দেশের জুতা, জুতো, সূতা, সূতো, মন, মোন শব্দের পার্থক্যের মতো। পূর্ব বাংলায় আমরা ব্যবহার করি সূতা, জুতা। পশ্চিম বাংলায় বাঙ্গালীরা ব্যবহার করে সূতো, জুতো, ইত্যাদি নরম শব্দ।

আমরা জাতি বা দেশগতভাবে বাংলাদেশী নাগরিক, কিন্তু ভাষাগতভাবে বাঙ্গালী। পাঠানরাও তেমনি গোত্রগতভাবে পাখতুন। কিন্তু ভাষাগতভাবে পুশতুন।

অভিজাত পাকতুন বা পাঠান

পাখতুন বা পুশতুনগণ নিজেদেরকে অপাকতুনদের থেকে অধিকতর খান্দানী মনে করে। এমনকি তাদের এক গোত্র অন্য পাখতুন গোত্র হতেও নিজেদেরকে অভিজাত মনে করে। খান্দানী পাখতুনগণ অন্যদেরকে পাখতুন বা পুশতুন বলে স্বীকার করতেও নারাজ। অন্য জাত বা অঞ্চল হতে যারা পাখতুন বা পুশতুন এলাকায় শত শত বছর বাস করেছে তাদেরকে পাখতুনগণ ভিন্ন নাম দিয়ে চিহ্নিত করে। যেমন— তাজিক, উজবেক, হিন্দুকী, গুজব, তুর্ক, জাঠ ইত্যাদি।

কান্দাহারবাসী পাখতুনদের তুলনায় কাবুলের পাখতুনগণ বিভিন্নমুখী গোত্রের সঙ্গে বিবাহের ফলে অধিকতর কসমোপলিটান হয়ে উঠেছেন। সুলেমান পর্বত এবং এর শাখা-প্রশাখা অঞ্চলে বসতি স্থাপনকারী এবং কান্দাহারী পাখতুনগণ নিজেদেরকে অধিকতর খাঁটি এবং খান্দানী পাখতুন মনে করে।

কান্দাহারী পাকতুন বা পাঠানদের অধিকতর আত্মমর্যাদা এবং স্বাতন্ত্রবোধ সম্পন্ন হওয়ার কারণও আছে। ঐতিহ্যগতভাবে তারা সামরিক জাতি। বিজেতাদের সামরিক বাহিনীতে কাজ করা ছিল তাদের পেশা। এর সাথে যুক্ত হয়েছে ইসরাইলী বা নবী বংশীয়দের সাথে সম্পর্কে ঐতিহ্য চেতনা, গোত্রীয় আচরণ বিধি, ভাষা, অন্তর্মূখীতা, রক্ষণশীলতা, সরল জীবন যাত্রা।

পাকতুনগণ উচ্চভূমি এবং পার্বত্য অঞ্চলবাসী। সমতলভূমিতে বসবাসকারী পারসীয়ান হেরাতী বা তাজিক কৃষকদের থেকে তারা অধিকতর পরিশ্রমী, সাহসী এবং কষ্টসহিষ্ণু। সমতলবাসীদের সঙ্গে যুদ্ধ বিগ্রহে তারাই অতীতে বিজয়ী হয়েছে। পাখতুনরাই অন্যদের এলাকা এবং সম্পদ দখল করে তাদেরকে অধীনস্ত করেছে।

পাকতুন বা পাঠান আহমদ শাহ আবদালী সর্বপ্রথম আফগানবাসী যিনি আফগানিস্তানে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করে সমগ্র আফগানিস্তানকে ঐক্যবদ্ধ করেছেন। দুররানী সাদ্দোজাই এবং বারাকজাঁই রাজবংশই ১৭৪৭ হতে ১৯৭৮ সনের ৩০শে এপ্রিল (নূর মুহাম্মদ তারাকীর কম্যুনিস্ট বিপ্লব) পর্যন্ত আফগানিস্তানের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইতিহাস এবং ঐতিহ্যগতভাবে তাজিকী, উজবেকী, এবং হেরাতী অপেক্ষা কাবুল-কান্দাহারী পাঠানগণই নিজেদেরকে আফগানিস্তান শাসন পরিচালনার অধিকতর হকদার মনে করে। বর্তমান তালিবান আন্দোলনের মূলধারার নেতৃত্ব কান্দাহার অঞ্চলের পাকতুনদের হাতে।

৫

আফগান-তাজিক উপজাতি

ইসলাম প্রচারের পূর্বে আফগানিস্তান, মঙ্গোলিয়া এবং মধ্য এশিয়ায় ঠাণ্ডা প্রতিহত করার লক্ষ্যে জনগণের মাথা ঢেকে রাখার অভ্যাস ছিল। তা ছিল অনেকটা আমাদের দেশে মাঘের শীতে গরম কাপড়ের মাফলার মাথায় জড়িয়ে রাখার স্টাইলে। বর্তমানে আফগানিস্তানের অধিকাংশ মুসলিম অধিবাসী পাগড়ি পরিধান করে থাকেন। আফগানী শিখগণও পাগড়ি পরেন।

মুসলিমদের পরিহিত পাগড়ির যে ধরন তা আরবীয়। পাগড়ির একাংশ (শান্তা) পিছন দিকে ঝুলিয়ে রাখা আরবীয় রীতি। আফগানিস্তান বা মধ্য এশিয়ায় পাগড়ি হয় গরম কাপড়ের এবং উলের। আরব দেশের পাগড়ি সূতার ও পাতলা কাপড়ের। রাতের বেলায় শীত থেকে রক্ষা পাওয়া এবং দিনের বেলায় উড়ন্ত ধূলা হতে মস্তক হেফাজত করা পাগড়ির একটি উদ্দেশ্য।

দ্বীনদার মুসলমান সুন্নাহ হিসাবে পাগড়ি পরেন। আরবীয় পাগড়িকে আফগানিস্তানী ভাষায় তাজ বলা হয়। তাজ শব্দটি একটু বিকৃত হয়ে পারস্যে তাজি এবং তা হতে তাজিক হয়ে গেছে। আরবী মুসলিম শব্দটি ফারসী ভাষায় 'মুসলমান' হয়ে ভারতে প্রবেশ করেছে।

বহু আরব ও তুর্কীদের সম্বন্ধে কথা বলার সময় তাদেরকে উল্লেখ করতো তুর্ক এবং আরবদেরকে আরব অথবা তাজ বলে। আরব এবং স্থানীয় অধিবাসীদের সংমিশ্রণে যে জনসমষ্টি আফগানিস্তানে গড়ে ওঠে তাদেরকে মূল আরব থেকে পার্থক্য করার জন্য তাজিক বলে উল্লেখ করা হতো।

মরুচারী আরবরা ঘোড়সওয়ার এবং বিজয়ী হিসাবে আফগানিস্তানে প্রবেশ করেন। শীতল আবহাওয়া, প্রচুর সুস্বাদু ফল আস্বাদন, আরব রক্তের ঐতিহ্য, ইজ্জত এবং অন্যান্য বহুবিধ কারণে আরব বংশধর তাজিকগণ আরাম-আয়েশী হয়ে ওঠে। আরাম-আয়েশের কারণে তারা আর্থিকভাবে দরিদ্র হয়ে পড়ে। সুন্দর চেহারা, উচ্চতা, মোটা হাড় ও দেহ সৌষ্ঠবে তাজিকগণ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। তারা প্রকৃতিগতভাবে বর্তমানে সহজ-সরল, ধীর-স্থির শান্তি প্রিয়, মিতব্যয়ী, সামাজিক ও আনন্দপ্রিয়। ফলে উজবেক, তুর্ক এবং পুশতুনদের তুলনায় সামরিক বিভাগে চাকরি ও দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রে তাজিকগণ অনেকটা পিছিয়ে আছে। তাদের তুলনায় পাঠানরা অপেক্ষাকৃত সাহসী, বলিষ্ঠ, কষ্ট সহিষ্ণু এবং সংগ্রামী।

বিংশ শতাব্দীতে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা করে তাজিকগণ কিছুটা এগিয়ে এসেছে, কিন্তু সংগ্রামী নেতৃত্বে আফগানিস্তানে পুশতুন এবং পাঠানদের কর্তৃত্বের সম্ভাবনাই অধিকতর বেশী। পানশীর সিংহ তাজিক বীর আহমদ শাহ মাসুদ তাদের মধ্যে এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম।

আফগান জনগণের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, তারা বর্তমান জড় সভ্যতার প্রভাবে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো অবিভূত হয়নি। তাদের কাছে মালের চেয়ে মানের মূল্য বড়। অর্থ, বিত্ত, প্রগতি, পাশ্চাত্য বন্ধুত্ব বা সাবাশের বিনিময়ে আফগান তাদের মান খোয়াতে রাজী নয়।

বিংশ শতাব্দীতে রাশিয়া আফগানিস্তান জয় করে আরব সাগরের উষ্ণ জলের সংস্পর্শে আসার বহু চেষ্টা করেছিল। আফগান জনগণ মরিয়া হয়ে তা বাধা দিয়েছে। আরব সাগরতীরে কোন সামুদ্রিক সুবিধা রাশিয়ানরা পায়নি। মধ্য এশিয়ার আমদানী-রপ্তানী বাণিজ্যের জন্য আরব সাগরতীরে যেকোন একটি বাণিজ্যিক বন্দর তাদের খুবই প্রয়োজন ছিল। রাশিয়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নে বাধার সৃষ্টিতে আফগান জনগণকে সাহায্য করেছিল তৎকালীন ভারতের বৃটিশ সরকার।

ইংরেজরা বার্মা থেকে শুরু করে বেলুচিস্তান সীমানা পর্যন্ত তাদের একচ্ছত্র অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিল। আফগান জয়ের লোভ তাদেরও ছিল। পরপর ৩টি আফগান যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ইংরেজরা যুদ্ধে জয়লাভ করে কয়েকবারই কাবুল অধিকার করে। কিন্তু ধরে রাখতে পারেনি। পাশ্চাত্য জড় সভ্যতা ও প্রগতির অন্ধ মোহে ভারতীয় রাজন্যবর্গ এমনকি যুদ্ধপ্রিয় রাজপুত বৃটিশের পরাধীনতা মেনে নিয়েছিল, কিন্তু আফগান জনগণ তা মেনে নেননি।

বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে রাশিয়ানরা আফগানিস্তানে তাদের তল্পীবাহি সরকার কায়েমের চেষ্টা করেছিল। অক্টোবর ১৯৭৯ থেকে এপ্রিল ১৯৯২ পর্যন্ত কাবুলে রাশিয়ার অনুগত সরকার প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু আফগান জনগণ তাদেরকে মেনে নেননি।

সোভিয়েত সাম্রাজ্য খন্ড-বিখন্ড হয়ে যাওয়ার বহু কারণের মধ্যে একটি ছিল তাদের আফগান বিজয়ের সাধ। আফগানিস্তানের দরিদ্র জনগণ এক যুগের বেশি সময় যাবৎ সুখ-স্বাচ্ছন্দ ও শান্তি বিসর্জন দিয়ে পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম পরাশক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন, কিন্তু মাথা নত করেননি। তাদের এ সংগ্রামে প্রধান সহায়ক ছিল যুক্তরাষ্ট্র, সৌদি আরব এবং পাকিস্তান।

সোভিয়েত বাহিনী আফগানিস্তান থেকে প্রত্যাহার হওয়ার পর আফগান মুজাহিদ বাহিনীগুলোর বিভিন্ন অংশের মধ্যে শুরু হয় অন্তর্ঘাতি যুদ্ধ। এই সুযোগে যদি পাকিস্তান, ইরান, ভারত বা রাশিয়া মনে করে যে, আফগানিস্তানের যুদ্ধাংদেহী যেকোন এক দলের কাঁধে সওয়ার হয়ে তারা আফগানিস্তানে নিজ প্রভাব বিস্তার করবে, তবে তা হবে একটা দুরাশা মাত্র। কোন একটি বহিঃশক্তির অতিমাত্রায় অস্তিত্ব সুস্পষ্ট হয়ে উঠলে আফগান জনগণ সে দেশের বিরুদ্ধে চলে যাবে।

বিদেশী শক্তি এবং আফগান জনগণের শুভাকাঙ্ক্ষী দেশসমূহের সঠিক পদক্ষেপ হবে যুদ্ধরত আফগান দলগুলোকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে অন্তর্ঘাতি যুদ্ধ হতে বিরত রাখা। প্রতিদ্বন্দ্বি দলগুলোরও উচিত অস্ত্রের মাধ্যমে নয়, আলোচনার মাধ্যমে প্রতিপক্ষ হতে সুযোগ-সুবিধা আদায় করে সরকার গঠন ও পরিচালনায় নিজেদের কিছু সুবিধা করে নেয়া।

বিজয়ী শক্তিকে সানন্দচিত্তে বরণ করে নেয়া নয়, বরং বিজয়ীকে পরাজিত করা এবং এ লক্ষ্য অর্জন না হওয়া পর্যন্ত আত্মঘাতি যুদ্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার প্রবণতা আফগান মনমানসিকতা ও সংস্কৃতিতে অত্যন্ত প্রবল। এর ফলে যুদ্ধের মাধ্যমে কোন পক্ষেরই চূড়ান্ত বিজয় দুঃসাধ্য।

৬

আফগান হাজারা উপজাতি

বাংলা ভারতে হিন্দুদের মধ্যে আছে সামাজিক জাতিভেদ প্রথা। জাতিভেদ প্রথাধীন সমাজে এক জাতির সঙ্গে অপর জাতির বা বংশের যুবক-যুবতীর বিয়ে-শাদী পর্যন্ত ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে নিষিদ্ধ। আফগানিস্তানে প্রচলিত রয়েছে উপজাতি প্রথা। বাংলা ভাষায় বর্তমানে জাতি বলতে সারা দেশবাসীকে বুঝায়। উপজাতি বলতে জাতির ক্ষুদ্রাংশকে বুঝে থাকি। বাংলাদেশের উপজাতি বলতে সাধারণতঃ আদিবাসী বা পাহাড়িয়া অঞ্চলের ক্ষুদ্র-বৃহৎ জনগোষ্ঠিকে বুঝায়।

পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিসমূহের মধ্যে সংখ্যার দিক থেকে কোন ভারসাম্য নেই। লক্ষ লক্ষ লোক নিয়েও উপজাতি হতে পারে। আবার হাজার মানুষের সমষ্টিতে একটি উপজাতি হয়, যদি তাদের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য চেতনা থাকে। আফগানিস্তানের অবস্থাও তেমনি। আফগানিস্তানে সবচেয়ে বড় উপজাতি হলো পাঠান বা পাখতুন। পাখতুন বা পাঠানগণ জনসংখ্যার ৫৩% হতে ৬০%। তাজিকগণ মোট জনসংখ্যার ২৫% হতে ৩৬%। উজবেক উপজাতি ৬% হতে ৮% এবং হাজারা হলো ৩% হতে ৯%।

আফগানিস্তানে কখনও রাষ্ট্রীয় জরিপ হয়নি। ফলে জনসংখ্যার হিসাব অনেকটা যিনি বলেন বা লিখেন, তার আন্দাজ এবং অনুমান নির্ভর। সাধারণভাবে বলা হয় তাজিকদের সংখ্যা পাখতুনদের অর্ধেক। হাজারা উপজাতির সংখ্যা উজবেকদের অর্ধেক বা সমান। হাজারা, উজবেক, তাজিক এবং পাখতুন – এ চার উপজাতি হলো জনসংখ্যার প্রায় ৯৮ ভাগ। অন্যান্য হাজারখানিক আফগান জাতি/উপজাতি মিলে হয় জনসংখ্যার শতকরা দু'ভাগ।

হাজারা উপজাতি হলো সংখ্যার দিক থেকে তৃতীয় বা চতুর্থ। আমাদের ধারণা উজবেকদের থেকে হাজারাদের সংখ্যা আফগানিস্তানে বেশী হবে। উজবেকদের শুধুমাত্র বলখ্ এবং বাদকশানে দেখা যায়। কিন্তু হাজারাগণ মধ্য আফগানিস্তানের প্রায় পাঁচটি প্রদেশে কমবেশী উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় বসবাস করে।

হাজারা উপজাতির উৎস

আফগান ভাষাবিদদের ধারণা হলো ফারসী হাজার শব্দ হতে হাজারা শব্দটি উদ্ভূত।

দিগ্বিজয়ী তাতারী মঙ্গোলবীর চেঙ্গিশ খান (১১৬৭-১২২৭ খৃঃ) আফগানিস্তানে তীব্র বিরোধিতার সম্মুখীন হন। অন্য কোন দেশ বিজয়ে তাকে অতো বাধার সম্মুখীন হতে হয়নি। তাতার সম্রাট চেঙ্গিশ খানকে সুদীর্ঘ ১০(দশ) বছর পর্যন্ত সংগ্রাম করে হাজারাজাত এলাকায় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হয়।

এ অঞ্চলের প্রাচীন বাসিন্দারা ছিল ইরানীয়ান জাতিভুক্ত। আত্মাভিমানী পারসীয়ানরা দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের পর চেঙ্গিশ খানের কর্তৃত্ব স্বীকার করে নেয়। দুর্ধর্ষ তাতার বাহিনীর সঙ্গে সংগ্রামে প্রাচীন পারসী গোত্রভুক্ত পুরুষদের এক বিরাট অংশ নিহত হয়।

এ অঞ্চলে ছিল বহুসংখ্যক দূর্গ এবং পাথর নির্মিত প্রাসাদ। গিরিশৃঙ্গে এ সমস্ত পাথর প্রাসাদ নির্মাণ ছিল বড় কষ্টসাধ্য। দুর্গম গিরিশৃঙ্গে আরোহণ করা বিপদসংকুল। এ সমস্ত পার্বত্য প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ এখনও কিছু কিছু দেখা

যায়। দৃঢ় মজবুত এবং প্রশস্ত দেওয়াল দেখে মনে হয় যে, এ প্রাসাদগুলো মানব তৈরি নয়। স্থানীয় অধিবাসীরা পর্বতচূড়ায় বৃহৎ ইমারতের ধ্বংসাবশেষ, প্রশস্ত এবং উঁচু সীমানা দেওয়াল, বৃহৎ আঙ্গিনা ইত্যাদি দেখে মনে করে যে, এ প্রাসাদগুলো ছিলো জ্বিনের তৈরি। যারা পর্বতচূড়ায় অবস্থিত পাথরের তৈরি প্রাসাদের মালিক অথবা বসবাসকারী ছিল, তারা বিনাযুদ্ধে চেঙ্গিশ বাহিনীর নিকট নতি স্বীকার করেননি।

তাতারী দুর্ধর্ষ মঙ্গোল চেঙ্গিশ খানকে বর্তমান হাজারা অঞ্চলটি পদানত রাখতে খুবই বেগ পেতে হয়েছিল। একটি অঞ্চল বিজয়ের পর তিনি হাজার সৈন্যের একটি বাসস্থান বা দূর্গ বা ক্যান্টনমেন্ট নির্ধারণ করে ওর অধিবাসীদের অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধশালী করে দিতেন। চেঙ্গিশ খান তার বিজয় অভিযানকালে শত শত মঙ্গোলকে পুত্র-কন্যা, পরিবার-পরিজনসহ সাথে এনেছিলেন। এদের এক অংশ আফগানিস্তানে থেকে যায়। শুধু মঙ্গোল নয়, স্থানীয় লোকদের মধ্যে যারা তার আনুগত্য স্বীকার করতো, তারা আর্থিক অনুগ্রহ-ধন্য হতো। হাজারী মঙ্গোল সৈন্যের সেনানিবাস হতেই হাজারা শব্দটি এসেছে বলে মজবুত ধারণা।

চেঙ্গিশ খান কর্তৃক আফগানিস্তান ত্যাগের পরেও হাজারা এলাকায় দশটি সেনানিবাস ছিল। আটকের নিকটবর্তী হাজারা এবং কাবুলের নিকটবর্তী হাজারুতেও চেঙ্গিশ খানের হাজার সৈন্যের সেনানিবাস ছিল। এ কারণে এ দু'টি স্থানের নাম উপরোক্ত রূপ হয়েছে বলে কেউ কেউ ধারণা করে থাকেন।

কোন একটি অঞ্চলের হাজার হাজার বাসিন্দাকে স্বেচ্ছায় বা ইচ্ছার বিরুদ্ধে অন্যত্র অপসারণ বিংশ শতাব্দীতেও চলে। সোভিয়েত রাশিয়ায় বলশেভিক বিপ্লবের পর এক অঞ্চলের শুধু হাজার হাজার নয়, লক্ষ লক্ষ বাসিন্দাকে অন্য অঞ্চলে নির্বাসন দেয়া হতো। স্থানীয় জনসাধারণ বহিরাগতদেরকে অনেক ক্ষেত্রেই আপন করে নিতে পারে না। যে ধরনের সমস্যা এখনও কমনওয়েলথ অব ইনডিপেনডেন্ট স্টেটস (সি আই এস)-এর আর্মেনিয়া, জর্জিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্রে বিরাজমান।

উত্তর ভারতে অযোধ্যার নিকট রোহিলা বা রোহিলখন্ড নামে একটি জেলা আছে। রোহিলখন্ডের যোদ্ধারা একসময় দিল্লী দখল করে তৎকালীন দুর্বল মুঘল সম্রাটের অভিভাবক সেজেছিলেন। তা ছিল স্বল্পকালের জন্য। ভারত বিজয়ী আফগান মহাবীর সুলতান মাহমুদের সঙ্গে রোহ এলাকার বহু সামরিক যোদ্ধা আফগান পরিবার ভারতে প্রবেশ করেছিল। ভারতে জীবনযাত্রার সুবিধা দেখে তারা আর আফগানিস্তানে ফিরে যাননি। তাদেরকে অযোধ্যা প্রদেশের রোহিলখন্ড অঞ্চলে পুনর্বাসিত করা হয়েছিলে।

সুলতান মাহমুদের সঙ্গে যে রোহিলারা ভারতে এসেছিলেন, তারা শুধু নিজেদের পরিবারবর্গ নয়, উট, ভেড়া, গরু, গাধা এবং পশুপাল নিয়ে এসেছিলেন। ছাগল-ভেড়া খাদ্যের জন্য প্রয়োজন ছিল। অশ্ব ও গাধা বাহন হিসেবে ব্যবহৃত হতো। তৎকালে মানুষের জীবনযাত্রা ছিল সরল। আসবাবপত্র থাকতো কম। বাসভবন হিসেবে তাঁবুই ছিল অনেকের জন্য যথেষ্ট।

তাতার মঙ্গোলীয় ঐতিহ্য

হাজারা এলাকার জনসাধারণের শারীরিক বৈশিষ্ট্য তাতারী এবং মঙ্গোলদের স্মৃতি মনে করিয়ে দেয়। মঙ্গোলীয় তাতারগণ চেঙ্গিশ খানের পূর্বে এ অঞ্চলে বিরাট সংখ্যায় বসতি স্থাপন করেছিলেন বলে মনে হয় না।

আফগানী হাজারাগণ অবশ্য নিজেদেরকে হাজারা বলে পরিচয় দিতে অনাগ্রহী। তারা নিজেদেরকে হাজারাদের অন্তর্ভুক্ত ক্ষুদ্র গোত্রীয় নামে পরিচয় দিয়ে থাকে।

দাহিজাঙ্গি, দাহিকুন্দি, দাহি-রাওয়াদ, দাহিচোপান, দাহিয়া, ঘুরি, জাগুরি, বিষুদ ইত্যাদি গোত্রীয় নামগুলো হাজারা উপজাতির মধ্যে বহুল ব্যবহৃত। ট্রান্সককেসিয়ার দাহি গোত্রের সঙ্গে এদের কিছুটা সাদৃশ্য আছে। দাহিগোত্র খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে 'শক'দের সাথে সংযুক্ত হয়ে এ অঞ্চলে অভিযান পরিচালনা করেছিল।

হাজারা উপজাতি অধ্যুষিত এলাকার পশ্চিমাঞ্চলের চারময়াদ, জামশেদী, ফিরোজকহি, তাইমুনী গোত্রসমূহ হাজারা দাহিগোত্রদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এরা সকলেই তাতার। তাতারগণ চেঙ্গিশ খানের মঙ্গোলীয় জাতির একটি শাখা।

বৃটিশরা হাজারাজাতের যোদ্ধাদেরকে গুর্খাদের ন্যায় বিশ্বস্ত মনে করতো। যদিও গাত্র, বর্ণ এবং রংয়ের পার্থক্য আছে, কিন্তু শারীরিক এবং চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যে তাদের মধ্যে বেশ মিল আছে।

হাজারাজাত

আফগান হাজারা উপজাতি যে যে এলাকায় বসবাস করেন, সমগ্র এলাকাটি একটি সাধারণ শব্দ বা নামে অভিহিত। তা হলো হাজারাজাত। এ এলাকায় হাজার হাজার মঙ্গোল বসতি স্থাপন করেছিল। হাজারাজাত অঞ্চলের বিস্তার হলো পূর্বে কাবুল এবং গজনী প্রদেশ থেকে পশ্চিমে হেরাত পর্যন্ত এবং দক্ষিণে কান্দাহার প্রদেশ থেকে উত্তরে বলখ। এই এলাকার প্রদেশসমূহ ঘুর, উরুজগান, বামিয়ান, হেলমন্দ, নিমরোজ ইত্যাদি।

বামিয়ান প্রদেশের গৌরবন্দ হতে হিন্দুকুশ পর্বত দু'শাখায় বিভক্ত হয়ে পশ্চিম দিকে বিস্তৃত। উত্তরে গুরুজিস্তান এবং সফেদবন্দ শাখা, দক্ষিণে ঘুর বা শিয়াবন্দ শাখা। হিন্দুকুশ পর্বতের এ দু'শাখার মধ্যস্থলে রয়েছে হারিরুদ নদী বিধৌত বিস্তৃত উপত্যকা।

হাজারাজাত অঞ্চলটি পার্বত্য, শিলাময়। গাছপালা কম। কৃষিদ্রব্য উৎপাদন স্বল্প। অধিবাসীদের আর্থিক অবস্থা অস্বচ্ছল। উপত্যকাসমূহ উর্বর এবং জনাকীর্ণ। অধিবাসীদের অধিকাংশই উপত্যকায় বসবাস করে।

হাজারাজাত অঞ্চলের পার্বত্যভূমি আফগানিস্তানের ছোট-বড় বেশ কয়েকটি নদীর উৎস। এর মধ্যে রয়েছে হারিরুদ বা হেরাত নদী, মুর্গাব নদী, হেলমন্দ নদী, আরগান্ধাব নদী। হেরাত নদীর তীরে অবস্থিত সুবিখ্যাত হেরাত নগরী।

মুর্গাব নদীর তীরে আফগান সীমার বাইরে উজবেকিস্তানের ঐতিহাসিক মার্ভ নগরী অবস্থিত। পূর্ব আব্বাসিয়া সম্রাজ্যের রাজধানী একসময় ছিল মার্ভ নগরী। হারুন-উর-রশিদের পুত্র মামুন-উর-রশিদ কয়েক বছর পর্যন্ত মার্ভ থেকে সমগ্র আব্বাসিয় সাম্রাজ্য শাসন করেন।

গ্রীক বেকটেরিয়ানরাও একসময়ে হাজারাজাত অঞ্চলে তাদের আধিপত্য বিস্তার করেছিল। পূর্বাঞ্চলে বৌদ্ধরাজগণ কর্তৃক নির্মিত চিতামন্ডপের নমুনা এখনও পাওয়া যায়।

ভাষা

হাজারাজাতের হাজারাগণ তাদের মাতৃভাষা প্রায় সম্পূর্ণ ভুলে গেছে। দু'চারটি তাতারী তুর্কী শব্দ এখানে সেখানে উচ্চারিত হতে দেখা যায়। হাজারাগণ পারসীকেই তাদের মাতৃভাষারূপে গ্রহণ করেছে।

চেঙ্গিশ খানের তাতার মঙ্গোলীয় সৈন্যগণ এ অঞ্চলের পারসী পুরুষদের হত্যা করে তাদের বিধবা এবং কন্যাদেরকে বিবাহ করে। মায়েরা সন্তানদেরকে নিজের ভাষাই শিক্ষা দেয়। পরবর্তী মঙ্গোল প্রজন্ম পিতৃভাষা ভুলে মাতৃভাষাকেই স্বভাষা হিসেবে গ্রহণ করে। তাছাড়া পারসী ছিল মঙ্গোল ভাষা হতে উন্নততর এবং সমৃদ্ধ।

মঙ্গোলরা অস্ত্র যুদ্ধে বিজয়ী হলেও ভাষা-সমরে পারসীদের কাছে হেরে যায়। ইরানী মেয়েরা শারীরিক সৌন্দর্যে অনুপম। দুর্ধর্ষ মঙ্গোলরা ইরানী মেয়েদেরকে তাদের ভাষা শিক্ষা দিতে ব্যর্থ হয় বরং নিজেরাই সুকণ্ঠী আর্য-বনিতাদের নিকট হতে তাদের ভাষা শিখে নেয়। ফলে এ অঞ্চলে মঙ্গোল এবং তাতারদের ভাষা বিলুপ্ত হয়ে যায়।

হাজারাজাত এলাকার তাতারী মঙ্গোলগণ এককালে সাহসী এবং দুর্ধর্ষ হলেও বর্তমানে তারা অধিকাংশই নিরক্ষর। আফগানিস্তানের অন্যান্য এলাকা থেকে নিরক্ষরতার হার এই অঞ্চলে বেশী।

ধর্ম

তাতারি মঙ্গোলরা শুধু যে ইরানী ভাষাই শিক্ষা লাভ করেছে তা নয়, তারা ইসলামের শিয়া মতবাদও ইরানীদের থেকে গ্রহণ করেছে। হাজারাজাতের উত্তর এবং পশ্চিম অংশের কিছু কিছু হাজারী সুন্নী মতবাদ গ্রহণ করেছে।

হাজারাজাতের অধিবাসীরা দরিদ্র এবং ধর্মপরায়ন। তারা গোত্রীয় প্রধান এবং ধর্মীয় মোল্লাদের প্রভাবাধীন। গোত্রীয় প্রধানদের মধ্যে কেউ ধর্মীয় নেতা এবং পীর হতে পারলে তাদের প্রভাব আরো বেশী হয়।

অর্থনৈতিক অবস্থা

কাজের সন্ধানে হাজারাজাতের আফগানিরা পাকিস্তানে আগমন করেন। পাঞ্জাবে মাটি কাটা, বাঁধ নির্মাণ, রাস্তা নির্মাণের কাজে হাজারাজাতের শ্রমিকেরা অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য। দারিদ্র্য এবং তাতারী শারীরিক বৈশিষ্ট্যের কারণে হয়ত হাজারাজাতের অধিবাসীরা অত্যন্ত কষ্ট সহিষ্ণু এবং পরিশ্রমী।

কাবুল, গজনী এবং কান্দাহারে হাজারাজাতের অধিবাসীরা শ্রমসাধ্য কাজগুলো করে থাকেন। বিশেষ করে শীতের ঋতুতে। গজনী এবং কাবুলে শীত কালে তুষার বৃষ্টি হয়। রাস্তাঘাট, গৃহের ছাদ এমনকি গাছের পাতায়ও সাদা বরফ জমে থাকে। রাস্তা এবং গৃহের ছাদের বরফ দূরীকরণে হাজারাজাতের শ্রমিকেরা অত্যধিক কর্মপটু।

শ্রমসাধ্য কাজে হাজারাগণ বিশ্বস্ত, এমনকি বুদ্ধিমান। কাবুল, কান্দাহারের অন্যান্য শহরেও গৃহভৃত্যের কাজ বেশীর ভাগ তারাই করে থাকে। অতীতে এই এলাকার লোকেরা দাস হিসাবে বিক্রয় হতো। গজনী সম্রাট মহান সুলতান মাহমুদের পিতা সবুক্তগীন তদীয় শ্বশুর এবং সুলতান মাহমুদের মাতামহ আলপ্তগীন ক্রীতদাস ছিলেন।

এখনো আফগানিস্তানের বিভিন্ন শহরে গৃহপরিচারিকা হিসাবে এ এলাকার মেয়েদেরকে দেখা যায়। অনেক ক্ষেত্রেই দরিদ্র বাবা-মাকে এককালীন টাকা দিয়ে গৃহপরিচারিকা ক্রয় বা ভাড়া করা হয়।

যদিও হাজারাজাতের অধিবাসীরা শ্রমজীবী হিসাবে অন্যান্য আফগানদের গৃহে, খামারে, দপ্তরে পরিচারিকা এবং শ্রমিক হিসাবে কাজ করে থাকে, কিন্তু তারা বড় লোকদের প্রতি বিশেষ করে কাবুলী এবং কান্দাহারীদের প্রতি

ঐতিহ্যগতভাবে বিদ্বেষ এবং শত্রুভাবাপন্ন। যদি তারা সঠিক এবং সাহসী নেতৃত্ব পায়, কাবুলী কান্দাহারীদের বিরুদ্ধে ধ্বজা ধারণে পরান্মুখ হবে না।

হাজারাজাতের অধিবাসীদের সঙ্গে সৎ ব্যবহার করে এলাকায় ইনসাফভিত্তিক সুশাসন ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হলে তাদের অবিচল আনুগত্য পাওয়া খুবই সহজ হবে।

আফগান গোত্রসমূহের উৎস, আচার, আচরণ, ইতিহাস, ঐতিহ্যে বৈচিত্র এবং অনৈক্য এত বেশী যে, এক জাতিভিত্তিক সরকার এবং রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা অনেকটা কষ্টকর। এক গোত্র ক্ষমতায় আসলে অন্য গোত্রের পক্ষে তাদেরকে মেনে নেওয়া সম্ভব হয় না। ফলে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের একটি গোত্রকে নিজেদের স্বার্থে অন্য গোত্রের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতো। কোন সরকার সুবিচার, ইনসাফ, সু শাসন, ধৈর্য ও ধর্মীয় অনুভূতির উপর অবিচলভাবে দৃঢ় থাকলে তাদের পক্ষে গোত্রাভিমানী, পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত গোত্রগুলোর মধ্যে ঐক্য ও সংহতিমূলক ইসলামী আদর্শ ভিত্তিক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ও সংস্কার সম্ভব।

৭
উজবেক ও গিলজাই উপজাতি

জাতিগতভাবে আফগান শব্দটির প্রথম ব্যবহার দেখা যায় ৯৮২ খৃষ্টাব্দে অজ্ঞাত আরব ভূগোলবিদ কর্তৃক লিখিত 'হুদুদ আল আলাম' গ্রন্থে। এ গ্রন্থটির লেখকের নাম অজ্ঞাত। উক্ত গ্রন্থে উল্লেখ আছে নানগ্রাহার (জালালাবাদ)-এর রাজ পরিবারের জন্যে 'আফগান' উপজাতি হতে স্ত্রী সংগ্রহ করা হতো।

সুলতান মাহমুদের রাজকীয় ইতিহাস লেখক আল-উতবি লিখেছেন যে, আফগানগণ সুলতান মাহমুদের সেনাবাহিনীর বিশিষ্ট অংশ ছিল।

মূর পরিব্রাজক ইবনে বতুতা ১৩৩৩ খৃষ্টাব্দে কাবুল ভ্রমণ করেন। তিনি কোহে সুলাইমানের অধিবাসী 'আফগান'দের সম্বন্ধে তার বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন।

উজবেক

আফগানিস্তানে তাতার বা তুর্কি জাতিভুক্ত বহু জনসমষ্টি বিভিন্ন সময়ে বসতি স্থাপন করেছিল। এদের মধ্যে অতি গুরুত্বপূর্ণ এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ তুর্কি উপজাতি হলো উজবেকগণ।

উজবেক তুর্কিগণ আফগানর্দের অপেক্ষা অধিকতর গৌরবর্ণ এবং সৌম্য কান্তি। তাদের মুখাবয়ব প্রশস্ত। তাতার তুর্কিদেরকে বলা হয় ষষ্ঠপদি মানুষ। অতিরিক্ত চারটি পদ হলো তাদের নিজস্ব অশ্বপদ। তুর্কিগণ অশ্বারোহী এবং দ্রুতগামী। পদব্রজে গতি হয় শ্লথ। অশ্বারোহী মানুষ দ্রুতগামী ।

শারীরিকভাবে দুর্বলদের পক্ষে নিয়মিতভাবে অশ্বারোহী হওয়া কষ্টকর। অশ্ব হলো তাতার তুর্কিদের নিয়মিত সঙ্গী। কোথাও যেতে হলে তারা পদব্রজে না গিয়ে ঘোড়ায় চড়ে যেতো। অশ্বারোহী সৈনদের বেতন হয় অপেক্ষাকৃত বেশী।

উজবেকগণ শুধু অশ্বারোহণে নয়, স্বাভাবিক কারণে অশ্ব পালনে পারদর্শী। ঘোড়া বিক্রয় ছিল তাদের একটি জীবিকা। অশ্ব প্রতিপালন ছাড়াও তাদের আরও একটি প্রিয় পেশা ছিল ভেড়া পালন। অশ্বারোহীদের স্বাস্থ্য থাকে ভাল। ক্ষুধাও হয় বেশী। রুটি এবং শাক্-সব্জিতে তারা তুষ্ট হতে পারেন না। তাদের প্রিয় খাদ্য হলো ভেড়ার গোস্ত। কারাকুলি ভেড়া অতি উন্নত মানের। কারাকুলির ভেড়ার চামড়াও অত্যন্ত দামী। ভেড়ার চামড়ার কারাকুলি টুপি খুবই জনপ্রিয়।

তাতার তুর্কি উপজাতির বিভিন্ন বিভাগ আছে। তুর্কি, তাতারী, উজবেকি, তুর্কমেনি, কিরঘিজিস্তান, কাজাক, কারলুক, চাগতাই ইত্যাদি তুর্কি উপজাতি আফগানিস্তানে বসতি স্থাপন করে।

তুর্কি উপজাতি যেখানে বসতি স্থাপন করেছে সে এলাকাকে বলা হয় তুর্কিস্তান। ইরানি তুর্কিস্তান, আফগানি তুর্কিস্তান, চীনা তুর্কিস্তান, রুশ তুর্কিস্তান এই শব্দগুলো বেশ পরিচিত এবং এলাকা ছিল চিহ্নিত।

তুর্কম্যানগণ আমুদরিয়া নদীর উপকূল বিশেষ করে দক্ষিণ উপকূলে বসতি স্থাপন করে। ওয়াকান এলাকায় বসতি নির্ধারণ করে কিরখিজগণ। এদেরও আদিনিবাস ছিল রাশিয়ান তুর্কিস্তান।

আফগান তুর্কিদের ভাষা মূল তুর্কি ভাষারই একটি অপভ্রংশ। আধুনিক তুর্কি ভাষার সঙ্গে এর মিল সীমিত বরং ফারসী ভাষার সঙ্গেই মিল বেশী।

আফগান তুর্কিদের বাসস্থান হিন্দুকুশ পর্বতের উত্তর দিকে। পশ্চিমে মুরগাব নদীর পূর্বকূল হতে পূর্বদিকে বাদকশানের রাজধানী ফয়েজাবাদ পর্যন্ত তুর্কি উজবেকিদের এলাকা।

উনবিংশ শতাব্দীতেও এ এলাকায় অর্ধ স্বাধীন ১০টি খান রাজকীয় বংশ প্রভাব বিস্তার করেছিল। কালক্রমে এই সমস্ত রাজবংশ বিলীন হয়ে যায়। দক্ষিণের আফগানগণ ক্রমশঃ তুর্কি এলাকা আমুদরিয়া পর্যন্ত করায়ত্ব করে নেয়।

আরবদের আফগানিস্তানে আগমনের পূর্বে এ অঞ্চলে বৌদ্ধ প্রভাব ছিল। পূর্ব ইউরোপ থেকে দিনারিক উপজাতি রাশিয়ায় প্রবেশ করে। মঙ্গোল আক্রমণের ধাক্কায় রাশিয়া হতে তারা প্রবেশ করে উত্তর আফগানিস্তানে।

আফগানদের মধ্যে সেমিটিক তুর্কী, ইরানিয়ান, ইউরোপিয়ান, আর্য এবং ভারতীয় বহু রক্তের সংমিশ্রণ ঘটছে।

গিলজাঁই

আফগানিস্তানের শক্তিশালী গিলজাঁই গোত্রের ভাষা পুকতো। অন্যদের কাছে তারা পাঠান বলেই পরিচিত। কিন্তু তারা নিজেদেরকে পাঠান হিসেবে পরিচয় না দিয়ে গিলজাঁই হিসেবে পরিচয় দিতেই পছন্দ করে। দক্ষিণ আফগানিস্তানের খাইবার হতে কাবুল, সফেদ কোহ পর্বতমালা, কান্দাহার হয়ে বেলুচিস্তানের পিশিন পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকায় তারা বাস করে। গিলজাঁইদের উপগোত্র হলো হোটাক, টৌখি, তারিন।

গিলজাঁইগণ পুকতুন বলে কথিত হলেও সেভাবে পরিচয় না দেয়ার কারণ হলো— তারা মূলতঃ তুর্কি খিলিচ গোত্রের বংশধর বলে দাবী করে। সবুক্তগীন তাদেরকে তুর্ক মুলুক থেকে দশম শতাব্দীতে আফগানিস্তানে নিয়ে আসেন। তারা পুখতুন মুলুকে বাস করে তাদের আচার-আচরণ এবং ভাষা-সংস্কৃতি গ্রহণ করেছে এবং পুখতুনদের সঙ্গে আন্তঃবিবাহে তারা পরান্মুখ নন।

গিলজাঁই গোত্র রাজনৈতিকভাবেও বেশ শক্তিশালী। আহমদ শাহ আবদালী দুররানী বংশীয় সাদ্দোজাঁই গোত্রের ক্ষমতাচ্যুতির পর তারা পায়েন্দা খান এবং দোস্ত মোহাম্মদ বংশীয় বারাকজাঁই গোত্রকে রাজনৈতিক সমর্থন দিয়ে বেশ প্রভাবশালী হয়ে ওঠে। আফগানিস্তানে রাজবংশীয় বারাকজাঁই গোত্রের পরই ছিল গিলজাঁইদের স্থান। বিগত দু'শত বছর পর্যন্ত তারা পুখতুন বারাকজাঁইদেরকে সমর্থন করে এসেছে। ভবিষ্যতেও স্ট্র্যাটেজিক কারণে তারা পাখতুনদেরকে সমর্থন করবে বলে আশা করা যায়।

গিলজাঁই গোত্রের এক অংশ এখনও যাযাবর বিচরণশীল। তারা গ্রীষ্মকাল কাটায় কাবুলে এবং সফেদ কোহ পার্বত্য অঞ্চলে। শীতকালে চলে যায় নিম্ন উপত্যকায় গারদেশের জুমরাট অঞ্চলে। কান্দাহারে তোবাহ পার্বত্য অঞ্চলে যারা গ্রীষ্মকাল কাটায়, তারা শীতকালে চলে যায় সিস্তান মরু অঞ্চলে এবং হেলমান্দ নদী তীরে।

৮

আলেকজান্ডার থেকে বাবুর

হাজার হাজার বছর পূর্ব হতেই আফগানিস্তান বীর পদচারণার ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ। বিশ্বের প্রাচীন প্রায় সকল সভ্যতাই ছিল কৃষিভিত্তিক। নদীর অববাহিকা অঞ্চলেই সাধারণতঃ উন্নত ও সম্পদশালী রাজ্য গড়ে উঠতো। নীল নদস্নাত মিশর উপত্যকা, ফোরাত তীরের ব্যবিলন, চীনের ইয়াংসিকিয়াং উপত্যকা, সিন্ধু-গঙ্গা অববাহিকার সম্পদরাজি দিগ্বিজয়ী বীরপুরুষদের প্রলুব্ধ করেছে। ভারত উপমহাদেশ ছিল প্রাচীনকালের ভূ-স্বর্গ। এখানকার সম্পদের লোভে দূর-দূরান্তের বীরপুরুষেরা আকৃষ্ট হতেন। সুদূর পশ্চিম থেকে স্থলপথে যাঁরা এসেছিলেন তাঁদেরকে আফগানিস্তান অতিক্রম করেই ভারতে প্রবেশ করতে হয়েছে।

দারিয়াস

আফগানিস্তানের বহু রাজা বিশ্বজোড়া খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। পারস্য রাজা ১ম দারিয়াস (খৃঃ পূঃ ৫২১-৪৮৫)-এর সাম্রাজ্য আফগানিস্তানের পূর্ব সীমানা সিন্ধু দেশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তখন রাজধানী ছিল পার্সিপলিস।

তার পূর্বে কিয়ানী বংশীয় সর্বশেষ পারস্য সম্রাট বাহমান আরদশীর দারাজদাস্ত (দীর্ঘহস্ত) আফগানিস্তান নিজ রাজ্যাধীন করে ভারতে অভিযান পরিচালনা করেন।

আলেকজান্ডার

মহামতি আলেকজান্ডারের (খৃঃ পূঃ ৩৩১-৩২৩) বহু স্মৃতি আফগান জনমনে এখনো বিরাজমান। মৌর্য্য বংশ (রাজধানী পাটলিপুত্র) দীর্ঘকাল (খৃঃ পূঃ ৩২৩-১৯০) হিন্দুকুশের দক্ষিণাংশ শাসন করে। সম্রাট অশোক (খৃঃ পূঃ ২৫০), আফগানিস্তান জয় করে গান্ধারায় বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করেন। হিন্দুকুশের উত্তরাংশ শাসন করে গ্রীক বেকট্রিয়ানগণ।

বেকট্রিয়া বা বলখে গ্রীক আধিপত্য অবসানের পর শুরু হয় শকদের শাসন। তারা ইউরে চিউয়েদের হাতে পরাজিত হয়ে প্রথমে হিন্দুকুশের উত্তরাংশে পরে (খৃঃ পূঃ ৯৭ হতে ৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত) দক্ষিণ আফগানিস্তানও শাসন করে। শক রাজগণের (১২৭ খৃঃ পূর্ব) আধিপত্য আফগানিস্তান থেকে উত্তর ভারত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল।

৭ খৃষ্টাব্দে শকদেরকে পরাজিত করে ইন্দো পার্থিয়ানগণ আফগানিস্তানে রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করে। গ্রীক বেকট্রিয়ান, শক্ এবং ইন্দো পার্থিয়ানদের সময় রাজধানী ছিল তক্ষশিলা।

সম্রাট কনিষ্ক (খৃঃ পূঃ ৫০) এবং কুষান রাজগণ কাবুল কান্দাহার তাদের অধীনে আনেন। কুষান রাজত্বকালে রাজধানী পেশোয়ারে স্থাপিত হয়। কুষান বংশের দ্বিতীয় সম্রাট ৬০ খৃষ্টাব্দে ইন্দো পার্থিয়ানদের পরাজিত করে আফগানিস্তানে রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করে।

হুনগণ (৪৫০ খৃঃ) আফগানিস্তান জয় করে ভারত আক্রমণ করেন। হুনদের রাজধানী ছিল বলখ্।

সাসানী যুগেও (২২৬-৬৫২খৃঃ) ইরানের আধিপত্য খোরাসানের অংশ বিশেষে ছিল। সপ্তম শতকে হিউয়েনসাং আফগানিস্তান ভ্রমণ করেন। এই বংশের সম্রাট খসরু পারভেজ-এর (৫৯০-৬২৮ খৃঃ) নিকট মহানবী (সাঃ) ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত পাঠিয়েছিলেন। সাসানীয়দের রাজধানী ছিল স্টাঘর।

সর্বশেষ সাসানী সম্রাট ইয়াজদগিরদ এবং তার প্রধান সেনাপতি অগ্নি উপাসক রুস্তম পরাজিত হন আশারে মুবাশশারার অন্তর্ভূক্ত মহান সাহাবী হযরত সাদ বিন ওয়াককাস (রাঃ)-এর নিকট। সেনাপতি রুস্তমকে হত্যা করেন আরববীর হেলাল (রঃ)।

আমাদের ইসলামী চেতনা এমন যে, আমরা অগ্নি উপাসক এবং পরাজিত বীর রুস্তম— সুহরাবের নামে আমাদের সন্তানদের নাম রাখি। অথচ অতো বড়ো সাহাবী এবং বিজয়ী বীর হযরত সাদ বিন আবি ওয়াককাস নামটি কদাচিত শোনা যায়। রুস্তম-সোহরাবের যে উপাখ্যান আমাদের জানা তা গাঁজাখুরী এবং অলীক।

ইয়াজদগির কন্যা শাহর বানুকে বিবাহ করেন হযরত ইমাম হোসেন (রাঃ)। এ বিবাহের সন্তান জয়নুল আবেদীনের মাধ্যমে হযরত আলী (রাঃ) ফাতিমা (রাঃ)-এর বংশধারা রক্ষিত হয়েছে। ঐতিহ্যগত এবং এ অতিরিক্ত কারণে ইরানীগণ হয়ত নবীবংশের প্রতি অধিকতর সংবেদনশীল এবং অনুগত।

আব্বাসী খলিফা মামুন ৪১৯ খৃষ্টাব্দে সামান এর দৌহিত্র আহমদকে ফারগানা রাজ্যের শাসক নিযুক্ত করেন। তার পুত্র নাসরের মৃত্যুর পর (৮৯২ খৃঃ) আহমদের দ্বিতীয় পুত্র ইসমাইল সামানী সাধীনভাবে ইরানের সামানী রাজ্য শাসন করেন। সামানী বংশের পর ক্ষমতার অধিষ্ঠিত হন ঘোরীগণ।

আলপ্তগীন ও সবুক্তগীন

পারস্যের সামানী সুলতানদের দুর্বলতার সুযোগে পঞ্চম সামানী সুলতান আবদুল মালিকের কৃতদাস আলপ্তগীন ৯৬২ খৃষ্টাব্দে আফগানিস্তানে গজনী রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর অন্তর্ধানের পর তাঁর কৃতদাস এবং জামাতা সবুক্তগীন (৯৬৬ খৃঃ) গজনীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। পাঞ্জাবরাজ জয়পাল দু'বার সবুক্তগীনের রাজ্য আক্রমণ করে পরাজিত হয়ে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন। কিন্তু তা ভঙ্গ করেন।

সবুক্তগীনের (৯৭৭-৯৯৭) পর গজনীর রাজা হন তাঁর দ্বিতীয় পুত্র ইসমাইল। ইসলাইলকে পরাজিত করে (৯৯৮ খৃঃ) গজনীর সিংহাসনে আরোহণ করেন সবুক্তগীনের জ্যেষ্ঠ এবং সুযোগ্য পুত্র সুলতান মাহমুদ (৯৭১-১০৩০ খৃঃ)। ১০০১ খৃঃ হতে ১০২৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে সুলতান মাহমুদ ১৭ বার ভারতে বিজয় অভিযান পরিচালনা করেন। সুলতান মাহমুদ আফগানিস্তানের স্বাধীন সার্বভৌম সম্রাট ছিলেন।

ঘোরীদের পূর্বে সেলজুকী সুলতান তুগরীর বেগ (মৃঃ ১০৬৩ খৃঃ), আলফ আরসালান (১০৬৩-৭৩) ও মালিক শাহ (১০৭৩-১০৯২ খৃঃ) এ অঞ্চলে রাজত্ব করেন।

শিহাবুদ্দিন মুহাম্মাদ ঘোরী

গজনবী রাজবংশকে ক্ষমতাচ্যুত করে মালিক ইযযুদ্দিন আল-হুসাইন ঘোরী ১১৫৯ খৃঃ আফগানিস্তানে ক্ষমতাসীন হন। তার মৃত্যুর পর তার সাত পুত্রের মধ্যে পাঁচ পুত্র পরপর গজনীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তারা হলেন ঃ

(১) কুতুবউদ্দিন মুহাম্মদ (২) সাইফুদ্দিন (৩) আলাউদ্দিন (৪) গিয়াসউদ্দিন এবং (৫) শিহাবুদ্দিন মুহাম্মদ ঘোরী। মালিক ইযযুদ্দিন বাদশাহের পিতা বলে ইতিহাসে খ্যাত হন।

ঘোর এবং কাবুল সুলতান শিহাবুদ্দিন মুহাম্মদ ঘোরী ত্বরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে (১১৯২ খৃঃ) পৃথ্বিরাজকে পরাজিত করে দিল্লীতে মুসলিম রাজত্বের ভিত্তি স্থাপন করেন। তার সময় গজনীর প্রভাব বেশ কিছুটা ম্লান হয়ে যায়।

চেঙ্গিশ খান (১১৬৭-১২২৭)

দিগ্বিজয়ী মঙ্গোল বীর চেঙ্গিশ খান (১১৬৭-১২২৭ খৃঃ) তার বংশধর তৈমুর লং বারবার হিন্দুকুশ পর্বত অতিক্রম করেন। হিন্দুকুশ পর্বতমালা আফগানিস্তানকে উত্তর ও দক্ষিণে দু'ভাগে ভাগ করেছে।

দুর্ধর্ষ মঙ্গোল বীর চেঙ্গিশ খান এবং তার বংশধরগণ প্রায় একশত বছর কিংবা তারও বেশী সময় আফগানিস্তান শাসন করেন। ইয়েকুশাহ-এর পুত্র তেমুচিন বা চেঙ্গিশ খান-এর রাজধানী ছিল কারাকোরাম। মান্দারিন বা চীন দেশীয় ভাষায় তার নামের অর্থ নিখুঁত যোদ্ধা।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর শুরুতে তিনি মঙ্গোলীয়া হতে বিশাল বাহিনী নিয়ে মধ্য এশিয়ার জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-বাণিজ্যে উন্নত রাজ্যসমূহে হানা দিতে শুরু করেন। সেকালে মধ্য এশিয়ার সবচেয়ে সমৃদ্ধশালী রাজ্য ছিল সুলতান শাহ মুহাম্মদ-এর শাসনাধীন খারিজম। মঙ্গোল আক্রমণকালীন সময়ে খারিজম শাহ মুহাম্মদ মৃত্যুবরণ করেন। তার পুত্র জালালুদ্দীন চেঙ্গিশ খানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকেন।

চেঙ্গিশ খান ভারতের মুলতান (১২২২ খৃষ্টাব্দে) পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলেন। তৎকালীন ভারত সম্রাট ইলতুৎমিশের কূটনীতি এবং দূরদর্শী পদক্ষেপের ফলে তিনি আর অগ্রসর হননি। পরবর্তী অভিযানে তার একটি লক্ষ্য ছিল খারিজম শাহের সর্বশেষ উত্তরাধিকারী জালালুদ্দিনকে বন্দী করা। জালালুদ্দিন ভারতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। দিল্লীর তৎকালীন সম্রাট বলবন বুদ্ধি করে জালালুদ্দিনকে পারস্যে পাঠিয়ে দেন।

বলখ, বাদখশান, বামিয়ান, জোহাক, হেরাত, পেশোয়ার প্রভৃতি স্থানে চেঙ্গিশ খান হত্যা এবং ধ্বংসযজ্ঞ চালান। তার গতিপথের দু'ধারে যা কিছু সুন্দর এবং প্রশংসনীয় পেয়েছেন চেঙ্গিশ খানের সেনারা তাই ধ্বংস করেছে। হত্যা, অগ্নিকাণ্ড ও ধ্বংস ছিল তার বিজয় ধারার বৈশিষ্ট্য। খারিজম নগরীর (বর্তমানে খিভা) ইমারতের ইটগুলি একটি একটি করে স্থানীয় জনগণকে মেরে পিটিয়ে তাদের দ্বারা খুলে নেওয়া হয়।

চেঙ্গিশ খানের আনন্দ ছিল সৃষ্টিতে নয়, ধ্বংসে। একটি সুন্দর বাগান তৈরির ধৈর্য তার ছিল না। তার আনন্দ ছিল কত দ্রুত একটি বাগানের সব গাছগুলো কেটে সাফ করে দেয়া যায় তা পর্যবেক্ষণ করা এবং খবর জানা।

চেঙ্গিশ খান তাবুতে থাকতেন। তিনি মঙ্গোলিয়ায় শীতের দেশের অধিবাসী। কোন দালান-কোটা, ইমারত-প্রসাদ দেখলে তার গায়ে জ্বালা ধরতো। তিনি নির্দেশ দিতেন দিনের দ্বিতীয় বার দেখার আগেই যেন তা ধূলায় মিশিয়ে দেয়া হয়।

নব সৃষ্টি নয় ধ্বংসস্তূপই তার হৃদয়ে দোলা দিতো। চেঙ্গিশ খানের ধ্বংস যজ্ঞের পূর্বে সমৃদ্ধশালী খারিজম শাহের রাজত্ব ছিল সমগ্র হিন্দুকুশ এলাকা এবং ভারতের সিন্ধু নদের পশ্চিম তীর পর্যন্ত। মঙ্গোলিয়ার রাজা চেঙ্গিস খান চীন সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চলাকালে মারা যান।

চেঙ্গিশের পর তার বিরাট সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী হন তার পুত্র জোর্চী. ওগাতাই, চাগাতাই, তোমুর। সাম্রাজ্য তার পুত্রগণ এবং ৬ গৌত্র বাতুবার্কে, ওরদা, তোগাতায়, মুগাল. সীবাস, বারাক এবং গোয়ুক-এর মধ্যে ভাগ হয় খাকান ছিল চেঙ্গিশ এবং তার বংশধরদের উপাধি।

কুবলাই খান (১২৫৯-৯৪ খৃঃ)

চেঙ্গিশ পুত্রগণ অপেক্ষা অধিকতর প্রসিদ্ধ ছিল চেঙ্গিসের দৌহিত্র এবং তোমুর পুত্র কুবলাই খান। তিনি চেঙ্গিশের সাম্রাজ্যের পূর্বাংশ শাসন করতেন। তিনি সমগ্র চীন বিজয় করেন।

চেঙ্গিশ সাম্রাজ্যের পশ্চিমাংশে ধ্বংসযজ্ঞ পরিচালনা করেন সেনাপতি হালাকু খান (১২৫৬-৬৫ খৃঃ)। তার চরিত্র অনেকটা চেঙ্গিশের মত ছিল। কুবলাই খানের সময় সুবিখ্যাত পরিব্রাজক মার্কো পলো (১২৬৭-১২৭৫) আফগানিস্তানসহ তার মঙ্গোল রাজ্য ভ্রমণ করেন। ১৩৩৩ খৃষ্টাব্দে ইবনে বতুতাও হিন্দুকুশ এবং ভারত ভ্রমণ করেন।

তৈমুর লঙ (১৩৩৬-১৪০৪ খৃঃ)

মঙ্গোলদের ধ্বংসস্তূপের পর তাদের বংশধররাই মধ্য এশিয়া, তুরস্ক. আফগানিস্তান এবং ভারতে সভ্যতা ও সংস্কৃতির মশাল প্রজ্জ্বলিত করতে থাকেন। এদের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন তৈমুর লঙ (১৩৩৬-১৪০৪)। তিনি সমরখন্দে রাজধানী স্থাপন করে মঙ্গোল সাম্রাজ্য শাসন করতে থাকেন।

মঙ্গোলদের উত্তরসূরীগণ তুর্কিদের সাথে মিশে যান। অনেকে মঙ্গোল এবং তাতারী তুর্কীদের এক জাতি মনে করে। তা ঠিক নয়। চেঙ্গিস খাঁর পূর্বে তারা পৃথক জাতি-গোষ্ঠি ছিল। মঙ্গোলবীর চেঙ্গিস খাঁর আবির্ভাবের অনেক পূর্বে সেলজুর্কী তুর্কী মালিক শাহ বিশ্ব ইতিহাসে স্থান করলেন। সুপ্রসিদ্ধ মন্ত্রী নিঁজামুল মূলক সেলজুকী সুলতান মালিক শাহের মন্ত্রী ছিলেন। মালিক মাত্র ৩৯ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন (১০৯২ খৃঃ)।

তৈমুর লঙ পিতৃপরিবারের দিক থেকে তুর্কি এবং মাতৃপরিচয়ের দিকে দিয়ে চেঙ্গিশ খানের সঙ্গে সম্পৃক্ত। তিনি ছিলেন বারলাস তুর্কিদের গুরখান কবিলার অন্তর্ভুক্ত। তাকে চাখতাই তুর্কি মঙ্গোলও বলা হয়।

১৩৮০ খৃষ্টাব্দে তৈমুর লঙ হেরাত জয় করেন। সমগ্র আফগানিস্তান তার রাজ্যর্ভুক্ত ছিল। তৈমুর লঙ-এর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজয় হলো ১৩৯৮ সনে দিল্লী জয়। এ সময় দিল্লীতে তিনি বেশ কিছু লুটপাট এবং হত্যাযজ্ঞের অনুষ্ঠান

করেছিলেন। সমরখন্দ হতে তৈমুর লঙ আফগানিস্তানের শাসন পরিচালনা করেন এবং বহুবার হিন্দুকুশ পর্বতমালা অতিক্রম করে রাজ্যের দক্ষিণ দিক পরিদর্শনে আসেন।

১৪০৩ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ রাজ তৃতীয় হেনরীর দূত ক্লাজিভো তৈমুর লঙের রাজ দরবারে আসেন।

আমুদরিয়ার দক্ষিণ তীরের তুর্কি মঙ্গোলগণ পারসীকে মাতৃভাষা হিসেবে গ্রহণ করেন। আমুদরিয়ার উত্তর-পূর্ব দিকের অধিবাসীদের নিকট তুর্কী ভাষাই অধিকতর গ্রহণযোগ্য হয়।

শাহরুখ (১৪০৪-৪৭ খৃঃ)

তৈমুর লঙের পুত্র 'শাহরুখ' (১৪০৪-৪৭ খৃঃ) শিল্প-সংস্কৃতি এবং জ্ঞান বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। তার স্ত্রী গওহর শাদ জ্ঞানীগুণী এবং ধার্মিকদের খুবই ভক্তি-শ্রদ্ধা করতেন এবং আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করতেন।

তৈমুরের বংশধরদের শৌর্য-বীর্যের অবক্ষয়ের পর পারস্যে সাফাভী বংশ রাজ ক্ষমতায় আসেন। (১৫১০ – ১৭৩৭ খৃঃ)

মুঘল সম্রাট জহিরউদ্দীন মোহাম্মদ বাবুর (১৪৮৩-১৫৩০ খৃঃ)

বাবুরের পিতা উমর শেখ ফারগানা রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। উমর শেখ ছিলেন তৈমুরের দৌহিত্রের পুত্র। মায়ের দিক থেকে বাবুর ছিলেন চেঙ্গিস খানের ত্রয়োদশ অধঃস্তঃ বংশধর। উমর শেখের রাজধানী ছিল আন্দিজান। ১১ বছর বয়সে পিতার মৃত্যুর পর (১৪৯৩ খৃঃ) তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি তৈমুরের পূর্বতন রাজধানী সমরখন্দ দখলের চেষ্টা করেন। একবার সমরখন্দ তিনি দখল করেছিলেন। কিন্তু রাখতে পারেননি। তদুপরি নিজের রাজ্যও হারান। দু'বার তিনি তার রাজধানী আন্দিজান দখল করেন। কিন্তু শক্তিশালী শায়বানী উজবেকদের নিকট পরাজিত হয়ে রাজ্যহারা হন। দশ বছর পর্যন্ত সংগ্রাম করে সিদ্ধান্ত নেন যে, তিনি অন্যত্র ভাগ্য পরীক্ষা করবেন। শায়বানীগণ ছিলেন চেঙ্গিশ খানের দৌহিত্র শীবাসের বংশধর।

১৫০৪ খৃষ্টাব্দে ২২ বছর বয়সে পিতৃরাজ্য দখল করার আশা ছেড়ে দিয়ে তিনি তার আত্মীয় হেরাতের রাজা হুসেইন বেগ বায়কারার সাহায্যের আশায় হেরাত রওয়ানা হন। পথে হিসার দুর্গাধিপতি তাকে সৈন্য দ্বারা সাহায্য করেন। কিন্তু উজবেক বাহিনী কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে তিনি হেরাত যাওয়ার পরিকল্পনা ত্যাগ করেন। তিনি কিপচক গিরিপথ দিয়ে আফগানিস্তানের গোরবন্দ উপত্যাকায়

পৌঁছেন এবং কাবুলের ইলখান রাজ্যে সঙ্গে যুদ্ধ করে ১৫০৪ খৃষ্টাব্দে কাবুল দখল করেন।

ক্রমশঃ তিনি কান্দাহার, বলখ, বাদখশানে স্বীয় রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। জহিরউদ্দীন মুহাম্মদ বাবুর কাবুল ও হিন্দুকুশ পর্বতের পাদদেশ থেকেই ভারত বিজয়ের স্বপ্ন দেখতে থাকেন। কাবুল কান্দাহারকে ভিত্তি করেই তিনি ভারতে রাজ্য বিস্তার করেন।

আওরঙ্গজেব

সম্রাট শাহজাহান এবং আওরঙ্গজেব পর্যন্ত আফগানিস্তানের পূর্বাংশ মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। মুঘলেরা যতই ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তার করতে থাকেন ততই তাঁরা আফগানিস্তানের প্রতি উৎসাহ হারান। তাঁরা কাবুল, কান্দাহারের দখল নিয়েই সন্তুষ্ট থাকেন। কিন্তু হেরাত ও বলখে পারসিক প্রভাব বিস্তৃত হয়। এতে মুঘল সম্রাটগণ বিচলিত বোধ করেননি।

আরঙ্গজেবের দৃষ্টি ছিল দক্ষিণ ভারতকে মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত করা। যুবরাজ হিসেবে তিনি আফগানিস্তানে বিদ্রোহী গোত্রপতিদের দমন করতে অভিযান পরিচালনা করেছিলেন। কিন্তু সিংহাসনে আরোহণের পর সেদিকে তেমন মনোযোগ দিতে পারেননি। ফলে মুঘল রাজত্বের শেষ দিকে আফগানিস্তানে তাদের প্রভাব দুর্বল হয়ে পড়ে। ভারতের মুঘল সাম্রাজ্য এবং পারস্যের সাফাভি সাম্রাজ্য (১৫১০-১৭৩৭ খৃঃ) ছিল সমসাময়িক।

৯

ইরান-আফগান সম্রাট নাদির শাহ

(১৬৮৮-১৭৪৭ খৃঃ)

তুর্কী কিরিকলু আফসার গোত্রের তুর্কমেনী আফগান নাদির কুলি বেগের জন্ম খোরাসানে (১৬৬৮-১৭৪৭ খৃঃ)। পারস্যের সাফাভী সম্রাটের বাহিনীতে যোগ দিয়ে তিনি ক্রমশঃ উন্নতির শিখরে ওঠেন। শাহ ইসমাইল কর্তৃক ইরানে সাফাভী রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি তৎকালীন পারস্যরাজ এবং উজবেকনেতা শায়বানী খানকে ১৫০৯ খৃষ্টাব্দে পরাজিত এবং নিহত করে পারস্য সিংহাসনে আরোহণ করেন।

আফগানিস্তানের গিলজাঁই সরদার মীর ওয়াইজ কান্দাহারস্থ ইরানের সাফাভী গভর্নরকে হত্যা করে কান্দাহার দখল করেন (১৭০৭-১৭১৫)। তৎপুত্র মীর মাহমুদ

গিলজাঁই ১৭২০ খৃষ্টাব্দে পারস্য আক্রমণ করেন। গুলনাবাদের যুদ্ধ এবং ৭ মাসব্যাপী ইসপাহান অবরোধের পর ১৭২২ খৃষ্টাব্দে তিনি পারস্যের সাফাভী সম্রাট শাহ হুসেইনকে (১৬৯৪-১৭২২ খৃঃ) পরাজিত করে পারস্য সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিন বছর পর তাকে নিহত করে তার ভ্রাতুস্পুত্র শাহ আশরাফ ১৭২৫ খৃষ্টাব্দে পারস্য সিংহাসন দখল করেন। কিন্তু গিলজাঁইদের অত্যাচার, লুণ্ঠন এবং প্রশাসনিক ঐতিহ্য ও দক্ষতার অভাবের ফলে পারস্যে তাদের প্রভাব স্থায়ী হয়নি।

সাফাভী সুলতান শাহ হোসেনের পুত্র তামাস্পক নাদির শাহের সাহায্যে গিলজাঁই সম্রাট আশরাফকে পরাজিত করে সাফাভী সিংহাসন পুনরুদ্ধার করেন (১৭২৯ খৃঃ)। ভাগ্যের পরিহাসে পুনরায় নাদির শাহের হাতেই সর্বশেষ সাফাভী সুলতান তৃতীয় আব্বাস সিংহাসনচ্যুত হন।

নাদির কুলি বেগ ১৭২৬ সনে পারস্য সিংহাসনচ্যুত সম্রাট সুলতান হোসেনের পুত্র তাহমাস্প-এর সেনা বাহিনীতে যোগ দেন। বুদ্ধি, সাহস, সামরিক কৌশল এবং দূরদর্শিতা গুণে তিনি যুবরাজের আস্থা অর্জন করতে থাকেন। তার একটি লক্ষ্য ছিল সুলতান হোসেন এবং তৎপুত্র তাহমাস্পকে সাফাভী সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা।

নাদির কুলিবেগ আফগানী ছিলেন। আফগানিস্তানের হেরাত প্রদেশকেই তিনি প্রথমে সাফাভীদের কর্তৃত্বে আনয়ন করার চেষ্টা করেন। হেরাতের শাসন কর্তৃত্ব ছিল তখন আবদালী দুররানীদের হাতে। আবদালীদেরকে পরাজিত করে নাদির কুলিবেগ তা সুলতান হোসেনের কর্তৃত্বে নিয়ে আসেন। আবদালীগণ পরাজয় বরণ করে নিয়ে সাফাভীদের আনুগত্য স্বীকার করেন এবং নাদীর শাহের বাহিনীতে যোগ দেন। এর মধ্যে জামান খান সাদোজাঁই-এর দ্বিতীয় পুত্র এবং পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ বিজয়ী আহমদ শাহ আবদালীও ছিলেন একজন।

হেরাতে সাফাভী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার পর ১৭২৮ খৃষ্টাব্দে নাদির কুলীবেগ পারস্য রাজধানী ইসপাহানে গিলজাঁই শাসনের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন। ১৭২৯ খৃষ্টাব্দে পারস্যের গিলজাঁই সম্রাট আশরাফকে পরাজিত এবং বিতাড়িত করে নাদির কুলীবেগ সুলতান হোসেনের পুত্র এবং তার পৃষ্ঠপোষক তামাস্পকে পারস্যের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন। ছয় বছর পর সাফাভী সম্রাট তৃতীয় আব্বাসকে অপসারণ করে নাদির কুলিবেগ নিজেই ১৭৩৬ খৃষ্টাব্দে নাদির শাহ উপাধি ধারন করে পারস্য সিংহাসনে আরোহণ করেন।

সাফাভী রাজবংশে শাহ আব্বাস নামে আরও দু'জন রাজন্য ছিলেন। প্রথম এবং দ্বিতীয় শাহ আব্বাস পারস্য সম্রাট থাকাকালে মৃত্যুবরণ করেন যথাক্রমে ১৬০৫ খৃঃ এবং ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে।

পারস্যে সিংহাসনচ্যুত হলেও আফগানিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চল, বিশেষ করে কান্দাহার গিলজাঁইদের দখলে ছিল। কান্দাহার দখলে নাদির শাহ প্রচণ্ড বাধার সম্মুখীন হন। তা স্বত্ত্বেও ১৭৩৮ সনের প্রথমার্ধে শুধু কান্দাহার নয়, দক্ষিণ আফগানিস্তান এবং বেলুচিস্তান পর্যন্ত সমগ্র এলাকা নাদির শাহের শাসনে চলে আসে। জামিন্দওয়ার, কালাত-ই গিলজাঁই ইত্যাদি স্থানে তাকে প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু সমগ্র বাধা অতিক্রম করে মাত্র দু'বছরের মধ্যে নাদির শাহ ভারত বিজয়ের জন্যে তৈরি হন।

আলেকজান্ডার, চেঙ্গিশ খান, তৎপুত্র ওগাতাই, প্রপৌত্র কুবলাই খান, তৈমুর লঙ, সুলতান মাহমুদের ন্যায় নাদির শাহেরও সাম্রাজ্য বিস্তারের নেশা ছিল প্রবল। নাদির শাহ জারিস্ট রাশিয়ার অনুগত সামন্তরাজ ও জারু বাহিনীকে পরাজিত করে কাসপিয়ান সাগরের উত্তর প্রান্ত পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন।

আফগানিস্তান, মধ্য এশিয়া এবং পারস্য জয়ের পর নাদির শাহ ভারত বিজয়ের উদ্দেশ্যে বাহির হন। গজনী, কাবুল, জালালাবাদ ইত্যাদি স্থান হয়ে ১৭৩৮ সনের মধ্যেই তিনি খাইবার পাশ হয়ে পেশোয়ারে পৌঁছে যান।

১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে নাদির শাহ দিল্লী জয় করেন। মুঘল সম্রাট মুহাম্মদ শাহ বাধ্য হয়ে তার সঙ্গে বন্ধুত্বের হস্ত সম্প্রসারণ করে সন্ধি করেন। নাদির শাহ দিল্লীর সম্রাট মোহাম্মদ শাহকে হিন্দুস্থানের বাদশাহ হিসেবে স্বীকৃতি দেন। সিন্ধু নদীর পশ্চিমে যে সমস্ত এলাকা যুদ্ধ করে নাদির শাহ জয় করেছিলেন, আফগানিস্তান পর্যন্ত সমগ্র এলাকায় নাদির শাহের সার্বভৌমত্ব স্বীকৃত হয়। বাদশাহ শাহজাহানের ময়ূর সিংহাসন এবং কোহিনুর মনিও তিনি হস্তগত করেন। নাদির শাহ দিল্লীতে স্বীয়.অধিকার স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠা করতে চাননি।

নাদির শাহের দিল্লীতে বিজয়ী হিসেবে অবস্থানকালেই হঠাৎ গুজব রটে যায় যে, নাদির শাহ নিহত হয়েছেন। দিল্লীর অধিবাসীগণ নাদির শাহের সেনা বাহিনী আক্রমণ করে বসেন। নাদির শাহ প্রতিশোধ গ্রহণকল্পে দিল্লীতে হত্যা বা লুণ্ঠনের তান্ডবলীলা অনুষ্ঠান করেন। দিল্লী লুণ্ঠন করে তিনি আফগানিস্তান ও পারস্যে ফিরে যান। বিভিন্ন দেশে অভিযান পরিচালনা করে নাদির কুলি খান তথা নাদির শাহ স্বীয় কোষাগার অর্থ-সম্পদে পরিপূর্ণ করেন। এটাই তার জন্য কাল হয়েছিল।

নিজস্ব কাজার গোত্রের সরদার আগা মোহাম্মদ খান নাদির শাহকে হত্যা করে (১৭৪৭) সিংহাসন ও সম্পদের মালিক হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কাবুষান বা কুষান নামক স্থানে নাদির শাহকে হত্যা করা সম্ভব হলেও পারস্য সিংহাসন নিয়েই আগা মুহাম্মদ খানকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। আফগান সিংহাসন ও সম্পদের মালিক তিনি হতে পারেননি। সম্পদ ও সিংহাসন করায়ত্ব হয়ে যায় কান্দাহারের আফগানি গোত্রের সাদোজাঁই দুররানী বংশের সরদার মুহাম্মদ জামান খান সাদোজাঁই-এর দ্বিতীয় পুত্র আহমদ শাহ আবদালী দুররানীর। নাদির শাহের মৃত্যুর পর আহমদ শাহ আবদালী 'দুররে দুররানী' উপাধি ধারণ করে ১৭৪৭ খৃষ্টাব্দে মাত্র ২০ বছর বয়সে সম্রাট হিসেবে আফগান সিংহাসনে আরোহণ করেন।

১০

আফগান সম্রাট আহমদ শাহ আবদালী

খাঁটি আফগান গোত্রগুলোর মধ্যে রাজক্ষমতায় অভিষিক্ত হন সাদোজাঁই এবং মোহাম্মদজাঁই গোত্র। এই দুই গোত্রই দীর্ঘকাল পর্যন্ত আফগানিস্তান শাসন করেন। 'সাদো' এবং 'মোহাম্মদ' ছিলেন পারস্য সম্রাট তৃতীয় শাহ আব্বাসের দরবারে দু'জন ক্ষমতাধর অমাত্য। আফগানি ভাষায় জাঁই শব্দের অর্থ হলো বনী, বনু, পুত্র, বংশ, ইত্যাদি। সাদো-এর পরিবার বা বংশদেরকে বলা হয় সাদোজাঁই এবং মোহাম্মদের বংশদেরকে বলা হয় মোহাম্মদজাঁই। সাদোজাঁইগণ আবদালী, দুররানী, পপুলজাঁই ইত্যাদি নামেও পরিচিত। মোহাম্মদজাঁইগণ বারাকজাঁই নামে অধিকতর খ্যাত।

সাদোজাঁই বংশ আফগানিস্তানে রাজত্ব করেন ১৭৪৭ থেকে ১৮১৮ পর্যন্ত একাত্তর বছর। মোহাম্মদজাঁই বা বারাকজাঁই পরিবার আফগানিস্তান শাসন করেন ১৮১৮ থেকে ১৯৭৯ পর্যন্ত ১৬১ বৎসর।

নির্বাচিত সম্রাট

সাদোজাই বা আবদালী দুররানী রাজ বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বিশ্ব বিখ্যাত আহমদ শাহ আবদালী দুররে দুররানী (১৭২৭-৭৩)। আহমদ শাহ আবদালী ছিলেন পারস্য সম্রাট নাদীর শাহের সেনাধ্যক্ষ। মোহাম্মদজাঁই রাজবংশের পূর্ব পুরুষ হাজী জামাল খান ছিলেন সম্রাট নাদীর শাহের মন্ত্রী। অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন আহমদ শাহ আবদালী। হাজি জামাল খান ছিলেন বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান অমাত্য।

তুর্কী বংশোদ্ভূত পারস্য সম্রাট নাদির শাহের হত্যাকাণ্ডের পর ১৭৪৭ সনে তদীয় কাজার বংশের রাজত্ব পারস্যে সীমিত হয়ে পড়ে। আফগানিস্তানের শাসনভার অনেকটা পাকা ফলের মতই এসে পড়ে সেনাধ্যক্ষ আহমদ শাহ্ আবদালীর হাতে। আহমদ শাহ আবদালী নিজ শক্তিবলে সিংহাসনে আরোহণ করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা না করে আফগান জিরগা বা গোত্রীয় পরিষদ আহ্বান করেন। জিরগা কর্তৃক তিনি আফগানিস্তানের রাজা বা সম্রাট নির্বাচিত হন।

বিচক্ষণ মন্ত্রী হাজী জামাল খান রাজসিংহাসনের জন্য কোনরূপ প্রতিযোগিতা ছাড়াই আহমদ শাহ আবদালীর আনুগত্য স্বীকার করে নেন। আহমদ শাহ্ আবদালী দুর-ই দুররান (মানিক্য সমূহের উজ্জলতম মুক্তো) উপাধি ধারন করে মাত্র ২০ বছর বয়সে আফগান রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন ১৭৪৭ খৃষ্টাব্দে।

ঐতিহাসিক অবমূল্যায়ন

আহমদ শাহ আবদালী ছিলেন আফগানিস্তানের সর্বপ্রথম স্বাধীন সার্বভৌম সম্রাট (১৭৪৭-৭৩ খৃঃ)। বিজেতা হিসাবে তিনি তৈমুর লঙ, সুলতান মাহমুদ বা জহিরুদ্দিন মুহাম্মদ বাবুর অপেক্ষা কোন দিক দিয়ে নিম্নমানের ছিলেন না। পারস্য থেকে পাঞ্জাবের পূর্ব প্রান্ত, উত্তরে আমুদরিয়া, হিমালয়, তিব্বত, হিন্দুকুশ থেকে দক্ষিণে আরব সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল তার অধিকার। এত বৃহৎ এক রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট হওয়া সত্ত্বেও ঐতিহাসিকদের থেকে প্রাপ্য স্বীকৃতি তিনি পাননি। এর একটি বিশেষ কারণও ছিল।

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশী যুদ্ধে বিজয়ের পর ইংরেজগণ ক্রমশঃ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের শাসনভার দখল করতে থাকে। দিল্লীর মুঘল সম্রাট শাহ্ আলমের ক্ষমতা তখন দিল্লী অথবা লাল কেল্লার মধ্যেই সীমিত ছিল। প্রাদেশিক সুবাদার বা গভর্নরগণ স্বাধীনভাবে রাজত্ব পরিচালনা করছিলেন। ভারতে উদীয়মান সামরিক শক্তি ছিল দক্ষিণাত্যের মারাঠাগণ। নিভু নিভু মুঘল শাসন প্রদীপ নির্বাপিত করে তারা দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণের স্বপ্ন দেখছিলেন। পারস্য সম্রাট নাদির শাহের দিল্লী বিজয়, লুণ্ঠন এবং একই বছর তার হত্যাকাণ্ডের পর মারাঠাদের দিল্লীর মসনদে আরোহণের সম্ভাবনা উজ্জ্বলতর হলো। কিন্তু বাধ সাধলেন আহমদ শাহ আবদালী।

পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে (১৭৬১ খৃঃ) মারাঠাদেরকে পরাজিত করে আহমদ শাহ্ আবদালী ভারত ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি এক লক্ষ সৈন্য নিয়ে মারাঠা কনফেডারেসীর ৫ লক্ষ সৈন্যের মুখোমুখি হন। এ যুদ্ধে দুই লক্ষ মারাঠা সৈন্য নিহত এবং ২২ হাজার সৈন্য বন্দী হয়। এ যুদ্ধের ফলেই দিল্লীকেন্দ্রিক হিন্দু সাম্রাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন সম্পূর্ণ ধুলিসাৎ হয়ে যায়।

পরবর্তী কালের ইতিহাস লেখকদের নিকট ভারতের মারাঠা শক্তি খর্ব করে দেয়া ছিল আহমদ শাহ আবদালীর এক অমার্জনীয় অপরাধ।

সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চল বিজয়

সিংহাসন আরোহণ করার পর অতি দ্রুত আহমদ শাহ আবদালী আফগানিস্তানে স্বীয় রাজত্ব সুসংহত করেন। ভারতে তখন মুঘল সূর্য শুধুমাত্র আভা বিকিরণ করছিল। পারস্যের কাজার বংশীর রাজন্যবর্গ তার সমকক্ষ ছিল না। কান্দাহারে অভিষেক অনুষ্ঠানের পর (১৭৪৭ খৃঃ) তিনি কাবুলের দিকে অগ্রসর হন। বিনা যুদ্ধেই কাবুল তাকে রাজা হিসেবে বরণ করে নেয়। কাবুলে অবস্থানকারী তুর্কি-পারসী কিজিলবাশ বাহিনী তার আনুগত্য স্বীকার করে।

আহমদ শাহ আবদালী সিংহাসনে আরোহণের এক বছরের মধ্যেই ভারত আক্রমণ করেন (১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে)। কিন্তু মুঘল সম্রাট আহমদ শাহ প্রেরিত মুঘল বাহিনীর তীব্র প্রতিরোধের কারণে তিনি সিন্ধু অতিক্রম করে অধিক দূর অগ্রসর হতে পারেননি। পরবর্তী বছর (১৭৪৯) আবদালী পুনরায় ভারত আক্রমণ করেন। এবার মুঘল সম্রাট কোন বাধা না দিয়েই সিন্ধু প্রদেশ এবং সিন্ধু উপত্যকা আহমদ শাহের হাতে তুলে দিয়ে সন্ধি করেন।

পশ্চিম ও উত্তরাঞ্চল বিজয়

সিন্ধু পর্যন্ত স্বীয় অধিকার নিশ্চিত করে হিন্দুকুশ পবর্তমালার উত্তর পশ্চিমে আহমদ শাহ আবদালী রাজকীয় দৃষ্টি সম্প্রসারণ করেন। ১৪ মাস অবরোধের পর পারস্য সাম্রাজ্যভুক্ত হেরাত আত্মসর্মপণ করে। কিন্তু খোরাসান প্রথম আক্রমণে বিজিত হয়নি। পরের বছর তিনি পুনরায় ইরানী খোরাসান আক্রমণ করেন। তার প্রস্তুতি এত ব্যাপক ছিল যে, পারস্য সম্রাট আহমদ শাহ আবদালির আধিপত্য এবং সার্বভৌমত্ব মেনে নিয়ে খোরাসান রাজ্য ও সিংহাসন রক্ষা করেন।

হেরাতের শাসন সংহত করার পর আবদালী উত্তরে অভিযান প্রেরণ করেন। বলখ, বাদকশান, বামিয়ান, মায়মানায় পূর্ণ কর্তৃত্ব স্থাপন করে মাত্র আড়াই বছরের মধ্যে ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে তিনি আমুদরিয়া পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন। ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে আফগানিস্তানের উত্তর সীমা আহমদ শাহ আবদালী যা নির্ধারণ করেছিলেন আজও তাই আছে।

পশ্চিম ভারত বিজয়

অতঃপর আহমদ শাহ আবদালী ভারতের দিকে পুনরায় নজর দেন। সিন্ধু পাঞ্জাব ইতিপূর্বে তার দখলে এসে গিয়েছিল। এ এলাকার শাসনভার সুবিন্যস্ত

করে আহমদ শাহ আবদালী উপজাতি অধ্যুষিত সমগ্র উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ বেলুচিস্তান দখল করেন এবং পূর্বদিকে অভিযান প্রেরণ করতে থাকেন। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে আহমদ শাহ আবদালী দিল্লী দখল করেন। সিন্ধু নদীর পূর্বাঞ্চলে তার এলাকাসমূহের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন রাজপুত্র তৈমুর শাহকে।

বেলুচিস্তানের এক গোত্রাদিপতির বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত থাকার সুযোগে মারাঠাগণ পাঞ্জাবে অভিযান প্রেরণ করেন। আহমদ শাহ তখন বেলুচিস্তানের মরু অঞ্চলে বিদ্রোহী সামন্তরাজকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছিলেন। মারাঠাদের পাঞ্জাবের আগমনের খবর পেয়ে তিনি পাঞ্জাবের দিকে অগ্রসর হন। ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে ইন্দোরের মারাঠারাজ মালহার রাও হোলকারকে তিনি লাহোরের নিকট চরমভাবে পরাজিত করে দিল্লীতে আসেন। আহমদ শাহ আবদালী ৮-১০ বার ভারতে সফল বিজয় অভিযান পরিচালনা করেন (১৭৪৮-৬৭ খৃঃ)।

ইতিহাসের ক্রান্তিলগ্ন ও তৃতীয় পানিপথ

মারাঠাদের দৃষ্টি ছিল দিল্লীর মুঘল সম্রাট এবং মুঘল সিংহাসনের দিকে। দিল্লীতে আহমদ শাহের বারবার আগমনে বিরক্ত এবং ভীত হয়ে পেশোয়া সদাশিবরাও ভারতে সমস্ত হিন্দু রাজাবর্গকে ঐক্যবদ্ধভাবে আহমদ শাহ আবদালীর মোকাবিলা করার আহ্বান জানান।

দিল্লী হতে প্রখ্যাত দার্শনিক শাহওয়ালী উল্লাহ দেহলভী (রঃ) আহমদ শাহ আবদালীকে ভারতের উদীয়মান মারাঠা শক্তি হতে ভারতীয় মুসলিমদেরকে নিরাপদ রাখার আহবান জানান। আহমদ শাহ আবদালীর পূর্বপুরুষগণ ছিলেন অলি আল্লাহ, সুফি-দরবেশ, আবেদ, আবদাল। পুশতো ভাষায় অলি আল্লাহ, উচ্চস্তরের আবেদগণকে বলা হয় আবদাল। এ বংশে কয়েক পুরুষ পর্যন্ত অলি আবদাল-এর উদ্ভব হয় বলে তাঁর বংশকে বলা আবদালী বংশ।

১৭৬১ সালের ১৪ই জানুয়ারী প্রায় একলক্ষ সৈন্য নিয়ে আহমদ শাহ আবদালী ঐতিহাসিক পানিপথের প্রান্তরে সম্মিলিত মারাঠা শক্তির মোকাবিলা করেন। মারাঠারা সাধারণতঃ সম্মুখ সমর পরিহার করে গেরিলা পদ্ধতিতে বিভিন্নমুখী আক্রমণ পরিচালনা করেন। কিন্তু এ যুদ্ধে মারাঠা কনফেডারেসি তাদের বিজয় সম্বন্ধে এত নিশ্চিত ছিলেন যে, তারা নিয়মিত সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হন। দিল্লী হতে ৩০ মাইল উত্তরে ঐতিহ্যসিক পানিপথ প্রান্তরে আহমদ শাহ আবদালী সম্মিলিত মারাঠা শক্তিকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দেন।

তীব্র যুদ্ধে পেশোয়া সর্দশিবরাও এবং তার পুত্র মৃত্যুবরণ করেন। ভারতের ইতিহাসের প্রচণ্ডতম যুদ্ধে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত হিন্দু যুবরাজ এবং

সেনাপতি এত বিপুল সংখ্যায় নিহত হন যে মারাঠারা পরবর্তীতে উত্তর ভারতে কোন অর্থবহ অভিযান পরিচালনা করেননি। এ যুদ্ধে মারাঠা শক্তির চূড়ান্ত পরাজয়ের ফলে ভারতে ব্রিটিশ রাজত্ব প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়।

পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের পর আহমদ শাহ আবদালী মোগল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমকে ভারত সম্রাট হিসেবে স্বীকৃতি দেন। এরপর ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে আ-হমাদ শাহ আবদালী লাহোরের যুদ্ধে পাঞ্জাবে সম্মিলিত শিখ সৈন্যদেরকে পরাভূত করেন এবং পাঞ্জাব দখল করেন। পাঁচ বছর পর মুখে ক্যানসার রোগে আক্রান্ত হয়ে স্বীয় অসুস্থতার কারণে পেশোয়ার, কাশ্মীর উত্তর পাঞ্জাব নিজ দখলে রেখে পাঞ্জাবের মধ্যবর্তী অংশ শিখদেরকে ছেড়ে দেন।

অকাল মৃত্যু

সুদীর্ঘ ২৬ বছর রাজত্ব করার পর মুখাবয়বে ক্যানসার রোগে আক্রন্ত হয়ে ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে ৪৬ বছর বয়সে কোবা পর্বতের মাবরুত নামক স্থানে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

রাজত্বের শেষ পাঁচ/ছয় বছর ক্যান্সার রোগে আহমদ শাহ আবদালী অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। যুদ্ধ করা দূরের কথা, উন্মুক্ত চেহারায় জনসম্মুখে আসাও তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই তিনি সোলেমান পবর্তমালার এক নিভৃত দূর্গে আত্মগোপন করে জীবনের শেষ বছরগুলো কাটান। তার রোগের বিষয়টি গোপন থাকেনি। তবুও তার সম্মন্ধে জনগণের শ্রদ্ধা এমন গভীর ছিল যে, সাম্রাজ্যে কোন বিদ্রোহ দেখা দেয়নি। ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার পর আহমদ শাহ আবদালী তদীয় দ্বিতীয় পুত্র তাইমুর শাহের নিকট বস্তুত রাজ্যশাসন হস্তান্তর করেন।

রাষ্ট্র-স্রষ্টা

আহমদ শাহ আবদালী স্বেচ্ছাচারী শাসক হিসেবে দেশ শাসন করেননি। নয় সদস্য বিশিষ্ট একটি মন্ত্রীপরিষদের মাধ্যমে তিনি রাজ্য পরিচালনা করতেন। মন্ত্রীদের দায়িত্ব বিষয়ভিত্তিক না হয়ে তা ছিল অঞ্চলভিত্তিক। তারা নিজ নিজ দায়িত্বাধীন প্রাদেশিক অঞ্চলের শাসনকর্তার রাজকার্য তদারকি করতেন এবং বাদশাহের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ থাকতো। এই নয় সদস্য বিশিষ্ট উপদেষ্টা পরিষদ ছিল অনেকটা বর্তমান কালীন মন্ত্রীপরিষদের ন্যায়।

আহমদ শাহ আবদালী ছিলেন একজন দৃঢ়চেতা, আত্মসংযমী সংবেদনশীল এবং ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ। মানব চরিত্র অনুধাবনের মেধা এবং গভীর অনুভূতিসম্পন্ন শাসক ছিলেন আহমদ শাহ আবদালী।

আহমদ শাহ আবদালীর পূর্বে আফগানিস্তান ছিল অন্য রাজ্য বা সাম্রাজ্যের অংশ বিশেষ। আহমদ শাহ আবদালীর সময়ে আফগানিস্তান স্বতন্ত্র রাষ্ট্র ও সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের মর্যাদা লাভ করে। আফগানিস্তানে শত শত বা হাজার উপজাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে এক জাতি এবং রাষ্ট্রে সুসংগত করা আহমদ শাহ আবদালীর পূর্বে কারো পক্ষে সম্ভব হয়নি। অসম্ভবকে সম্ভব তিনি করেছিলেন শুধুমাত্র সামরিক প্রতিভা নয়, বরং রাজকীয় দক্ষতা, মানসিক এবং মানবিক গুণাবলীর মাধ্যমে।

১১

আবদালী দুররানী রাজ বংশ

(১৭৪৭ - ১৮৪২ খৃঃ)

আহমদ শাহ সাদোজাঁই আবদালী দুররানী (১৭২৭ - ৭৩ খৃঃ)

ইরান-আফগান সম্রাট নাদির শাহের হত্যাকাণ্ডের পর তার অন্যতম এবং যোগ্যতম সেনাধ্যক্ষ এবং মোহাম্মদ জামান খান সাদোজাই-এর দ্বিতীয় পুত্র আহমদ শাহ আবদালী আফগান গোত্রীয় পরিষদ জিরগা কর্তৃক আফগানিস্তানের সম্রাট নির্বাচিত হন (১৭৪৭ খৃঃ)। তিনি ছিলেন পুশতুন। তার পূর্বপুরুষ 'সাদো' এর নাম থেকে তার বংশের নাম হয় সাদোজাঁই রাজবংশ। পুশতু ভাষায় জাঁই শব্দের অর্থ বংশধর, বংশ বা পুত্র। আবদালীর পূর্বপুরুষদের মধ্যে বহু আবেদ ছিলেন বলে তার রাজবংশের অন্যতম উপাধি হয় আবদালী রাজবংশ।

আহমদ শাহ আবদালী দুররানী দুররে-দুররানী উপাধি ধারণ করে কান্দাহার নগরীর উপকণ্ঠে মাত্র ২০ বছর বয়সে আফগানসম্রাট হিসেবে অভিসিক্ত হন (১৭৪৭ খৃঃ)। তাই তাঁর প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ দুররানী বংশ নামেও পরিচিত। আহমদ শাহ আবদালী ২৬ বছর রাজত্ব করেন এবং ৭-৮ বার ভারতে বিজয় অভিযান পরিচালনা করেন। ১৭৫৭ সনে তিনি প্রথমবার দিল্লী দখল করেছিলেন।

পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে (১৭৬১ খৃঃ) মারাঠাদেরকে পরাজিত করে আহমদ শাহ আবদালী ভারত ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি এক লক্ষ সৈন্য নিয়ে মারাঠা কনফেডারেসীর ৫ লক্ষ সৈন্যের মুখোমুখি হন। এ যুদ্ধে দুই লক্ষ মারাঠা সৈন্য নিহত এবং ২২ হাজার সৈন্য বন্দী হয়।

১৭৬১ সনে পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে মারাঠা শক্তি পর্যুদস্ত করার পর ১৭৬২ সনে আবদালী পাঞ্জাবে শিখদেরকে পরাজিত করেন। আবদালীর বংশধরগণ ১৮১৮ পর্যন্ত আফগানিস্তানে এবং ১৮৪২ খৃঃ পর্যন্ত হেরাতে রাজত্ব করেন। আকসাস বা আমুদরিয়া হতে সিন্ধু নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল কান্দাহার সম্রাট আ-হমদ শাহ আবদালীর সাম্রাজ্য। ১৭৭৩ সনে আহমদ শাহ আবদালী কোবা পর্বতের মাররুত নামক স্থানে মুখে ক্যানসার রোগে মাত্র ৪৬ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। কান্দাহার শহরেই নির্মিত হয়েছে তার স্মৃতিসৌধ সমাধি।

তাইমুর শাহ (১৭৭৩-৯৩ খৃঃ)

আহমদ শাহ আবদালীর দ্বিতীয় পুত্র তাইমুর শাহ ছিলেন বিলাসী ও দুর্বল শাসক। কিন্তু পিতার গুণরাজি ও স্মৃতির কল্যাণে বিশ বছর (১৭৭৩-৯৩ খৃঃ) পর্যন্ত সংঘাতহীন এবং শান্তিপূর্ণভাবে রাজত্ব করতে সক্ষম হন। রাজ্য পরিচালনা অপেক্ষা আরাম, আয়েশ, ভোগ-বিলাসে ছিল তার অধিকতর উৎসাহ। তার রাজত্বকালেই তার বহুসংখ্যক পুত্র কাশ্মীর, পেশোয়ার, দেরাজাত, কান্দাহার গভর্ণর হিসেবে নিজেদের প্রভুত্ব কায়েম করেন।

তৈমুর শাহের ৩৬(ছত্রিশটি) সন্তানের মধ্যে ২৩ জন ছিল পুত্র। ২৩ পুত্র থাকা সত্ত্বেও তিনি একটিকেও উত্তরাধিকারী মনোনীত করে যাননি। হয়তো তিনি ভয় করে ছিলেন যে, যাকে তিনি উত্তরাধিকারী মনোনীত করবেন, তার বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হবে অপর ২২ ভ্রাতা। এ প্রেক্ষাপটে কাউকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করার তাৎপর্য হলো মৃত্যু পরোয়ানা।

জামান শাহ (১৭৯৩-৯৭ খৃঃ)

তৈমুর শাহের পঞ্চম পুত্র জামান শাহ বিলাসী শাসক ছিলেন। রাজধানী কাবুল হলেও তিনি অধিকাংশ সময় পেশোয়ারেই কাটাতেন। তার আপন ভ্রাতা সুজা-উল-মূলক কান্দাহারে এবং বৈমাত্রেয় ভ্রাতা মাহমুদ শাহ অনেকটা স্বাধীনভাবে হেরাতের শাসনভার পরিচালনা করতেন। পিতামহ আহমদ শাহ আবদালীর ন্যায় তিনিও ভারতে অভিযান পরিচালনা করে স্বীয় কোষাগার সম্প্রসারণে এবং সমর্থক গোত্রপতিদের সন্তুষ্টি বিধানে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। এজন্য তিনি রাজ্যের বিভিন্ন অংশে ভ্রমণ করে বিরাট এক বাহিনী সংগঠিত করেন।

জামান শাহ ভারতে বৃটিশ গভর্নর জেনারেল মার্কুইস ওয়েলেসলির নিকট এক পত্রে তার উত্তর ভারতে অভিযানের বিষয় অবগত করেন এবং উত্তর ভারত হতে তার পিতামহ আবদালীর ন্যায় মারাঠা প্রভাব খর্ব এবং মারাঠাদেরকে উত্তর ভারত হতে বিতাড়নে বৃটিশের সহযোগিতা কামনা করেন।

এতে হয়েছে হিতে বিপরীত। লর্ড ওয়েলেসলি জামান শাহের এ অভিযান প্রতিহত করতে পারস্যের কাজার সম্রাটের সাহায্য কামনা করেন। যুদ্ধসামগ্রী বিক্রয় এবং প্রদানের শর্তে তিনি পারস্য সম্রাট ফতেহ আলী শাহ-এর সঙ্গে সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষর করেন।

শাহ ইসমাইল কর্তৃক ইরানে ১৫০৯ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় সাফাভী রাজবংশ। ২২৭ বছর রাজত্বের পর এ বংশের পতন ঘটে তুর্কমেনী আফগান নাদির শাহের হাতে ১৭৩৬ খৃষ্টাব্দে।

এ সময় দিল্লী পর্যন্ত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর প্রভাব বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল। জামান শাহের ভারত আক্রমণের খবরে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বোর্ড অব ডাইরেক্টর বিচলিত হন। তারা জামান শাহের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের পরিবর্তে কূটনৈতিক প্রভাব প্রয়োগ করেন।

কাজার গোত্রপতি আগা মোহাম্মদ খান কর্তৃক নাদির শাহের হত্যার পর আফগানিস্তানে আহমদ শাহ আবদালীর রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরেও পারস্যে কাজার বংশধরগণ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন (১৭৪৭-১৯২৫ খৃঃ)। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী পারস্যে একটি কূটনৈতিক মিশন প্রেরণ করেন। তারা ভয় করেন যে জামান শাহ ভারতে মারাঠা শক্তিকে পরাভূত করে কোম্পানীর জন্যে ভীতির কারণ হয়ে উঠতে পারেন। তেহরানে বৃটিশ এজেন্ট-এর মাধ্যমে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী পারস্যে কাজার রাজকে পশ্চিম প্রান্ত হতে আফগানিস্তান আক্রমণে প্রলুব্ধ করেন। নাদির শাহের নিজস্ব মাতৃভূমি আফগানিস্তানের পশ্চিমাংশে কাজার সাম্রাজ্য সম্প্রসারণে প্রস্তুতি নিতে ইংরেজগণ পারস্য রাজকে উদ্বুদ্ধ করেন। পারস্য সম্রাট নাদির শাহও জন্মগতভাবে কাজার গোত্রের সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। পূর্ব প্রান্ত হতে ভারতীয় শাসকবৃন্দ কর্তৃক আফগানিস্তান আক্রমণের আশ্বাস তারা পারস্য রাজকে দেন।

এই খবর পেয়ে জামান শাহ ভারত আক্রমণে পরিকল্পনা ত্যাগ করেন।

জামান শাহের সময় পাঞ্জাবে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। শিখগণ লাহোরে জামান শাহ নিয়োজিত গভর্নরকে হত্যা করেছিল।

জামান শাহ পাঞ্জাবে এসে সর্বদলের বিদ্রোহ দমন করেন। জামান শাহ কাবুল হতে রাজধানী লাহোরে স্থানান্তরের চিন্তাও করেছিলেন। কিন্তু তার অনুগত সর্দারগণ তাতে রাজী হয়নি। এ প্রেক্ষাপটে বিদ্রোহী শিখদের সঙ্গে তার এক সন্ধি হয়। শিখদের সঙ্গে সন্ধির একটি শর্ত ছিল যে, শিখগণ জামান শাহের অনুগত থাকবে। তবে একজন শিখকে পাঞ্জাবে জামান শাহের প্রতিনিধি বা গভর্নর নিয়োগ করতে হবে। আলোচনার ফলশ্রুতিতে রণজিৎ সিংহ নামে একজন যুব শিখনেতা পাঞ্জাবের গভর্নর নিযুক্ত হন।

কাবুলে দুর্বলতার সুযোগে শিখ গভর্নর রণজিৎ সিং শতদ্রু নদী হতে সিন্ধু নদী সমগ্র এলাকাতে শিখ রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেন এবং কাশ্মীর ও পেশোয়ারে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার চিন্তা-ভাবনা করতে থাকেন। পরবর্তীতে সর্দার রণজিৎ সমগ্র পাঞ্জাবে শিখ রাজত্ব স্থাপন করেন।

সরদার পায়েন্দা খান

বারাকজাঁই গোত্রের সরদার হাজি জামাল খানের পুত্র পায়েন্দা খান আহমদ শাহ আবদালীর একজন উজির ছিলেন। তার পুত্র তাইমুর শাহ পায়েন্দা খানকে প্রধান উজির নিযুক্ত করেন। তিনি পূর্ণ দক্ষতা ও আনুগত্যের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন। তার উপাধি ছিল উজির সরফরাজ খান। দীর্ঘকাল উজির হিসাবে প্রতিষ্ঠিত থাকার ফলে পায়েন্দা খানের প্রভাব প্রতিপত্তি ও শত্রু সংখ্যা অত্যধিক বৃদ্ধি পায়।

তৈমুর শাহের পুত্র জামান শাহের রাজত্বকালে পায়েন্দা খান অধিকতর প্রভাবশালী হয়ে ওঠেন। জামান শাহ সন্দেহ করেন যে, প্রধান মন্ত্রী পায়েন্দা খান তাকে অপসারণ করে নিজেই সিংহাসনে আরোহণ করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছেন। পেশোয়ারে অবস্থানকারী জামান শাহ পরিষদদের কুমন্ত্রে প্রভাবিত হয়ে বারাকজাঁই বংশের তিন পুরুষ পর্যন্ত অনুগত সুযোগ্য এবং বিশ্বস্ত প্রধানমন্ত্রী পায়েন্দা খানকে হত্যা করান।

মাহমুদ শাহ (১৭৯৭-১৮০৩ খৃঃ)

পায়েন্দার খানের অনুগত গোত্রাধিপতি ও তার বিক্ষুব্ধ বংশধরগণ তাদের আনুগত্য জামাল শাহের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা এবং হেরাতের গভর্নর মাহমুদ শাহের উপর স্থাপন করেন। বারাকজাঁই গোত্রের সমর্থনে শক্তিশালী হয়ে হেরাতের গভর্নর মাহমুদ শাহ জামান শাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। জামান শাহ ৪ বছর রাজত্ব করার পর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা মাহমুদ শাহের নিকট পরাজিত হন এবং তার চক্ষু উৎপাটন করে তাকে অন্ধ করে দেয়া হয়। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী তাকে ভারতে আশ্রয় দান করেন। এরূপ উদারতা আরো বহুবার ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী প্রদর্শন করেন। মাহমুদ শাহ ১৭৯৭-১৮০৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত কাবুলের রাজা ছিলেন।

সুজা উদ্দৌলা শাহ (১৮০৩ - ১৮০৯ খৃঃ এবং ১৮৩৯-৪২ খৃঃ)

জামান শাহের আপন ভ্রাতা ও কান্দাহারের শাসনকর্তা সুজা উদ্দৌলা শাহ তার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা মাহমুদ শাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং তাকে পরাজিত করে কাবুলের সিংহাসনে আরোহণ করেন (১৮০৩)। মাহমুদ শাহ ধৃত

হয়ে ১৮০৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বন্দী জীবন যাপন করেন। সুজাউদ্দৌলা শাহ তার ভ্রাতা জামান শাহের ব্যবহারে অনুতপ্ত হয়ে সরদার পায়েন্দা খানের পুত্রদের বিশ্বাসভাজন হতে চেষ্টা করেন।

ফাতাহ খানের ষড়যন্ত্র

সুজা শাহ পায়েন্দা খানের পুত্র ফাতাহ খানকে উজির নিযুক্ত করে বিভিন্ন দায়িত্ব অর্পণ করেন। জামান শাহের ন্যায় সুজা শাহও পেশোয়ারে বিলাস যাপনে লিপ্ত হন। রাজ্যের শাসন ক্ষমতা তিনি পায়েন্দা খানের পুত্র এবং প্রধানমন্ত্রী ফাতাহ খানের হাতে ছেড়ে দেন।

ফাতাহ খান সুজা শাহের উপর তার ভ্রাতা জামান শাহ কর্তৃক পিতৃ হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের চিন্তা ভাবনা শুরু করেন। তিনি প্রথমে সরল প্রাণ শুজাহ শাহকে পরামর্শ দিয়ে রাজার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা মাহমুদ খানকে কারাগার থেকে মুক্ত করেন এবং গোপনে মাহমুদ শাহকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করতে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। কয়েক মাসের মধ্যেই এ ষড়যন্ত্র সফল হয়। সুজাউদ্দৌলা শাহ ১৮০৯ খৃঃ সিংহাসনচ্যুত হন।

বৃটিশের মিত্র রাজা হিসেবে সুজা শাহ প্রথম আফগান যুদ্ধের সময় প্রায় তিন বছর (১৮৩৯-৪২ খৃঃ) পর্যন্ত দ্বিতীয় মেয়াদে কাবুলের বৃটিশ তাবেদার শাসক ছিলেন। স্বাধীনতা প্রিয় বিক্ষুব্ধ আফগান জনতা বৃটিশের অনুগ্রহ পুষ্ট হওয়ার কারণে তাদের শ্রদ্ধেয় আহমদ শাহ আবদালীর দৌহিত্র সুজা শাহকে হত্যা করেন।

মাহমুদ শাহ (১৮০৯ - ১৮১৮ খৃঃ)

বারাকজাঁই গোত্র এবং উজির ফাতাহ খানের সমর্থনে মাহমুদ শাহ কাবুলের সিংহাসনে আরোহণ করেন। সুজা শাহ পরাভূত হয়ে জীবন রক্ষার জন্য পেশোয়ারে এসে পালিয়ে পাঞ্জাব রাজ রণজিৎ সিংহের আশ্রয় ভিক্ষা করেন। কাবুলে গোলযোগের সুযোগে এবং সুজা শাহের নৈতিক সমর্থনে রঞ্জিৎ সিংহ দেরাজাত, পেশোয়ার (১৮৩৪ খৃঃ) কাশ্মীর নিজ রাজ্যভুক্ত করেন।

মুঘল সম্রাট শাহজাহানের রাজ মুকুটের বিশ্ববিখ্যাত হীরক কহিনুর মনি নাদির শাহ দিল্লী দখলের সময় হস্তগত করেন। এ মনি নাদির শাহের পর আ-হমদ শাহ আবদালী, তৈমুর শাহ, জামান শাহ হয়ে সুজা শাহের হাতে আসে। রঞ্জিৎ সিংহ তার আশ্রয়প্রার্থী সিংহাসনচ্যুত কাবুলরাজ সুজা শাহ হতে এ কহিনুর

মনি কেড়ে নেন। শিখগণ হতে এ কহিনুর মনি ইংরেজরা নিয়ে যায়। তা এখন রাণী এলিজাবেথের রাজমুকুটে শোভা পাচ্ছে।

রঞ্জিৎ সিংহের দুর্ব্যবহারে অপমানিত হয়ে সুজা শাহ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর নিকট আত্মসমর্পণ করেন ১৮১৫ (খৃঃ)। ইস্ট ইন্ডিয়ান কোম্পানী তাকে একটি বৃত্তি প্রদান করেন এবং লুধিয়ানা নগরীতে তার নিরাপদ বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দেন। আমাদের দেশে মীর জাফর শব্দটি যেমন গালি হিসেবে ব্যবহার হয় আফগানিস্তানে শাহ সুজা শব্দটি সে অর্থে ব্যবহার হয়।

ফাতাহ খানের পরিণতি ও বারাকজাঁই বংশের অভ্যুদয়

শাহ সুজার উজির ফাতাহ খান রাজার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা মাহমুদ শাহের কারামুক্তি ও সিংহাসন পেতে সহায়তা করেন। ফাতাহ খানের ভাইদের সংখ্যা ছিলো ২১। তাদের অনেকেই ছিল সুযোগ্য। ফাতাহ খানের প্রধানমন্ত্রীত্বকালে তার ভ্রাতৃগণ প্রভাবশালী হয়ে ওঠেন। মাহমুদ শাহ ফাতাহ খানের প্রতি কৃতজ্ঞ ছিলেন। তার পুত্র কামরান ভয় করলেন যে. ফাতাহ খান মাহমুদ শাহের পর নিজেই কাবুলের সিংহাসনে আরোহণ করবেন। তাই যুবরাজ কামরানের নির্দেশে ফাতাহ খানকে হত্যা করা হয় (১৮১৮ খৃষ্টাব্দে)।

ফাতাহ খানের মৃত্যুর পর তার ভ্রাতৃবৃন্দ বিশেষ করে মুহাম্মদ আজিম খান কাবুলে তাদের রাজত্ব স্থাপনের চেষ্টা করে, কিন্তু পুরোপুরি সফল হননি। ফাতাহ খানের মৃত্যুর ৮ বছর পর ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে পায়েন্দা খানের কনিষ্ঠ পুত্র দোস্ত মুহাম্মদ কাবুলে তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮১৮–২৬ সন পর্যন্ত বিরাজিত অরাজকতার সময় বলখ, সিন্ধু বেলুচিস্তান আফগানিস্তান হতে স্বাধীন হয়ে যায়। শাহ মাহমুদ এবং তৎপুত্র কামরান হেরাতে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতে থাকেন।

মাহমুদ শাহের মৃত্যুর পর শাহজাদা কামরান হেরাতের শাসনভার গ্রহণ করেন। তিনি রাজা হওয়ার পর রাজকার্যে উদাসীন হন এবং মন্ত্রী ইয়ার মোহাম্মদের উপর সকল দায়িত্ব অর্পণ করে বিলাসে লিপ্ত হন। কাবুলে শাহ সুজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সময় ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে মন্ত্রী ইয়ার মোহাম্মদ হেরাতের স্বাধীন রাজা কামরানকে হত্যা করেন। তার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সাদোজাঁই বংশের রাজত্বের চূড়ান্ত অবসান হয়।

১২

বারাকজাঁই বংশের প্রতিষ্ঠাতা আমীর দোস্ত মোহাম্মদ খান

সরদার মোহাম্মদ

সাফাভী বংশের সর্বশেষ পারস্য সম্রাট তৃতীয় শাহ আব্বাসের দু'জন উজির ছিলেন প্রখ্যাত এবং প্রতিভাবান। এর একজন হলেন 'সরদার সাদো' দ্বিতীয় জনের নাম 'সরদার মোহাম্মদ'। তৃতীয় শাহ আব্বাসকে পরাজিত এবং নিহত করে তুর্কমেনী আফগান সর্দার নাদির শাহ ইরান-আফগানিস্তানের রাজা হন।

জামাল খান

নাদির শাহের মৃত্যুর সময় সাদো এর বংশধর আহমদ শাহ আবদালী ছিলেন সেনাধ্যক্ষ এবং মুহাম্মাদ-এর বংশধর সরদার জামাল খান ছিলেন উজির। সেনা বাহিনী ছিল প্রতিভাশালী তরুণ সেনাধ্যক্ষ আহমদশাহ আবদালীর অনুগত। আহমদ শাহ আবদালী সেনাবাহিনীতে তার কর্তৃত্ব সুসংহত করে আফগানিস্তানের গোত্রীয় পরিষদ লোই জিরগা আহ্বান করেন। লোই জিরগা কর্তৃক আহমদ শাহ আবদালী রাজা নির্বাচিত হন। মন্ত্রী হাজী জামাল খান রাজসিংহাসনের জন্যে কোন প্রতিযোগিতা না করে আহমদ শাহ আবদালীকে আফগানিস্তানের রাজা হিসেবে মেনে নেন।

পায়েন্দা খান

হাজী জামাল খানের পুত্র পায়েন্দা খানও অত্যন্ত প্রতিভাশালী এবং বিচক্ষণ মন্ত্রী ছিলেন। তিনি আহমদ শাহ আবদালীর আমলে, তৎপুত্র তাইমুর শাহ এবং প্রপৌত্র জামান শাহের উজির এবং প্রধান উজির ছিলেন।

আফগান বাদশাহ জামান শাহ সন্দেহবশতঃ সাদোজাঁই দুররানী বংশের তিন পুরুষের অনুগত মন্ত্রী পায়েন্দা খানকে হত্যা করেন। জামান শাহ অবশ্য তার আপন বৈমাত্রেয় ভ্রাতা মাহমুদের নিকট পরাজিত হন। মাহমুদকে সিংহাসন লাভে সাহায্যে করেন পায়েন্দা খানের ২২ জন পুত্র। জামান শাহের চোখ তুলে অন্ধ করে দেয়া হয়। তিনি ভারতের লুধিয়ানায় বৃটিশের বৃত্তিভোগী হিসেবে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

ফাতাহ খান

আফগান বাদশাহ মাহমুদকে পরাজিত এবং অপসারণ করেন তার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা সুজা উদ্দৌলা শাহ। তিনি ছিলেন জামান শাহের আপন ভ্রাতা। সুজা শাহ পায়েন্দা খানের পুত্রদের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপন করতে চান। তিনি পায়েন্দা খানের জ্যেষ্ঠ পুত্র ফাতাহ খানকে উজির নিযুক্ত করেন। ফাতাহ খান বিশ্বস্ততা প্রমাণ করে সুজা খানের আস্থাভাজন হন। তারই পরামর্শে সুজা শাহ তার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা মাহমুদকে কারামুক্ত করেন।

ফাতাহ খান মাহমুদ শাহের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে সুজা শাহকে সিংহাসনচ্যুত করেন এবং সুজা খান পরাজিত হয়ে পাঞ্জাবে শিখদের এবং ভারতে বৃটিশের আশ্রয় গ্রহণ করেন। ফাতাহ খানের ক্ষমতা বৃদ্ধিতে ভীত হয়ে আফগান বাদশাহ মাহমুদ এবং তার পুত্র শাহজাদা কামরান ফাতাহ খানকে হত্যা করেন।

দোস্ত মোহাম্মদ খান (১৮২৬/৩৪-১৯৬৩ খৃঃ)

ফাতাহ খানের মৃত্যুতে (১৮১৮ খৃঃ) বিক্ষুব্ধ ফাতাহ খানের ২১ ভ্রাতা আমীর মাহমুদ ও কামরানের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন। আট বছর পর্যন্ত দেশে বিরাজ করে রাজার অভাবে অরাজকতা। আমীর মাহমুদ এবং কামরান আত্মরক্ষার জন্য কাবুল ত্যাগ করে হেরাতে চলে যান। আফগানিস্তানের পূর্ব অঞ্চল ক্রমশঃ পায়েন্দা খানের অন্য ২১ পুত্রের দখলে এসে যায়। কাবুল, জালালাবাদ এবং গজনীর শাসনভার হস্তগত করেন দোস্ত মোহাম্মদ খান (১৮২৬ খৃঃ)। কান্দাহার (১৮৩৮) গিরিশিক যৌথভাবে দখল করেন তাঁর ভ্রাতৃত্রয় কহনদিল, পুরদিল, রহমদিল । পেশোয়ার (১৮৩৮ খৃঃ) কোহাট, ইউসুফ জাঁই এলাকা দখল করেন অপর ভ্রাতৃত্রয় সুলতান মোহাম্মদ, পীর মোহাম্মদ, এবং সাঈদ মোহাম্মদ। এরা সকলেই ছিলেন বারাকজাঁই সর্দার পায়েন্দা খানের পুত্র। শেষোক্ত তিন ভ্রাতা অবশ্য শিখদেরকে ঊর্ধতন রাজা হিসেবে স্বীকার করে নিয়ে তাদের সামন্ত রাজা হিসেবে পেশোয়ার, কোহাট, ইউসুফজাঁই এলাকার অধিকার কায়েম করেন।

সাদোজাঁই বংশের পর উজির পায়েন্দা খানের বারাকজাঁই বংশ আফগানিস্তানে ক্ষমতাশীন হন। এই বংশের প্রথম আমীর ছিলেন দোস্ত মোহাম্মদ খান (১৮২৬ খৃঃ) এবং সর্বশেষ আমীর ছিলেন বাদশাহ জহির শাহ (১৯৭৩ খৃঃ)। আহমদ শাহ আবদালী দুররানীর রাজ্যের প্রসার ছিল ইরানের মাশহাদ শহর থেকে লাহোর, কাশ্মীর ও চীন সীমান্ত পর্যন্ত।

দুররানীদের শাসন ক্ষমতা দুর্বল হওয়ার পর পেশোয়ার থেকে পাঞ্জাব ক্রমশ শিখ ও বৃটিশ শাসনে আসার ধারা সৃষ্টি হয়।

মাহমুদ শাহ এবং তৎপুত্র কামরান শাহের হাতে হেরাত অঞ্চলে কর্তৃত্ব থাকাকালে আফগানিস্তানে অন্যান্য অংশ আহমদ শাহ আবদালী দুররানী বংশের হস্তচ্যুত হয়ে তার মন্ত্রী পায়েন্দা খানের পরিবারের শাসনে এসে যায়।

আহমদ শাহ আবদালী দুররানীর বংশধর সাদোজাঁই বংশের হাতে ক্ষমতা থাকাকালে আফগানিস্তান মূলতঃ দুর্বল হলেও স্বাধীন রাষ্ট্র ছিল। সাদোজাঁই দুররানী বংশ ক্ষমতাচ্যুত হয়ে বারাকজাঁই গোত্রের হাতে ক্ষমতা আসার পর তারা বৃটিশের অনুগত মিত্র রাজ্যে পরিণত হয়। এই ধারা শুরু হয় দোস্ত মোহাম্মদের সময় হতে।

দুররানী বংশের ক্ষমতাচ্যুতির পর রাশিয়া এবং বৃটিশ আফগানিস্তানে তাদের প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করেন।

রাশিয়া তার মিত্র রাষ্ট্র পারস্যকে মাহমুদ এবং কামরানের হাত থেকে হেরাত এবং বালখ দখলে প্ররোচিত করেন।

রাশিয়া কাসপিয়ান সাগরের দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয়ে আমুদরিয়া পর্যন্ত পৌঁছে যায়। পূর্বে শিরদরিয়া পর্যন্ত রাশিয়ান প্রভাব ছিল। পূর্বদিকে বৃটিশের প্রত্যক্ষ প্রভাব সাটলেজ নদী পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়। বৃটিশ ও তাদের মিত্রগণ কাশ্মীর, পাঞ্জাব, পেশোয়ার, কৌহাট, বেলুচিস্তান, সিন্দু প্রদেশে রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেন।

হেরাতের দিকে পারস্য প্রভাব বিস্তার বৃটিশ সরকার সুনজরে দেখেনি। কাবুলে বৃটিশ মিশন প্রধান আলেকজান্ডার বারনসের প্রতি উপেক্ষা এবং রাশিয়ান কূটনৈতিক মিশনে সমাদরে বৃটিশ ভাইসরয় লর্ড অকলেন্ড ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। তারা দোস্ত মাহমুদকে অপসারণ করে জামান শাহের আপন ভ্রাতা মোহাম্মদ সুজা উদ্দৌলা শাহকে কাবুলের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন (৬ই আগষ্ট ১৮৩৯ খৃঃ) এবং মাহমুদ ও যুবরাজ কামরানকে হেরাতের রাজা হিসেবে স্বীকার করে নেন। ১৮৪২ সনে কাবুলে সুজা শাহ নিহত হওয়ার পর বৃটেনের আর্শিবাদে দোস্ত মোহাম্মদ পুনরায় আফগানিস্তানে আমীর পদে অধিষ্ঠিত হন। তবে স্বীয় বিচক্ষণতার জন্যে তাকে সুজা শাহের ভাগ্য বরণ করতে হয়নি।

বারাকজাঁই-এর ক্ষমতা বেলুচিস্তান, সিন্ধু ও পাঞ্জাবে মজবুত না হওয়ার কারণে পাঞ্জাবে শিখরাজত্ব দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত হয়। সিন্ধু প্রদেশের ক্ষমতায় আসেন তালপুর পরিবার। কামবাড়িনি বংশের মিহরাব খান বেলুচিস্তানের শাসনভার গ্রহণ করেন। আফগানিস্তানে গোলযোগের সুযোগে শিখগণ দেরাজাত এবং কাশ্মীর নিজ রাজ্যভুক্ত করেন।

১৮৪৩ সনে বৃটিশ সিন্ধুদেশ জয় করে নেয়। ব্রিগেডিয়ার জেনারেল জেকব সিন্দুতে বৃটিশ রাজত্ব সংহত করে নেন। তার নামেই জেকোবাবাদ নামকরণ হয়।

১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে শিখগণ বৃটিশের নিকট চূড়ান্তভাবে পরাজিত হয়। ফলে পাঞ্জাব থেকে পেশোয়ার পর্যন্ত বিস্তৃত রাজ্য বৃটিশের অধিকারে চলে আসে। তাই তারা আফগানিস্তানের শাসন ব্যাপারে অধিকতর সচেতন হন।

দোস্ত মোহাম্মদ অত্যন্ত বিচক্ষণ শাসক ছিলেন। তিনি প্রশাসনিক বা রাজনৈতিক এবং সামরিক দক্ষতাবলে আফগানিস্তানে বিবাদমান গোত্রগুলোকে দমন করে তার ক্ষমতার ভীত মজবুত করেন।

দোস্ত মোহাম্মদ ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে বুখারার আমীর থেকে বলখ দখল করে তার রাজ্যের সীমানা উত্তরে আমুদরিয়া পর্যন্ত সম্প্রসারিত করেন। খাজা সালেহ পর্যন্ত আফগানিস্তানের উত্তর সীমানা নির্ধারিত হয়। যদিও পেশোয়ার, দেরাজাত, কাশ্মীর ইত্যাদি বৃটিশ দখলভুক্ত হয়ে যায়। তিনি কুররাম দাউর উপত্যকায়, কোহাট, বান্নু ইত্যাদি এলাকায় তার প্রভাব সংহত করেন।

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে রহমদিল খান পরিবার হতে কান্দাহার দখল করে দোস্ত মোহাম্মদ খান নিজ রাজ্যভুক্ত করেন।

বৃটিশের সঙ্গে দোস্ত মোহাম্মদের সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ, পরিমিত এবং ভারসাম্য-মূলক ছিল। কাশ্মীর, পেশোয়ার ইত্যাদি বৃটিশের নিকট হারাবার দুঃখ তিনি সংবরণ করেন। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে আফগান ও ভারত বন্ধুত্বমূলক চুক্তি পেশোয়ারে সম্পাদিত হয়। দোস্ত মোহাম্মদ খানের পক্ষে এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন তার পুত্র এবং যুবরাজ সরদার গোলাম হায়দার খান।

১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে আফগান-বৃটিশ বন্ধুত্ব চুক্তি স্বাক্ষরের পর দোস্ত মোহাম্মদ ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে বৃটিশের সঙ্গে আরেকটি মৈত্রি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এ চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য তিনি স্বয়ং পেশোয়ারে আসেন। বৃটিশ পক্ষে উভয় চুক্তি স্বাক্ষর করেছিলেন স্যার জন লরেন্স। কামরান শাহের মৃত্যুর পর তার মন্ত্রী ইয়ার মোহাম্মদ খান হেরাতের শাসনভার গ্রহণ করেন। তার মৃত্যুর পর হেরাত চলে যায় পারস্য রাজার দখলে।

১৮৬৩ সনে দোস্ত মোহাম্মদ হেরাত দখল করেন। পারসিয়ানদে থেকে হেরাত পুনঃদখলের সময় ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে মেজর (পরে স্যার) ল্যামডেস-এর নেতৃত্বে বৃটিশ সামরিক বাহিনী আমীর দোস্ত মোহাম্মদকে সহায়তা করেন।

যেহেতু প্রথম আফগান যুদ্ধের সময় বৃটিশের কাছে তার আত্মসমর্পণের পরেও তার জেষ্ঠ্যপুত্র আকবর খান যুদ্ধ চালিয়ে গিয়েছিলেন, তাই বৃটিশের রোষ পরিহারের লক্ষ্যে আমীর দোস্ত মোহাম্মদ ২য় পুত্র গোলাম হায়দার খানকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। গোলাম হায়দার খান পিতার সঙ্গে আত্মসমর্পণ করে বৃটিশের বৃত্তিভোগী হিসেবে ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। দুররানী

পরিবার হতে গজনী দখলের সময় বৃটিশগণ সরদার গোলাম হায়দার খানকে সাহায্য করেন।

আমীর দোস্ত মুহাম্মদ ১৮৬৩ সনে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর পূর্বে পায়েন্দা খানের পুত্র দোস্ত মোহাম্মদ আফগানিস্তানকে একটি সুসংহত রাজ্যের রূপ দেন।

প্রথম ইঙ্গ আফগান যুদ্ধ (১৮৩৮-৪২)

আফগানিস্তান হয়ে মধ্য এশিয়া এবং পারস্যে বাণিজ্যের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে ক্যাপটেন আলেকজান্ডার বার্নস নামক একজন কম বয়সী স্কটবাসীকে ভারতের গভর্নর জেনালের অকল্যান্ড ১৮৩৭ সনে কাবুলের আমীর দোস্ত মোহাম্মদের দরবারে প্রেরণ করেন। আলেজান্ডার বার্নস আগেও কাবুল ভ্রমণ করেছিলেন এবং দোস্ত মোহাম্মদের সঙ্গে পরিচয় ও হৃদ্যতা স্থাপন করেছিলেন। আলেকজান্ডার বার্নস ফারসী ভাষাও বেশ কিছুটা রপ্ত করেছিলেন। বাণিজ্য ছাড়া রাজনৈতিক এবং কূটনৈতিক বিষয়ে আলোচনার দায়িত্বও আলেজান্ডার বার্নসকে দেয়া হয়।

আফগান আমীর দোস্ত মোহাম্মদের তৎকালীন রাজনৈতিক এবং কূটনৈতিক সমস্যা ছিল দু'টি। শিখগণ দুররানী রাজত্বের শেষদিকে আফগানিস্তান হতে পেশোয়ার দখল করে নিয়েছিল। পারস্যরাজ দুররানী বংশের শেষ শাসক কামরান হতে হেরাত ছিনিয়ে নেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। দোস্ত মোহাম্মদ নিজেও হেরাত দখলে আগ্রহী ছিলেন। কারণ হেরাত ছিল আফগানিস্তানের অংশ। এ অবস্থায় হেরাত দখল এবং পেশোয়ার পুনরুদ্ধারের জন্যে দোস্ত মোহাম্মদের প্রয়োজন ছিল বিদেশী বন্ধুত্ব এবং সামরিক সহযোগিতা।

তৎকালীন বৃটিশ সরকারের সঙ্গে পাঞ্জাবের রাজা রণজিৎ সিংহের ছিল খুই দহরম মহরম। তাই বৃটিশ কোনভাবেই শিখদের বিরুদ্ধে পেশোয়ার পুনরুদ্ধারে দোস্ত মোহাম্মদকে সাহায্য করতে রাজী ছিল না। হেরাত রক্ষার ব্যাপারেও বৃটিশ হতে কোন সাহায্যের আশ্বাস পাওয়া যায়নি।

দোস্ত মোহাম্মদ পেশোয়ার পুনরুদ্ধার এবং পারস্যের আগ্রাসী থাবা হতে হেরাত রক্ষায় রাশিয়ার সাহায্য কামনা করে পত্র লিখেন। এ পত্রের জবাব নিয়ে রাশিয়ান এজেন্ট ভিকোভিচ (Vickovitch) কাবুলে ফিরে আসেন এবং পত্র দোস্ত মোহাম্মদের নিকট প্রদান করেন। এ পত্র নিয়ে রাশিয়ান দূতের সঙ্গে আলোচনা করার আগে দোস্ত মোহাম্মদ অকপটে তার সমস্যা বৃটিশ দূত আলেকজান্ডার বার্নসের সঙ্গে আলোচনা করেন। জারের পত্রও তিনি আলেকজান্ডার বার্নসকে দেখান। এ বিষয়ে তার পরামর্শ চান। রাশিয়ান জার তার পত্রে শিখদের বিরুদ্ধে আফগানিস্তানকে সাহায্য করতে সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন।

এ পত্রের খবর আলেজান্ডার বার্নস ভারতের গভর্নর জেনারেল অকল্যান্ডকে জানান। কিন্তু লর্ড অকল্যান্ড তখন রণজিৎ সিংহ-এর সঙ্গে বৃটিশ প্রেমের সম্পর্কে এত গদগদ যে. দোস্ত মোহাম্মদের দৃষ্টি ভঙ্গির প্রতি সহানুভূতিশীল না হয়ে দোস্ত মোহাম্মদকে অপসারণের লক্ষ্যে রণজিৎ সিংহের সহযোগিতা কামনা করেন এবং আহমদ শাহ আবদালীর দৌহিত্র এবং ভারতে নির্বাসিত সুজা-উদ্দৌলা শাহকে কাবুলের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করার সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন এবং আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করেন। এভাবে শুরু হয় প্রথম আফগান বৃটিশ যুদ্ধ (১৪৩৮-৪২ খৃঃ)।

বৃটিশ কমান্ডার সেল জালালাবাদে এবং কমান্ডার নট্ট কান্দাহারে এবং কমান্ডার পোল্লোক আফগানিস্তানে বিভিন্ন স্থানে সুস্পষ্ট বিজয় অর্জন করেন।

দ্বিতীয় এঙ্গলো আফগান যুদ্ধ হয় ১৮৬৮ সনে বৃটিশ দূতকে আফগানিস্তান ফেরত পাঠিয়েছিল বলে।

প্রথম আফগান যুদ্ধে শুরুর মুখে আমীর দোস্ত মোহাম্মদ সাহায্যের আশায় বুখারায় গমন করেন (১৮৩৯)। বুখারার আমীর তাদের প্রতি সুব্যবহার করেননি। পরাজিত ও বিপর্যস্ত দোস্ত মোহাম্মদ বুখারায় প্রত্যাখাত হয়ে বৃটিশের নিকট আত্মসমর্পণ করেন (১৮৪০ খৃঃ), যদিও তারপুত্র আকবর খান বৃটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকেন। এ যুদ্ধে বৃটিশের জয়লাভ হলেও সেনাপতি ম্যাকনাগটেনকে ষোল হাজার সৈন্যসহ প্রাণ দিতে হয়।

নিজস্ব বিজয়ে উৎফুল্ল হয়ে বৃটিশ সামরিক প্রধানগণ বৃটিশ সহায়তায় কাবুলে আমীর হিসাবে প্রতিষ্ঠিত শাহ সুজাকে পুতুলরাজ এবং ক্রীড়নকে পরিণত করে। জাত্যাভিমান সম্পন্ন আফগানগণ তাদের আমীরের এই অবমাননা সহ্য করতে না পেরে সুজা শাহকে হত্যা করে (বসন্ত, ১৮৪২খৃঃ)। তার পরিবারবর্গ বৃত্তিভোগী বৃটিশ-মিত্র হিসেবে লুধিয়ানায় প্রেরিত হন।

আহমদ শাহ আবদালীর দৌহিত্র সুজা খানের মৃত্যুর পর (১৮৪২ খৃঃ) বিজয়ের মাধ্যমে দুররানী বা বারাকজাঁই পরিবারের কেউ আমীরের মস্‌নদে বসতে পারেননি। কাবুলের সিংহাসন স্থাপনের জন্য বৃটিশের প্রয়োজন ছিল একজন বশংবদ অনুগত রাজা। তাদের নিকট আত্মসমর্পণকারী আমীর এবং পায়েন্দা খানের পুত্র দোস্ত মোহাম্মদ অত্যন্ত বাস্তব বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি বলে প্রতিভাত হন। তিনি যুদ্ধবন্দী হিসেবে ভারতে বৃটিশ প্রভাব-প্রতিপত্তি পর্যবেক্ষণ করেন।

বৃটিশ সরকার দোস্ত মোহাম্মদকেই আফগানিস্তানের পরিবর্তী আমীর হিসেবে কাবুলের সিংহাসনে স্থাপন করেন (১৮৪২ খৃঃ)। প্রথম ইঙ্গ আফগান যুদ্ধের ফলশ্রুতিতে আফগানিস্তানের স্বাধীনতা অক্ষুন্ন থাকলেও এবং আফগানিস্তান পরাধীন না হলেও বৃটিশের অনুগত মিত্র রাজ্যে পরিণত হয়।

১৩

আমীর শের আলী

(১৮৬৩-৬৬ ; ১৮৬৯-৭৯খৃঃ)

আমীর দোস্ত মোহাম্মদের মৃত্যুর পর তার তৃতীয় পুত্র শের আলী পিতার ইচ্ছানুসারে কাবুলের আমীর বা রাজা হন (১৮৬৩ খৃঃ)। কিন্তু তিন বছরের মধ্যে ১৮৬৬ সনে তিনি রাজ্যহারা হন। তার জ্যেষ্ঠ দুই ভ্রাতা বলখের গভর্নর আফজাল খান এবং কুররামের গভর্নর আজিম খান শের আলীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। শের আলী প্রথমে দ্বিতীয় ভ্রাতা এবং কুররামের গভর্নর আজিম খানের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করেন। আজিম খান পরাজিত হয়ে রাওয়ালপিন্ডিতে বৃ-টিশের আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আফজালের স্বপক্ষে তার অধিকার ত্যাগ করেন।

শের আলী নিজেই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আফজাল খানের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী নিয়ে অগ্রসর হন। সন্ধি এবং সমঝোতার উদ্দেশ্যে আলোচনাকল্পে শের আলী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আফজালকে তাঁর শিবিরে নিমন্ত্রণ করেন এবং কৌশলে বন্দী করে ফেলেন। অতঃপর সহজেই তিনি বন্দী ভ্রাতার শাসনাধীন প্রদেশ বলখ দখল করেন। শের আলী অতঃপর তার সহোদর এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা আমীন খানের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন এবং কান্দাহারের কালাত-ই-গিলজাই-এর নিকট কাজরাজ নামক স্থানে তার মোকাবিলা করেন (৬ই জুন ১৮৬৫ খৃঃ)। এ যুদ্ধে শের আলীর ভ্রাতা আজিম খান এবং স্বীয় ঘোষিত উত্তরাধিকারী এবং পুত্র মুহাম্মদ আলী নিহত হয়।

আফজাল খান (১৮৬৬-৬৭ খৃঃ)

১৮৬৬ সনে শের আমীর কান্দাহারে থাকাকালে, শের আমীরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আফজাল খানের সুযোগ্য পুত্র আবদুর রহমান পিতৃরাজ্য বলখ দখল করে নেন। এ খবর পেয়ে শের আলী তার বন্দী ভ্রাতা আফজালসহ ভ্রাতুস্পুত্র আবদুর রহমানের মোকাবিলার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। গজনীর পথে শেখাবাদে দু'বাহিনীর মোকাবিলা হয়। আমীর শের আলী পরাজিত হয়ে পলায়ন করেন (১০ই মে, ১৮৬৬ খৃঃ)। রাজপুত্র আবদুর রহমান পিতাকে মুক্ত করে কাবুলে পৌঁছেন এবং আফজাল খান আমীর হিসেবে সিংহাসনে আরোহণ করেন। আজিম

খানও ভারত হতে কাবুল ফিরে এসে জ্যেষ্ঠভ্রাতার সঙ্গে যোগ দেন। কিন্তু এক বছরের মধ্যেই আমীর আফজাল খান মৃত্যুবরণ করেন।

আজিম খান (১৮৬৭-৬৯ খৃঃ)

আমীর আফজাল খানের মৃত্যুর পর তার কনিষ্ঠ ভ্রাতা আজিম খান কাবুলের সিংহাসন আরোহণ করেন।

শের আলীর পুত্র ইয়াকুব খান হেরাতের গভর্নর ছিলেন। শের আলী পুত্র ইয়াকুব খান এবং তুর্কিস্তানী মিত্র ফয়েজ মুহাম্মদের সঙ্গে মিলিত বাহিনী নিয়ে রাজ্য উদ্ধারের চেষ্টা করে ভ্রাতুষ্পুত্র আবদুর রহমানের নিকট পরাজিত হন।

আমীর আফজাল খান এবং আমীর আজিম খান জনপ্রিয় আমীর ছিলেন না। ১৮৬৮ সনে শের আলীর পুত্র ইয়াকুব খান আমীর আজিম খানের পুত্র এবং কান্দাহারের গভর্নর সারওয়ার খানকে পরাজিত করেন (এপ্রিল ১৮৬৮)। অতঃপর ইয়াকুব খান পিতা শের আলীসহ আমীর আজিম খানের অনুপস্থিতিতে অতর্কিত আক্রমণ করে কাবুল অধিকার করেন (১৮৬৯ খৃঃ) আজিম খান পরাজিত হয়ে তুর্কিস্তানে পলায়ন করেন। আরেকবার সিংহাসন উদ্ধারের ব্যর্থ চেষ্টার পর পরাজিত হয়ে পারস্যে গমন করেন এবং সে বছরই মৃত্যুবরণ করেন (১৮৬৯)।

শের আলী (১৮৬৯-৭৯) ও দ্বিতীয় ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধ (১৮৭৮-৭৯ খৃঃ)

আমীর আফজাল খান এবং আমীর আজিম খানের মৃত্যুর পর শের আলী আমীরের পদে সুদৃঢ় হন। তিনি বন্ধুত্বের আশায় ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড মেয়োর সাথে সৌজন্য সাক্ষাতের জন্যে পাঞ্জাবের আম্বালায় আসেন। বৃটিশ সরকার তাকে গ্রান্ড সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। রাজকীয় দরবার অনুষ্ঠান করে তাকে কাবুলের আমীর এবং বৃটিশের বন্ধু বলে ঘোষণা দেয়া হয়।

বৃটিশ সরকার রাশিয়ার সঙ্গে আলোচনা করে আমীরের জন্যে বাদখশান প্রদেশ রাশিয়ার অনুগত মিত্র সর্দার হতে উদ্ধার করে দেন।

সিস্তান প্রদেশ নিয়ে পারস্য এবং আফগানিস্তানের মধ্যে ঝগড়া ছিল। উভয়পক্ষই বৃটিশ সরকারকে সালিশ মানেন। সালিশে সিস্তান পারস্যের ভাগে পড়ে। এতে আফগান আমীর শের আলী অত্যন্ত নাখোশ হন এবং রাশিয়ার প্রতি বন্ধুত্বের হস্ত সম্প্রসারিত করেন। কারণ, রাশিয়া তাকে বাদখশান প্রদেশ পেতে সাহায্য করে এবং বৃটিশ তাকে সিস্তান হারাতে বাধ্য করেন।

গুজব রটে যে, সিন্ধুনদের পশ্চিম তীরের যে যে এলাকা আফগানিস্তান হতে বৃটিশ দখল করেছে, আমীর শের আলী রাশিয়ার সহযোগিতায় তা পুনরুদ্ধারের

প্রস্তুতি নিচ্ছেন। তার পিতা দোস্ত মোহাম্মদের মৃত্যুর সময় আফগান পদাতিক বাহিনীতে ছিল ৩০,০০০ সৈন্য। শের আলী তা ৬০,০০০-এ বৃদ্ধি করেন।

পেশোয়ারের বৃটিশ কমিশনের মাধ্যমে লর্ড মেয়ো আমীর শের আলীকে জানান যে বৃটিশ সরকার কাবুলে দূত পাঠাতে ইচ্ছুক। আমীর শের আলী বৃটিশকে অবগত করান যে কাবুলে জনরোষের কারণে বৃটিশ দূতের অবস্থান নিরাপদ নয়। শের আলী যদিও কাবুলে বৃটিশ মিশনকে স্বাগত জানাতে রাজী হননি, তবু পেশোয়ারে বৃটিশ প্রতিনিধি সার লিউইস পেলীর সঙ্গে আলোচনার জন্যে তার বৃটিশ বিরোধী মন্ত্রী সাইদ নূর মোহাম্মদকে প্রেরণ করেন। কিন্তু আলোচনা ফলপ্রসু হয়নি (১৮৭৭ খৃঃ)।

রাশিয়ান তুর্কিস্তানের গভর্নর রাশিয়ান জেনারেল কাউফম্যান শের আলীকে পত্রে অবগত করান যে, মধ্য এশিয়ার খোকান্দ রাজ্যে রাশিয়ার মৈত্রীর হস্ত সম্প্রসারণে ইচ্ছুক। ইঙ্গিতে এটাও স্পষ্ট ছিল যে, খোকান্দ রাশিয়ার মিত্র হওয়ার বড় হকদার। এ পত্র আমীর শের আলী ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড লিটনের নিকট প্রেরণ করেন।

বৃটিশ সরকার রাশিয়াকে জানান যে, ১৮৭৩ সনের চুক্তি অনুযায়ী আফগানিস্তান থাকবে রাশিয়ার প্রভাব বলয়ের বাইরে। আফগানিস্তানে বৃটিশ দূত থাকবে না অথচ রাশিয়ান দূতকে রাজকীয় সম্বর্ধনা জানান হবে এ অবস্থান বৃটিশের জন্যে গ্রহণযোগ্য নয়।

কাবুলে রাশিয়ান দূত

রাশিয়া আমীর শের আলীর সঙ্গে আলোচনা ছাড়াই রাশিয়ান দূত জেনারেল স্টলীটভকে কাবুলে প্রেরণ করে। জেনালের স্টলীটভ ২৬শে জুলাই ১৮৭৮ কাবুলে পৌছেন। বৃটিশ দূতকে শের আলী তার রাজ্যে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। অন্য দিকে রাজকীয় দরবার অনুষ্ঠান করে রাশিয়ান মিশনকে অভ্যর্থনা জানান। খবর পেয়ে বৃটিশ গভর্নর জেনারেল লিটন ১৪ই আগষ্ট ১৮৭৮ আমীর শের আলীকে জানান যে, গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনার জন্যে তিনি বৃটিশ জেনালের নেভিল চেম্বারলেনকে কাবুল পাঠাচ্ছেন।

আমীর ১২ সেপ্টেম্বর ১৮৭৮ এ পত্র পান। কিন্তু ২১ সেপ্টেম্বর ১৯৭৮ পর্যন্ত বৃটিশ সরকার কোন জবাব পাননি। অবশ্য এ সময়ে কাবুলে শের আলীর পুত্র এবং যুবরাজ আবদুল্যাহ জান মৃত্যুবরণ করেন।

বৃটিশ মেজর কাভগিনারী ক্ষুদ্র একটি দল নিয়ে খাইবার পাশে আফগান সীমান্ত চৌকি আলী মসজিদে গমন করেন। তাকে কাবুল গমণে বাধা দেয়া হয়।

দ্বিতীয় ইঙ্গ আফগান যুদ্ধ শুরু

এ পরিপ্রেক্ষিতে ভারত সরকার জোরপূর্বক আফগানিস্তানে প্রবেশের প্রস্তুতি শুরু করে দেন এবং লন্ডনে রাজকীয় বৃটিশ সরকারের অনুমোদন চান। বৃটিশ সরকার একটি চরম পত্র কার্যকরী করার চেষ্টা করেন। তাতেও সুবিধা হয়নি। ১৯৭৮ সনের ২১ নভেম্বর খাইবার, কুররাম এবং কোয়েটা রুটে বৃটিশ সেনা বাহিনীর আফগানিস্তানের দিকে মুভমেন্ট শুরু হয়।

ইতিমধ্যে কাবুলে রাশিয়ান মিশনের অবস্থিতি নিয়ে লন্ডন এবং সেন্ট পিটারস বার্গে যোগাযোগ শুরু হয়। রাশিয়ান সরকার জানায় যে, কাবুলে এ মিশন ছিল স্বল্পস্থায়ী। তারা প্রস্তাব করে যে, কাবুলের রাশিয়ান মিশন ব্রিটেন এবং আফগানিস্তানের মনোমালিন্য এবং ভুল বুঝাবুঝির ব্যাপারে মধ্যস্থতা করতে পারে। বৃটিশ এ প্রস্তাবের জবাব পরিহার করে।

রাশিয়ার সঙ্গে বন্ধুত্বের প্রচেষ্টাই বৃটেনের সঙ্গে আমীর শের আলীর শত্রুতার কারণ হয়ে দাঁড়ালো। তাই তিনি বৃটেনের বিরুদ্ধে আশু সংগ্রামে রাশিয়ান সাহায্য কামনা করেন। তুর্কিস্তানের রাশিয়ান প্রশাসক জেনারেল কাউফম্যান কোনরূপ সাহায্যের সম্ভাবনা বাতিল করে দেন এ বলে যে, শীতকালে হিন্দুকুশের ভিতর দিয়ে সৈন্যচালনা অসম্ভব। আমীর রাশিয়ার সঙ্গে পূর্ব বন্ধুত্ব এবং জেনারেল স্টলীটভ-এর মাধ্যমে নব বন্ধুত্বের বরাত দিয়েও রাশিয়ার সাহায্য কামনা করেন। তবু তিনি সাহায্যের কোন আশ্বাস পাননি।

রাশিয়ান মিশন তখন কাবুল ছাড়তে শুরু করেছে। শের আলী রাশিয়ান সাহায্যের আশায় জারের রাজধানী সেন্ট পিটার্সবার্গে গমনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এ খবর তিনি পত্রের মাধ্যমে বৃটিশ সরকারকে জানান। তার ধারণা ছিল, আমীরের জারের রাজধানীতে যাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে এবং আফগানিস্তানের সমর্থনে রাশিয়ার প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের সম্ভাবনায় বৃটিশ আফগানিস্তান আক্রমণের বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করে দেখবে। ২২শে ডিসেম্বর ১৯৬৮ তিনি রাশিয়ার দূতাবাসের অবশিষ্টাংশ কর্মকর্তাদের সঙ্গে কাবুল ত্যাগ করেন এবং বলখ হয়ে রাশিয়ার অধিনস্থ এলাকায় প্রবেশ করেন। কিন্তু তাকে সেন্ট পিটার্সবার্গ গমনে রাশিয়ান সরকার নিরুৎসাহিত করে এবং রাশিয়ান এলাকায় তার অবস্থানও রাশিয়ানদের জন্যে নাজুক পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে বলে তাকে অবহিত করা হয়। তাকে তার দেশে ফিরে গিয়ে বৃটিশের সঙ্গে আপোষ করার উপদেশ দেয়া হয়।

নববন্ধু রাশিয়া কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়ে আমীর শের আলী ভগ্ন হৃদয়ে মাজার-ই শরীফে ফিরে আসেন এবং সেখানে ২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭৯ মৃত্যুবরণ করেন। কাবুল ত্যাগের পূর্বেই তিনি পুত্র ইয়াকুব খানের হাতে সমস্ত ক্ষমতা হস্তান্তর করেন।

অনেকটা বিনা বাধায় এবং বিনাযুদ্ধেই বৃটিশ বাহিনী আফগানিস্তানে ঢুকে পড়ে। খাইবার পাশ দিয়ে প্রেরিত বাহিনী জালালাবাদে পৌঁছে যায়। কুররাম উপত্যকা দিয়ে অগ্রসরমান বাহিনী দুর্ভেদ্য দুর্গ পেইওয়ার কোটাল দখল করে নেয়। কোয়েটা বাহিনী কান্দাহার এবং পার্শ্ববর্তী এলাকা দখল করে।

নতুন আমীর ইয়াকুব খানের সঙ্গে সন্ধির বিষয় আলোচনা শুরু হয়। বৃটিশের দেয়া শর্তে দ্বিতীয় ইঙ্গ আফগান যুদ্ধের অবসান ঘটে। ২৬শে মে ১৮৭৯ খৃঃষ্টাব্দে গান্দুমাকে অনুষ্ঠিত সন্ধির মাধ্যমে স্বীকৃত হয় যে —

(১) বৃটিশ সরকারের উপদেশ এবং পরামর্শক্রমে আফগানিস্তান তার বৈদেশিক নীতি এবং সম্পর্ক নির্ধারণ করবে। (২) কাবুলে এবং দেশের অন্যত্র প্রয়োজনানুসারে স্থায়ী বৃটিশ দূতাবাস স্থাপিত হবে। (৩) কুররাম, পিশির, সিবি এবং খাইবার পাশ বৃটিশের নিয়ন্ত্রণে চলে যাবে। (৪) আফগানিস্তান বছরে ৬০,০০০ পাউন্ড বৃটিশ সাবসিডি গ্রহণ করবে।

দ্বিতীয় ইঙ্গ আফগান যুদ্ধের সফলতায় বৃটিশ গভর্নর জেনারেল লর্ড লিটন খুবই খুশী হন। আফগান বিশেষজ্ঞ স্যার লুই ক্যাবাগনারীও সন্তুষ্ট হন। কিন্তু জেনারেল রবার্টস মনে করেন যে, শর্তগুলো আফগান জনগণের জন্যে মেনে নেয়া কঠিন হতে পারে। বিশেষ করে কুররাম উপত্যকা এবং অন্যান্য এলাকা হারান জনগণকে ব্যথিত করবে।

জুলাই ১৮৭৯ নবনিযুক্ত বৃটিশ দূত স্যার লুই ক্যাবাগনারী বৃটিশ মিশনসহ কাবুল পৌঁছেন। সবদিক শান্তই মনে হয়েছিল। ৩রা সেপ্টেম্বর ১৮৭৯ বালা হিসার দুর্গের সেনাবাহিনীর এক অংশ বিদ্রোহী হয়ে নব উন্মুক্ত বৃটিশ দূতাবাস আক্রমণ করে বসে। সমগ্র দূতাবাসে অগ্নিসংযোগ করা হয় (৩রা সেপ্টেম্বর, ১৮৭৯) এবং কয়েক ঘন্টার মধ্যেই দূতাবাসে ১২৩ ব্যক্তিকে অতি নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। প্রথম যুদ্ধে বৃটিশ বাহিনী জয়লাভ করলে তাদেরকে ১৬ হাজার সৈন্য হারাতে হয়েছিল। এবারের বিজয় তত ব্যয়বহুল না হলেও কম মর্মান্তিক হয়নি।

এ ঘটনার পর বৃটিশ বাহিনী বিভিন্ন দিক হতে অগ্রসর হয়ে কান্দাহার, জালালাবাদ, বালা হিসার দুর্গ, লুগার উপত্যকা ইত্যাদি সার্বিকভাবে দখল করে নিতে থাকে। জেনারেল রবার্টসকে কাবুল দখলের নির্দেশ দেয়া হয়।

আমীর ইয়াকুব ৪০ মাইল অগ্রসর হয়ে জেনারেল রবার্টস-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সমস্ত ঘটনার জন্যে দুঃখ প্রকাশ করেন। আমীরের বাহিনী নেতৃত্বহীন হয়েও বৃটিশ বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকে। চারাশিয়ার রণক্ষেত্রে বৃটিশ বাহিনী চূড়ান্ত বিজয় লাভ করে।

আমীর ইয়াকুব খান বৃটিশের অনুগ্রহপুষ্ট আমীর হয়ে কাবুলে থাকতে পারতেন। কিন্তু তিনি আফগান জনগণের রোষানলের ভয় করেন। সুজাউদ্দৌলার করুণ পরিণতির কথা চিন্তা করে আমীর ইয়াকুব স্বেচ্ছায় রাজত্ব এবং রাজ সিংহাসন ত্যাগ করেন এবং ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। জেনারেল রবার্ট কাবুলের শাসনভার গ্রহণ করেন।

শের আলীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মুহাম্মদ আফজালের সুযোগ্য পুত্র আমীর আবদুর রহমান (১৮৮০-১৯০১) কর্তৃক আমীর হিসেবে আফগানিস্তানের শাসনভার গ্রহণ করার পূর্ব পর্যন্ত বৃটিশ সরকার দেশ পরিচালনা করেন।

১৪

আফগান বাদশাহ আমানুল্লাহ খান

খ্যাতনামা আফগান আমীর দোস্ত মোহাম্মদ খানের (১৮৩৪-৬৩) দৌহিত্র ছিলেন সুবিখ্যাত আমীর আবদুর রহমান (১৮৮০-১৯০১)। তার দৌহিত্র আমীর আমানুল্লাহ খান (১৯১৯-২৯) স্বীয় রাজত্বের সপ্তম বছরে ১৯২৬ সনের জুন মাসে বাদশাহ উপাধি গ্রহণ করেন। তার পূর্বেকার আফগান রাজাদের উপাধি ছিল আমীর।

বাদশাহ আমানুল্লাহ খান তুর্কী নেতা কামাল আতাতুর্কের ন্যায় পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুসারী ছিলেন। তাদের উভয়ের একটি বিশ্বাস ছিল যে, পাশ্চাত্যের বেশ-ভূষা পরিধান এবং পাশ্চাত্য সংস্কৃতি গ্রহণ করলে পাশ্চাত্যের ন্যায় রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তি অর্জন এবং অর্থনৈতিক উন্নতি ও প্রগতি সম্ভব।

পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অন্ধ গোলামী শুধু কামাল আতাতুর্ক এবং আমানুল্লাহ খানই গ্রহণ করেননি, প্রায় সকল মুসলিম দেশেই পাশ্চাত্য শিক্ষিতগণ বিগত দু'শ বছর পাশ্চাত্য পোষাক এবং সংস্কৃতি অবলম্বন করে তাদের জাতে ভিড়ে ভদ্র হওয়ার চেষ্টা করছেন। কিন্তু তারা দেশের অর্থনৈতিক মুক্তি এনে পাশ্চাত্যের সমকক্ষ হতে পারেননি। রাজনৈতিক পরাধীনতা জবরদস্তিমূলক, কিন্তু সাংস্কৃতিক দাসত্ব স্বেচ্ছাকৃত। স্বেচ্ছায় বরণকৃত দাসত্ব থেকে কখনও মুক্তি লাভ হয় না।

স্বাধীনতাপ্রিয় বীর আফগান জনতা বাদশাহ উপাধি গ্রহণকারী আমীর আমানুল্লাহ প্রবর্তিত পাশ্চাত্য সংস্কৃতি গ্রহণ করেননি। বরং তাকে দীর্ঘ সংগ্রামের ফলশ্রুতিতে ১৯২৯ সনে দেশছাড়া করেন। শেষ পর্যায়ে এ সংগ্রামের নেতৃত্ব দেন পানি সরবরাহকারী (সাকো) এর পুত্র (বাচা) হাবিবুল্লাহ। তিনি নয় মাস

ক্ষমতায় থাকার পর বাদশাহ জহির শাহের পিতা নাদির শাহ্ কর্তৃক পরাজিত এবং নিহত হন (১৯২৯)।

হাবিবুল্লাহ খানের মৃত্যু

আফগান বাদশাহ আমানুল্লাহ খানের পিতা আমীর হাবিবুল্লাহ খান (১৯০১-১৯১৯) জীবনের শেষপ্রান্তে কাবুল থেকে উত্তর পূর্ব দিকের লাঘমান প্রদেশে গিয়েছিলেন শিকারে। কালাই গুস্ নামক স্থানে রাজকীয় শিকার-শিবির স্থাপিত হয়। ১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৯১৯ প্রত্যুষে তিনি নিজেই আততায়ীর গুলীতে শিকার হয়ে যান। হত্যার উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক। কিন্তু হত্যাকাণ্ডের রহস্য আবিষ্কৃত হয়নি। একটি ধারণা এই যে, তিনি ছিলেন ষড়যন্ত্রের শিকার। সন্দেহ করা হয়, এ ষড়যন্ত্রের সঙ্গে সরাসরি জড়িত না থাকলেও মৌন সম্মতি জ্ঞাপন করেছিলেন আমীরের তৃতীয় পুত্র প্রগতিশীল রাজপুত্র আমানুল্লাহ খান।

আমানুল্লাহ খানের সিংহাসন দখল

হাবিবুল্লাহর মৃত্যুর পর তার ভ্রাতা নসরুল্লাহ খান নিজেকে আমীর হিসেবে ঘোষণা দেন। তিনি আমীর হাবিবুল্লাহ গুলীবিদ্ধ হওয়ার দিন ভাই-এর নিকটেই ছিলেন। নসরুল্লাহ খান ছিলে ধর্মপ্রাণ ভালো মানুষ। হাবিবুল্লাহের জ্যেষ্ঠপুত্র ইনামুল্লাহ খান এবং দ্বিতীয় পুত্র আসাদুল্লাহ খান পিতৃব্যকে আমীর হিসেবে স্বীকার করে নেন। কিন্তু তার তৃতীয় পুত্র উচ্চাকাক্ষী আমানুল্লাহ খান পিতৃব্যকে রাজা হিসেবে মানতে অস্বীকার করেন।

আমানুল্লাহ তখন কাবুলে রাজকীয় সেনাবাহিনী এবং গোলাবারুদের দায়িত্বে ছিলেন। তিনি পিতৃব্য নসরুল্লাহ খানকে আমীর হিসেবে স্বীকার না করে নিজেকেই আমীর ঘোষণা করেন।

আমীর আমানুল্লাহ আফগান তরুণ যুবকদের চেতনা এবং স্বপ্নের ধারক ছিলেন। আফগান জাতীয়তাবোধ, প্রগতি, উন্নতি এবং জনগণের আশা আকাক্ষার প্রতীক হিসেবে তিনি প্রতিভাত হন। তিনি সেনাবাহিনী এবং কাবুলের যুব সমাজের সমর্থনপুষ্ট হয়ে পিতৃব্যকে বন্দী করেন এবং তাকে আমীর হাবিবুল্লাহর মৃত্যুর ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জড়িত করেন। আফগান জনগণ ধর্মপ্রাণ নসরুল্লাহর ভ্রাতৃ হত্যার সঙ্গে জড়িত থাকার অপবাদে বিশ্বাস স্থাপন করতে পারেননি বরং তারা আমানুল্লাহকেই পিতৃ হত্যার নায়ক বলে সন্দেহ করেন। নসরুল্লাহ কারাগরেই-১৯২১ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

তৃতীয় বৃটিশ আফগান যুদ্ধ (১৯১৯)

জনগণের দৃষ্টি নিজের থেকে অন্য বড় সমস্যার দিকে ঘুরাবার উদ্দেশ্যে স্বঘোষিত বাদশাহ আমানুল্লাহ খান কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। সিংহাসনে আরোহণের পর আমীর আমানুল্লাহ ক্ষমতা সুসংহত করার উদ্দেশ্যে পবিত্র ইসলাম ধর্মের সমর্থক এবং সংরক্ষক সাজেন এবং কাফিরদের বিরুদ্ধে জেহাদের ঘোষণা দেন। কিন্তু তিন / চার বছরের মধ্যে তার ইসলাম বিরোধী স্বরূপ ও চরিত্র জনগণের নিকট পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

বৃটিশের বিরুদ্ধে ধর্মীয় জেহাদ ঘোষণা করে আমানুলল্লাহ ধর্মপ্রাণ আফগান জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে চেষ্টা করেন। ভারত আক্রমণে তার সহযোগিতা করা হলে আফগান জনগণ সুলতান মাহমুদ এবং নাদির শাহের সময়ে যেভাবে প্রচুর লুণ্ঠিত সম্পদের মালিক হতে পেরেছিলেন তদ্রুপ সম্ভাবনার লোভ দেখান। তদুপরি প্রচার করা হয় যে, এ যুদ্ধের ফলে বৃটিশের আধিপত্যবাদ হতে মুক্ত হয়ে আফগান জনগণ সার্বভৌম স্বাধীনতার স্বাদ ভোগ করতে পারবে।

আমীর আমানুল্লাহ কর্তৃক শুরু করা বৃটিশ বিরোধী হঠকারী যুদ্ধ বেশীদিন চলেনি। সেনাপতি নাদির খান (পরবর্তীতে বাদশাহ) ওয়াজিরিস্তান এবং জোব অঞ্চলে কিছুটা কৃতিত্ব দেখালেও এক মাসের মধ্যেই বৃটিশের বিরুদ্ধে নবীন বাদশাহ আমানুল্লাহর বিজয়ের আশা ভঙ্গ হয় এবং তাকে পরাজয়ের গ্লানি বরণ করে নিয়ে সন্ধি ভিক্ষা করতে হয়।

বৃটিশ সরকারও প্রথম মহাযুদ্ধে এত বেশী ক্লান্ত ছিল যে, আমীর আমানুল্লাহ প্রস্তাবিত শান্তিচুক্তিতে সম্মত হয়ে যান। ফলে ৮ই আগষ্ট ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে রাওয়ালপিন্ডিতে এঙ্গলো-আফগান সন্ধি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সন্ধি চুক্তিতে উল্লেখ না থাকলেও বৃটিশ প্রতিনিধি আফগান প্রতিনিধিকে লিখিত পত্রে উল্লেখ করেন যে, আফগানিস্তান তার আভ্যন্তরীণ এবং পররাষ্ট্র বিষয়ে মুক্ত স্বাধীন নীতি অবলম্বন করতে পারবে। এতেও আমানুল্লাহ খানের কিছুটা মান রক্ষা হয়।

অবাস্তব শাসক

আমানুল্লাহ কয়েকটি উন্নয়ন প্রকল্প শুরু করেন। কিন্তু কোনটি সুবিধাজনক ভাবে সমাপ্ত করতে পারেননি। কাবুলের অদূরে একটি ব্যয়বহুল নতুন রাজধানী নির্মাণে তিনি হাত দেন। কিন্তু দেশ বা সরকারের আয় বাড়াতে পারেননি। এ পরিস্থিতিতে তার পাশ্চাত্যকরণের বিরূপ প্রতিক্রিয়া ট্রাইবেল এলাকাসমূহে দেখা দেয়। ১৯২৪ সনের বসন্তকালের মধ্যেই জেমিন্দাবওয়ারে ও খোস্ত পার্বত্য অঞ্চলের সরকার বিরোধী বিপ্লবের হাওয়া বইতে শুরু করে। মার্চ ১৯২৪ হতে

জানুয়ারী ১৯২৫ পর্যন্ত খোস্ত বিদ্রোহ চলে এবং বিপ্লবের নেতা লেমী মোল্লাকে কাবুলে ফাঁসী দেয়া হয়।

আমানউল্লাহ-এর পাশ্চাত্যকরণ নীতি

১৯২৩ সনে প্রশাসনকে পাশ্চাত্যকরণ করে আমানুল্লাহ এক আদেশ জারি করেন। এতে সরকারী কর্মচারীদের পাশ্চাত্য পোশাক, সেনা ও পুলিশ বাহিনীর হাফ প্যান্ট পরারও বিধান ছিল। প্রশাসনে মেয়েদের সম অংশীদারীত্বের নীতিও এ সংস্কারে স্বীকৃত হয়। ১৯২৪ সনে তিনি নারীদের পাশ্চাত্য ঢঙে পাশ্চাত্য শিক্ষার বিধান জারি করেন।

১৯২৪ সনের জুলাই মাসে খোস্ত বিদ্রোহের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি গোত্র প্রধানদের লৌই ঝিরগ্মা বা গ্রান্ড এসেম্বলী আহবান করেন। এতে তার নারী মুক্তি অধিকার সংক্রান্ত বিধানাবলী তীব্র সমালোচিত হয়। তার কতিপয় বিধান প্রত্যাহার করতে তিনি বাধ্য হন। কিন্তু তার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ স্তিমিত হয়নি।

আফগান-রুশ সম্পর্ক

ক্ষমতা দখলের পর আমানুল্লাহ ইসলামী ঐক্যের কথা বলেছিলেন। ১৯২২ সনে তুরস্কের আনোয়ার পাশা বলশেভিকদের বিরুদ্ধে তুর্কী জাতিসমূহের যে যুদ্ধ শুরু করেছিলেন আমীর আমানুল্লাহ তা সমর্থন করেন। সীমান্তের বাইরে তুরানী বা তুর্কী জাতিসমূহের ঐক্যের প্রতি সংহতি ঘোষণা করে তিনি রাজ্যের উত্তর সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ করেন। কিন্তু সোভিয়েট ধমকে সীমান্ত এলাকা হতে সৈন্য প্রত্যাহার করেন।

সোভিয়েট রাশিয়া আফগানিস্তানের বৈদেশিক বিষয়ে নিরপেক্ষতার ঘোষণা দাবী করেন। আমীর আমানুল্লাহ খান তার রুশ বিরোধী বৈদেশিক নীতি সম্বন্ধে গুজবের প্রতিবাদ করে ঘোষণা দেন। এর মধ্যে সোভিয়েট রাশিয়া সমগ্র বুখারা সম্পূর্ণ সোভিয়েট শাসনে নিয়ে আসেন। বুখারার আমীর আফগানিস্তানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু নিজ জাতীয় স্বাধীনতার জন্যে কোন সাহায্য আমানুল্লাহ হতে পাননি।

আমানুল্লাহর ইউরোপ সফর

ইটালিয়ান সরকারের আমন্ত্রণে ১৯২৭ সনের ডিসেম্বর মাসে বাদশাহ আমানুল্লাহ ভারত হয়ে বিশ্ব ভ্রমণে বের হন এবং একাধারে ৭ মাস সফরের পর ১৯২৮ সনের জুলাই মাসে তিনি পারস্য হয়ে দেশে ফিরে আসেন। এই সফর তার তোষামোদকারীদের মতে ছিল অত্যন্ত সফল। কিন্তু তার রাজত্বের জন্যে

ছিল সবচেয়ে বিপর্যয়মূলক ঘটনা। সাত মাসব্যাপী সফরে তিনি ভারত, মিশর, বৃটেন, ফ্রান্স, ইটালী, বেলজিয়াম, সুইজারল্যান্ড, জার্মানী, রাশিয়া, পোল্যান্ড, তুরস্ক, ইরান ইত্যাদি ভ্রমণ করেন।

ইটালীর রাজা বাদশাহ আমানুল্লাহকে বিশেষ খ্যাতিতে ভূষিত করেন যাতে তাকে রাজার কাজিন বা ভাতৃপ্রতিম মর্যাদা দেয়া হয়। ডোভার ফেরীঘাটে প্রিন্স অব ওয়েলস (বৃটিশ যুবরাজ) তাকে অভ্যর্থনা জানান। লন্ডনের ভিক্টোরিয়া রেল স্টেশনে বৃটেনের রাজা-রাণী আমানুল্লাহকে অভ্যর্থনা করেন এবং বার্কিংহাম প্যালেসে সম্বর্ধনা জানান। আঙ্কারায় কামাল আতাতুর্ক তার সঙ্গে কয়েক দফা আলোচনা করেন।

আফগান রাজার ইউরোপে বিশেষ সম্বর্ধনার খবরে আফগান জনগণ প্রীত এবং উল্লসিত হয়। কিন্তু রাজার বিদেশে থাকাকালেই এ সফর জনগণের বিষাদ এবং বিক্ষোভের কারণ হয়ে ওঠে।

ভারতে প্রবেশ করে ইউরোপীয়ান আচার-আচরণ দেখে রাজকীয় সফর পার্টির সদস্যবৃন্দ নতুন করে ইউরোপীয়ান পোষাক তৈরি করে নেন। তখন বলা হয় যে, বিদেশ সফর শেষে দেশে ফিরার আগেই তারা পোষাকগুলো নষ্ট করে ফেলবেন। সফরের সাথে সাথে তাদের পোষাকের ফ্যাশন এবং স্টাইলের পরিবর্তন হয়। পোষাকের পরিবর্তন হওয়ার সাথে সাথে রাজকীয় সফরসঙ্গীদের মানসিকতায় পরিবর্তন হতে থাকে। আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদে আমানুল্লাহ সাহেবি হ্যাট পরে প্রবেশ করেন এবং নামাজ আদায় করতে গিয়ে দর্শকদের হাস্যরসের বস্তুতে পরিণত হন।

বাদশাহ আমানুল্লাহ এবং তার সফরসঙ্গীদের ভাবভঙ্গি সফরের শেষ প্রান্তে পারস্যের শাহ এবং তার সভাসদদেরও অবজ্ঞার কারণ হয়। পাশ্চাত্যকৃষ্টি সভ্যতার মতো অন্ধ অনুকরণ পারস্য রাজ এবং সভাসদদের বিরুক্তি উৎপাদন করে।

নারী বেহায়াপনা নীতি

ইউরোপে সফরকালে রাণী সুরাইয়া পাশ্চাত্য বেশে বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদিতে উপস্থিতি এবং তার নিশাবেশ পরিধানের কাহিনী বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশেষ করে কান্দাহারে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। রাজা-রাণীর বেশভূষা এবং পাশ্চাত্য আচরণে জুন মাসে কাবুল-কান্দাহারে বিক্ষোভ সৃষ্টি হয়নি বটে, কিন্তু একটি থমথমে ভাব পরিলক্ষিত হয়। কেউ কেউ এটাকে ঝড়ের পূর্বাভাষ বলেও ব্যাখ্যা করেন।

বাদশাহ আমানুল্লাহ-এর পূর্ববর্তী আফগান আমীর-পত্নিগণ এবং রাজ পরিবারের মহিলারা বোরকা পরিধান করতেন। আধুনিক বাদশাহ আমানুল্লাহ খান তার দেশবাসীকে পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে উদ্বুদ্ধ করার মানসে একটি রাজকীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করেন। এতে গণ্যমান্য ব্যক্তি ও উপজাতীয় সরদারকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। এ অনুষ্ঠানের একটি আইটেম ছিল আমানুল্লাহর সুন্দরী স্ত্রী রাণী সুরাইয়া (বিবাহ পূর্ব জ্ঞাতি ফুফু) কর্তৃক কালো বোরকা শরীর থেকে টেনে টেনে ছিঁড়ে টুকরা টুকরা করে ফেলা।

এ ধরনের মহড়ার সময় ঘোষকদের তেজদীপ্ত কণ্ঠে অনুপ্রাণিত হয়ে রাজকীয় পাশ্চাত্যভক্তরা হাতে তালি দিয়ে রাণীকে সম্বর্ধনা জানান। বুদ্ধিজীবীরা শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেন। দেশব্যাপী যুবক তরুণীদের মধ্যে বোরখা ছিঁড়ার মহড়া শুরু করে। কিন্তু বীর আফগান জনগণ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন।

পাশ্চাত্য সংস্কৃতির বিরুদ্ধে জেহাদ

বুদ্ধিজীবী এবং পাশ্চাত্য শিক্ষিতদের বেহাল অবস্থা দেখে নকশবন্দী তরীকার সর্বজন শ্রদ্ধেয় পীর হযরত উমর মোজাদ্দেদী শোর বাজার রাজা আমানুল্লাহর বিরুদ্ধে জেহাদের ফতোয়া দেন। দেশের আলেম সমাজ বাদশাহ আমানুল্লাহ-এর বিরুদ্ধে জেহাদের ফতোয়া সমর্থন করেন। তাদের অনেককে গ্রেফতার করা হয়। কিন্তু ধর্মপ্রাণ আফগান জনগণের জেহাদী চেতনাকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়নি।

আমীর আমানুল্লাহ খানের বিরুদ্ধে জনগণের বিদ্রোহ এবং এর ফলশ্রুতিতে তার সিংহাসন এবং রাজ্যত্যাগ বিভিন্ন মুসলিম দেশের পাশ্চাত্য সংস্কৃতি পূজারী কামাল ভক্তদের আগ্রহ-উদ্দমকে অনেকটুকু দমিয়ে দেয়। তারা ব্যক্তিগতভাবে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি গ্রহণের সুচতুর নীতি অবলম্বন করেন এবং এ নিয়ে রাষ্ট্রীয় বা কোন প্রকাশ্য জাতীয় আন্দোলন করতে সাহস করেননি।

পাশ্চাত্য সংস্কৃতি এবং কৃষ্টি নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে গিয়ে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে (১৯২৯) রাজ্যচ্যুত হন আফগান বাদশাহ আমানুল্যাহ খান. দ্বিতীয়ার্ধে ঠিক ৫০ বছর পর ইরানের রেজা শাহ পাহলভী (১৯৭৯)। ইরানের শাহ সরকারী অনুষ্ঠানে নারীদের মদ্যপান এবং সরকারী উদ্যোগে নিউ সিটি নামে পতিতালয় স্থাপন করে আলেমদের বিরাগভাজন হন এবং ইমাম আয়াতুল্লাহ খোমেনীর নেতৃত্বে দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলনের ফলে দেশ ত্যাগ করেন।

১৫

রাজতন্ত্র হতে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ

(১৮৬৩-১৯৭৮ খৃঃ)

আহমদ শাহ আবদালী দুররানী বংশ হতে আফগানিস্তানের রাজনৈতিক ক্ষমতা বারাকজাঁই/মুহাম্মদ জাঁই বংশের পায়েন্দ খান পুত্র আমীর দোস্ত মোহাম্মদের হাতে এসে যায়। আমীর দোস্ত মোহাম্মদ নিরক্ষর হলেও অত্যন্ত বিচক্ষণ এবং বাস্তব বুদ্ধি সম্পন্ন নৃপতি ছিলেন। সুদীর্ঘ ত্রিশ বছরের শাসনকালে তিনি আফগানিস্তানের বিচ্ছিন্নতাবাদী গোত্র এবং আঞ্চলিক শক্তিসমূহের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি স্থাপন করেন। বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বৃটিশের আধিপত্য মেনে নিয়ে তিনি বর্তমান আফগানিস্তানের ভিত্তি মজবুত করেন। এর সাথে সাথে আফগানিস্তানের সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ন করেন।

দ্বিতীয় ইঙ্গ — আফগান যুদ্ধ (১৮৭৮-৮০ খৃঃ)

আমীর দোস্ত মোহাম্মদের মৃত্যুর পর তার পঞ্চম পুত্র শের আলী খান সিংহাসনে বসেন (১৮৬৩-১৮৭৯ খৃঃ)। তার সময় ১৮৭৮-৮০ খৃষ্টাব্দে শুরু হয় দ্বিতীয় বৃটিশ-আফগান যুদ্ধ। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ সেনাপতি জেনারেল রবার্ট বিজয়ী হিসেবে কাবুলে প্রবেশ করেন।

শের আলীর পুত্র ইয়াকুব খান ১৮৭৯ খৃঃ পিতার মৃত্যুর পর আমীর হিসাবে কাবুলের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ৬ মাসের মধ্যেই ৩রা সেপ্টেম্বর ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ রাষ্ট্রদূত এবং তাঁর সঙ্গীকে জনগণ হত্যা করে। দ্বিতীয় ইঙ্গ আফগান যুদ্ধে আফগানিস্তানের পরাজয়ের পরিণতিতে ইয়াকুব খান সিংহাসন ত্যাগ করেন। দোস্ত মোহাম্মদের পৌত্র আবদুর রহমান আমীর হিসাবে বৃটিশের স্বীকৃতি লাভ করেন।

দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধের ফলে (১৮৭৮-৮০ খৃঃ) ব্রিটিশ আফগানিস্তানের বৈদেশিক সম্পর্ক নির্ধারণের অধিকার লাভ করে। রাশিয়া এবং ব্রিটিশ নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে আফগানিস্তানের উত্তরসীমা নির্ধারণ করে দেয়। আমুদরিয়ার উত্তরাংশ রাশিয়ার ভাগে পড়ে। স্বীকৃত হয় যে, আমুদরিয়ার দক্ষিণে

রাশিয়া অগ্রসর হবে না। এই সমঝোতার ভিত্তিতে স্যার মর্টিমার ডুরান্ড (Sir Mortimer Durand)-এর তত্ত্বাবধানে (১৮৯৩ খৃঃ) ভারত-আফগান সীমান্তরেখা ডুরান্ড লাইন চিহ্নিত হয়।

আমীর আবদুর রহমান (১৮৮০-১৯০১ খৃঃ)

আহমদ শাহ আবদালীর পরে শ্রেষ্ঠ আফগান আমীর ছিলেন আমীর আবদুর রহমান (১৮৮০-১৯০১)। আমীর আবদুর রহমানই বিচ্ছিন্নতাবাদী গোত্রগুলোকে দমন করে কাবুলে মজবুত কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করেছিলেন।

আমীর আবদুর রহমানের পর তৎপুত্র হাবিবুল্লাহ আফগান সিংহাসনে আরোহণ করেন (১৯০১-১৯১৯)। তিনি আততায়ীর হাতে নিহত হওয়ার পর তার তৃতীয় পুত্র আমীর আমানুল্লাহ (১৯১৯-১৯২৯ কৃঃ) আফগানিস্তানের রাজসিংহাসন দখল করেন।

আমীর আমানুল্লাহ খান

আমীর আমানুল্লাহ আফগানিস্তানের অভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক সম্পর্কে স্বাধীন নীতি অবলম্বনের ঘোষণা দেন। এর প্রতিক্রিয়ায় ১৯১৯ খৃঃ তৃতীয় বৃটিশ আফগান যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধ প্রথম মহাযুদ্ধ পরবর্তী অব্যবস্থার কারণে হয়ত অনেকটা অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়।

কামাল আতাতুর্কের অনুসরণে আফগানিস্তানে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি প্রবর্তন করার চেষ্টা করে আমীর আমানুল্লাহ রাজ্যচ্যুত হন। হযরত শের বাজার নামে খ্যাত নকশবন্দি তরীকার পীর হযরত উমর মোজাদ্দেদী ফতোয়ার মাধ্যমে আমানুল্লাহর শাসন অবৈধ ঘোষণা করেন। তার ফতোয়ার পর আমীর আমানুল্লাহর বিরুদ্ধে দেশব্যাপী বিক্ষোভ শুরু হয়।

নাদির শাহ (১৯২৯-৩৩ খৃঃ)

ইসলামের নাম ভাঙ্গিয়ে এক তাজিক দস্যুসর্দার বাচ্চা-ইসাকাও (পানি সরবরাহ কারীর বাচ্চা) হাবিবুল্লাহ গাজী নামধারণ করে ৯ মাস (১৩-০১-১৯২৯ হতে ১৩-১০-১৯২৯ খৃঃ) কাবুলে রাজত্ব করেন। বাচ্চা-ইসাকাও-এর আসল স্বরূপ প্রকাশিত হয়ে পড়লে তাঁকে অপসারণ করে সরদার পায়েন্দা খানের ষষ্ঠ অধঃস্তন বংশধর এবং আমানুল্লাহ খানের জ্ঞাতিভ্রাতা নাদির শাহ (১৯২৯-১৯৩৩ খৃঃ) সিংহাসনে আরোহণ করেন। নাদির শাহ গোলাম নবী নামক রাজপরিবারের এক সদস্যের কিশোর পুত্রের গুলীতে নিহত হন (১৯৩৩ খৃঃ)। নাদির শাহের আদেশে এক বছর পূর্বে গোলাম নবী নিহত হয়েছিলেন।

জহির শাহ (১৯৩৩-৭৩ খৃঃ)

নাদির শাহের পুত্র জহির শাহ ১৯৩৩ হতে ১৯৭৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ৪০ বছর আফগানিস্তানের বাদশাহ ছিলেন। ভারত বিভাগের সময় আফগানিস্তান ব্রিটিশের নিকট উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ দাবী করেছিল। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দের পূর্বে এ এলাকা আফগানিস্তানের অংশ ছিল। ঐ বছর শিখগণ এ এলাকা আফগান সরকার হতে কবজা করেছেন। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে শিখদের নিকট হতে এ এলাকা বৃটিশ সরকার দখল করেন।

১৯৪৭ সনে একমাত্র আফগানিস্তান পাকিস্তানের জাতিসংঘে অন্তর্ভুক্তির বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছিল। ১৯৪৯ সনের ১লা সেপ্টেম্বর আফগান সরকার একটি ট্রাইবেল জিরগা আহবান করে পুশতুনিস্তান নামে একটি প্রদেশ গঠনের উদ্দেশ্যে পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্তি পুশতুন ভাষাভাষী এলাকা বলে দাবী করেন।

১৯৭২ খৃষ্টাব্দে খরা এবং দুর্ভিক্ষে আফগানিস্তানে এক লক্ষ লোক এবং দেশের অর্ধেক গো-সম্পদ মারা যায়। এটা জহির শাহের বিরুদ্ধে বিপ্লব সফল হওয়ার অন্যতম কারণ।

দাউদ খান (১৯৭৩-৭৮ খৃঃ)

১৭ই জুলাই ১৯৭৩ তারিখে জহির শাহের ভগ্নিপতি এবং সম্পর্কীয় ভাই ৬৩ বছর বয়স্ক জেনারেল সর্দার দাউদ খান একটি সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে বাদশাহ জহির শাহকে অপসারণ করে আফগানিস্তানের শাসন ক্ষমতা দখল করেন।

সরদার দাউদ মোল্লাদের বিপক্ষে ছিলেন। ক্ষমতা দখল করার পরেই সরদার দাউদ মুজ্জাদ্দেদী আফগানদেরকে ধমকান এবং পাহারায় রাখেন। সিবগাতুল্লা মুজ্জাদ্দেদী তখন দেশের বাইরে ছিলেন। সর্দার দাউদ খান ইতিপূর্বে দশ বছর (১৯৫৩-৬৩) আফগানিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। সরদাব দাউদ খান রাজতন্ত্র বিলোপ করে আফগানিস্তানকে প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করেন। দাউদ খান কমিউনিস্টদের প্রতি নমনীয় এবং সহানুভূতিশীল ছিলেন। তারই প্রশ্রয়ে কমিউনিস্টরা বেশ ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে।

১৯৬৫ সনের জানুয়ারীতে পিপলস ডেমোক্রেটিক পার্টি অব আফগানিস্তান নামে আফগান কম্যুনিস্ট পার্টি গঠিত হয়। ১৯৬৬ সনে পার্টির মুখপত্র খালক (জনতা) বন্ধ করে দেয়া হয়। তখন বারবাক কারমালের অনুসারীরা পরচম (পতাকা) পত্রিকা প্রকাশ করে। এর পেছনে থাকেন বারবাক কারমাল। এই পত্রিকা দু'টির নামেই পিডিপি-এর দু'টি উপদলের নাম হয়।

আধিকাংশ শিক্ষক এবং বুদ্ধিজীবী ছিলেন পরচম গ্রুপের সমর্থক। সোভিয়েট অর্থানুকুল্য এ গ্রুপই বেশী পেতেন। ১৯৭৮ সনের এপ্রিল মাসে গঠিত মন্ত্রীসভার ১৮ জন সদস্যের মধ্যে ৮ জন ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং কর্মকর্তা। আরো কয়েকজন ছিলেন ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার। কৃষক শ্রমিকের সমর্থন বেশী ছিল খালক গ্রুপের প্রতি। পরচামপন্থীদের রয়েল কম্যুনিস্ট পার্টি বলে কৃষক শ্রমিক নেতারা ঠাট্টা করতেন।

কাবুল বিশ্ববিদ্যালয় ছিল বামপন্থী ছাত্রদের প্রভাবাধীন। ১৯৭৩ খৃঃ সর্বপ্রথম ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ইউনিয়ন বা সংসদ গঠন করে।

মিনহাজুদ্দিন গাহিয সম্পাদিত গাহিয পত্রিকা ১৯৬৯ খৃঃ থেকে ১৯৭২ পর্যন্ত সোভিয়েত রাশিয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিরোধী ভূমিকা পালন করে। ৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭২ ইং কে,জি,বি, কর্তৃক মিনহাজুদ্দিন এবং তার ভাতিজা ৬ জন আততায়ীর হাতে নিহত হন। কাবুলের সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত সার্জি কিকটেভ(Sergei Kiktev) এ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করেছিলেন বলে জনগণ বিশ্বাস করে।

২০শে সেপ্টেম্বর ১৯৭৩ খৃষ্টাব্দে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মাউওয়ান্ডওয়াল (Maiwandwal) এবং ৪৬ জন জেনারেল, কর্নেল ও এম.পি.সহ ষড়যন্ত্রের অভিযোগের আটক হন। ২০শে অক্টোবর ১৯৭৩ তিনি কারাগারে আত্মহত্যা করেন বলে বলা হয়েছে। তবে এটি হত্যা বলে সন্দেহ করা হয়।

১৯৭৫ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে ১৯টি বেসরকারী সংবাদপত্র বন্ধ করে দেয়া হয়।

নূর মোহাম্মদ তারাকী (১৯৭৮-৭৯ খৃঃ)

১৯৭৮ খৃষ্টাব্দের ২৬শে এপ্রিল কর্নেল আবদুল কাদির সরদার দাউদ খানকে অপসারণ করে ক্ষমতা দখল করেন। মাত্র চারদিন পর ৩০শে এপ্রিল, ১৯৭৮ খৃঃ, জেনারেল নূর মোহাম্মদ তারাকী কর্নেল আবদুল কাদিরকে অপসারণ করে আফগানিস্তানের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করেন। শুরুতে কর্নেল আবদুল কাদির সম্মুখে থাকলেও এ বিপ্লবের পেছনে ছিলেন নূর মোহাম্মদ তারাকী। প্রেসিডেন্ট ভবনে ট্যাংক চালিয়ে হত্যা কর হয় জেনারেল দাউদ খান পরিবারের সকল সদস্যকে। এর সাথে শেষ হয় বারাকজাঁই বংশের শাসন।

১৬

মধ্য এশিয়ায় রুশ আধিপত্য

কিরঘিজিস্তান এবং কাজাকস্তান দখল

১৮৪২ সনের পূর্বে রাশিয়ান জারের সাম্রাজ্যের দক্ষিণ সীমা ছিল আরল সাগরের উত্তরে এবং আফগান সীমান্তের অনেক দূরে। ১৭৩৪ খৃষ্টাব্দ এবং ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ক্রমশঃ রাশিয়া কিরঘিজিস্তানের বিশাল তৃণভূমি দখল করে নেয়।

ত্রিশ বছরের মধ্যে রাশিয়া ক্রমশঃ আমুদরিয়া নদী এবং আফগান সীমান্তে এসে যায়। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে রাশিয়া দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয়ে বৈকাল হ্রদ, ইশিক কুল অতিক্রম করে কিরঘিজিস্তানের বিস্তৃত এলাকা দখল করে শির দরিয়া নদীর ডান উত্তর তীরে পৌঁছে যায়।

পারস্য, আফগানিস্তান এমনকি ভারতের দিকেও রাশিয়ার লোলুপ দৃষ্টি ছিল। ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে রাশিয়ার জার আলেকজান্ডার এবং ফ্রান্সের নেপোলিয়ান বোনাপোর্টের মধ্যে টিলসিট শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হয়। এ চুক্তির লক্ষ্য ছিল ফ্রান্স এবং রাশিয়া যৌথভাবে পারস্য এবং আফগানিস্তান হয়ে ভারত আক্রমণ করবে।

রাশিয়ান রাজকীয় চ্যান্সেলার রাজপুত্র গোরচাকভ বিভিন্ন দিকে রাশিয়ার অগ্রযাত্রার সুন্দর এবং যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা পত্র বা মেমোরান্ডাম প্রনয়ণ করে বিভিন্ন দেশে বিতরণ করেন। যে যে দেশে রাশিয়ান দূতাবাস আছে, সে সকল দেশে রাশিয়ান বৈদেশিক নীতি সংক্রান্ত মেমোরান্ডাম বা ব্যাখ্যা পত্র বিতরিত হয় (৩১-০৭-১৮৮০ খৃঃ)। যে কোন পাঠক এর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য বুঝতে পারবেন।

জনগনের উন্নতি, প্রগতি এবং সভ্যতার বিস্তৃতির স্বার্থেই বিভিন্ন দিকে রাশিয়ান অবস্থিতি প্রয়োজন, এরূপ যুক্তি প্রদর্শন করা হয়। মধ্য এশিয়ায় কোন প্রাকৃতিক সীমারেখা না থাকায় রাশিয়ান সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি আরও সহজ হয়। রাশিয়ান বিজয় অভিযানে অধিকৃত অঞ্চলের জনগণের মানসিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিরূপ প্রতিক্রিয়া কতটুকু মর্মান্তিক হয়েছিল তা পর্যবেক্ষণ করা এবং অনুধাবন করার মতো মানস জার রাজবংশ বা ক্ষমতাসীনদের মধ্যে ছিল না। এ এলাকায় কোন মুসলিম শক্তি না থাকার ফলে রাশিয়াকে বাধা দেয়ার মতো কেউ ছিল না।

ইলি উপত্যকা

১৮৫৪ সনে ইলি উপত্যকায় রাশিয়ান অভিযান পরিচালিত হয়। শির দরিয়া এবং ইলি উপত্যকার সমগ্র এলাকায় অশান্ত প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। এ অঞ্চলের অধিবাসিরা ছিল স্বাধীনতাপ্রিয়।

ক্রিমিয়ান যুদ্ধের কারণে রাশিয়া অন্য এলাকায় স্বল্পকালের জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই শির দরিয়া হতে চিমকেন্ত পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চলে রাশিয়ান আধিপত্য স্থাপিত হয়। রাশিয়ান অগ্রযাত্রা আরও পূর্বদিকে অব্যাহত থাকে এবং ইশিক কুল হ্রদের দক্ষিণাঞ্চলের সমগ্র এলাকা রাশিয়ার কর্তৃত্বাধীনে চলে আসে। রাশিয়ান বাহিনী টিয়েনশান পর্বত মালার দিকে অগ্রসর হতে থাকে।

তুর্কমেনিস্তান দখল — খিভা (খাওয়াবিজম)

খিভা শহরের আদি নাম হলো খাওয়ারিজম। খাওয়ারিজম এককালে মধ্য এশিয়ার রাজধানী ছিল। সুলতান মাহমুদের (মৃঃ ১০৩০ খৃঃ) বংশধরদের সমসাময়িক আর একটি রাজবংশ ইরান খোরাসান, তুর্কিস্থানে আধিপত্য বিস্তার করে। এরা হলেন সেলজুক বংশীয় সালতানাত। গজনভী বংশ এবং সেলজুকী বংশের পর এ অঞ্চলের আধিপত্য লাভ করে ঘোরী বংশের সুলতানগণ।

সুলতান মাহমুদ কিরঘিজিস্তানে বিজয় অভিযানকালে একটি তুর্কমেনী স্কাইদিয়ান গোত্রকে খোরাসানে আনয়ণ করেন। তাদের নেতা সেলজুকের নামানুসারেই সেলজুক বংশের নাম হয়। সর্দার সেলজুকের পৌত্র তুগরিল বেগ (মৃত্যু ১০৬৩ খৃঃ), পুত্রহীন তুগরিলের ভ্রাতুষ্পুত্র আল্‌ফ আরসালান (১০৬৩–১০৭৩ খৃঃ) এর তৎপুত্র মালিক শাহ (১০৭৩–১০৯২ খৃঃ) অত্যন্ত খাতিমান সেলজুক রাজা ছিলেন।

মালিক শাহের পর তার জ্যেষ্ঠপুত্র বেক ইয়ারুক (১০৯২-১১০৪ খৃঃ) এবং দ্বিতীয় পুত্র (১১০৪-১১১৮ খৃঃ)-এর মধ্যে পিতৃরাজ্য নিয়ে বিরোধের ফলে সেলজুকি বংশ দুর্বল হয়ে পড়ে। সুপ্রসিদ্ধ মন্ত্রী খাজা হাসান নিজামুল মুলক্ মালিক শাহের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন।

সেলজুক সুলতান মালিক শাহ তার রাজকীয় গৃহস্থালীর দায়িত্বে নিযুক্ত মন্ত্রী নুশতাগিনকে খাওয়ারিজম-এর জায়গীর প্রদান করেন। নুস্তাগিনের পুত্র কতুবুদ্দিন মোহাম্মদ সেলজুকি প্রাদেশিক গভর্নর সুলতান সানজর হতে খাওয়ারিজম শাহ উপাধি লাভ করেন।

সর্বশেষ সেলজুক সুলতান তুগ্রিলের মৃত্যুর পর বাগদাদের খলিফা খাওয়ারিজম শাহকে তার এলাকায় সার্বভৌমত্ব দান করেন। খাওয়ারিজম শাহী বংশের বিখ্যাত সুলতান ছিলেন আলাউদ্দিন মোহাম্মদ শাহ্। তার সময় খাওয়ারিজম বা খিভা উন্নতির শিখরে আরোহণ করে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতায় খাওয়ারিজম শাহ ছিলেন অনন্য। খাওয়ারিজম শাহের রাজধানী ছিল গুরগানজে।

খাওয়ারিজম শাহ আলাউদ্দিন মোহাম্মদ শাহের সময়েই চেঙ্গিশ খানের নেতৃত্বে মঙ্গোল অভিযান শুরু হয় (১২১৮ খৃঃ)। খাওয়ারিজম সুলতান আলাউদ্দিন মোহাম্মদ শাহ (মৃত্যু-১২২০ খৃঃ) এবং তৎপুত্র জালালুদ্দিন শাহ বীর বিক্রমে মঙ্গোল অভিযান প্রতিহত করার চেষ্টা করেন।

বুখারা (১২১৯ খৃঃ) সমরখান্দ (১২২০ খৃঃ) হেরাত, হামাদান বলখ (১২২১ খৃঃ) প্রভৃতি তৎকালীন শিল্প-কৃষ্টি এবং সভ্যতার কেন্দ্রসমূহ জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে নষ্ট করা হয়। জালালুদ্দিন শাহকে অনুসরণ করে চেঙ্গিশ খান সিন্ধু নদীর পশ্চিমতীর পর্যন্ত এসেছিলেন। সিন্ধুতীরের যুদ্ধের চেঙ্গিশ খানের বাহিনী জালালুদ্দিনের অতি ক্ষুদ্র পলাতক বাহিনীকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলে। জালালুদ্দিনের দু'টি অশ্ব আঘাতের পর আঘাতে নিহত হয়। তৃতীয় অশ্বে আরোহিত এবং সংগ্রামরত অবস্থায় জালালুদ্দিন ত্রিশ ফুট উঁচু স্থান হতে সিন্ধু নদীতে অশ্বসহ ঝাঁপিয়ে পড়েন। খরস্রোতা সিন্ধু নদী অতিক্রম করে তিনি নদীর পূর্বতীরে উঠেন (২৪শে নভেম্বর ১২২১ খৃঃ)।

আরব বিজেতা মুহাম্মদের শাসনকালে (১৬০৩-২৩ খৃঃ) ক্ষুদ্র শহর খিভা রাজধানীর মর্যাদা লাভ করে। নাদির শাহ ১৭৪০ খৃঃ খিভা জয় করেন। পার্শ্ববর্তী রাজ্যে তুর্কমেনগণ বহু বছর পর্যন্ত খিভার বিরুদ্ধে অভিযান চালায়। ১৭৭০ খৃঃ ইনাক মুহাম্মদ আমীন তুর্কমেনীদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হন।

রাশিয়ান সম্রাট পিটার দি গ্রেট চেষ্টা করেও খিভা (খিওয়াহ) স্বীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত করতে পারেন নি। ১৮৩৯-৪০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত খিভার বিরুদ্ধে রুশ অভিযান ব্যর্থ হয়। তখন খিভার শাসনকর্তা ছিলেন ঈলাক বংশীয় রাহিম মুহাম্মদ (১৮০৬-২৫ খৃঃ) পুত্র আল্লাহ কুলী খান (১৮২৫-৪২ খৃঃ)।

পরবর্তীতে খিভায় উজবেকরাজ খান মুহাম্মদ আমীন (১৮৪৬-৫৫ খৃঃ) তুর্কমেনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত থাকায় মারা যান। তার উত্তরাধিকারী আবদুল্লাহ খানও একই অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন।

খিভা দখল

সমরখন্দ দখল করার পর রাশিয়ান জেনারেল কাউফম্যান খিভা খান রাজ্যের দিকে হস্ত সম্প্রসারণ করেন। খিভার খান সাইয়িদ মুহাম্মদ রহিম খানের সময় (১৮৬৪-১৯০১ খৃঃ) রুশগণ খিভা দখল করে নেয়। তিনি এবং তার পুত্র ইসফিনদিয়ার খান (১৯১০-১৯১৮ খৃঃ) তুর্কমেনদের বিরুদ্ধে রাশিয়ার সাহায্য কামনা করেন। রাশিয়া সাহায্য করতে এসে রাজ্যটিই দখল করে নেয়। সংক্ষিপ্ত যুদ্ধ এবং সংঘর্ষের পর খিভা রাজ্যের অধিপতি খান ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে আত্মসর্মপণ করে রাশিয়ান সাম্রাজ্যের অধিনস্থ রাজ্যে পরিণত হয়। খিভা পদানত করার পর রাশিয়া ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে খোকান্দ দখলে উদগ্রীব হয়। ১৮৭৭ সনে খোকান্দ রাশিয়ার পদানত হয়।

খোকান্দ উজবেকিস্তান দখল

রাশিয়ার দখলের পূর্বে বর্তমানে উজবেকিস্তানের রাজধানী ছিল খোকান্দ নগরীতে। খোকান্দের রাজা নারবুটার-এর পুত্র আমিন খানকে গুপ্তহত্যা করে তার ভ্রাতা উমর সিংহাসনে আরোহণ করেন। সুলতান উমরের পুত্র মাদালী খানের কুশাসনের কারণে এবং জনগণের আহ্বানে বুখারার আমীর নসরুল্লাহ খোকান্দ আক্রমণ করে খান মাদালীকে হত্যা করেন। পরে একই বছর উমর খানের মামাতো ভাই শের আলী খোকান্দের রাজা হন (১৮৪৫)। শের আলীর পুত্র খুদায়য়া ও মাল্লা এবং অন্যান্য স্বল্পস্থায়ী রাজাদের মধ্যে নিয়ত সংঘাতের ফলে রাজবংশ দুর্বল হয়ে পড়ে। এ সুযোগে রাশিয়া উজবেকিস্তান আক্রমণ করে।

বুখারা

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে রাশিয়ান সেনাপতি রোমানভস্কি উজবেকিস্তানের রাজধানী খোকান্দ এবং বুখারা আক্রমণ করেন। খোকান্দ-এর খান উপাধিকারী রাজা এবং বুখরার আমীর রাশিয়ার করদ মিত্র রাজ্যে পরিণত হয়।

এরপরও রাজ্যে গোলযোগ চলতে থাকে। খোকন্দের রাজা খুদায়্যার বিরুদ্ধে তার আত্মীয় পুল্লাদ খান বিদ্রোহ করে। বিশৃঙ্খলার সুযোগে ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে রাশিয়ান সেনাপতি এবং গভর্নর কাউফম্যান খোকান্দ, বুখারা ইত্যাদি দখল করে নেন। আত্মকলহ এবং শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকারের অভাবের মধ্য এশিয়ার মুসলিম রাজ্যগুলো রাশিয়ার পদানত হয়ে যায়।

শির দরিয়ার কর্তৃত্ব ছিল খোকান্দ রাজ্যের খানের দখলে। প্রচণ্ড বাধা দিয়ে খোকান্দের খান তার রাজ্যের স্বাধীনতা রক্ষায় ব্যর্থ হন। শির দরিয়ার উৎসস্থল

হতে ২৮০ মাইল পর্যন্ত শির দরিয়া অববাহিকা রাশিয়ার দখলে এসে যায়। ১৮৯৮ সনে প্রশাসনিক পুনর্গঠন করে প্রাচীন ফারগানা রাজ্যের নাম উজবেকিস্তান করা হয়।

তাসখন্দ দখল (উজবেকিস্তান)

খোকান্দ পতনের পর তাসখন্দের উপর অযাচিত চাপ সৃষ্টি হয়। সভ্যতা এবং সংস্কৃতির দিক দিয়ে এ অঞ্চল রাশিয়া হতে কোন দিক দিয়ে অনুন্নত ছিল না। তাসখন্দ দখলের কোন ইচ্ছা জার সরকারের নেই বলে রাজকীয় ঘোষণা প্রকাশিত হয়। কিন্তু সেনাবাহিনীর চাপ চলতেই থাকে। ১৭ই জুন, ১৮৬৫ রাশিয়া, রুশ সেনাপতি সেরনিয়াইয়েভ তাসখন্দ নগরী দখল করে। অল্পকালের মধ্যেই সেনা বাহিনী সমগ্র তাসখন্দ রাজ্য দখল করে নেয়। রুশ দখলের পর তাসখন্দ নব অধিকৃত এবং পুনর্গঠিত রাশিয়ান তুকিস্তানের রাজধানী হিসেবে গড়ে উঠে। গভর্নর ছিলেন রুশ জেনারেল কাউফম্যান।

১৫৩০ খৃষ্টাব্দে তাসখন্দ উজবেক রাজা শায়বানী খানের আমলে উজবেকিস্তানের অধীনে আসে। পরবর্তীকালে তাসখন্দ কখনও উজবেক, কখনও কাযাক-কিরগিজ (১৭২৩ খৃঃ) এবং কখনও কালমুক রাজগনের অধীনে আসে।

১৭৮০ খৃষ্টাব্দে ইউনুস খোজা তাসখন্দের রাজা হন। তিনি কাযাকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে স্বাধীনতা রক্ষা করেন। কিন্তু খোকান্দের উজবেক রাজা আমীন খানের নিকট পরাজিত হন। তার পুত্র সুলতান খোজার আমলে খোকান্দের খানগণ তাসখন্দ পুরোপুরি দখল করে। রুশবাহিনীর নিকট খোকান্দের পতনের পর তাসখন্দ রুশ অধিকারে চলে আসে। তাসখন্দের পর স্বাভাবিকভাবেই পরবর্তী রুশ আক্রমণের লক্ষ্য হয় সমরখন্দ।

বুখারা (উজবেকিস্তান)

বুখারা প্রদেশের রাজধানী বুখারা নগরী। শাহরুদ নদীর তীরে এ নগরী অবস্থিত। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী হতে এ নগরী শিল্প-বাণিজ্য এবং সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত। আরবগণ ৭০৯ খৃষ্টাব্দে এ নগরী জয় করেন।

বোখারা প্রদেশ জারাকসাস বা শির দরিয়া নদীর অববাহিকায় অবস্থিত। মরুভূমির মধ্যে এক বিরাট মরুদ্যান জুড়ে তুর্কিস্তান অঞ্চলের অংশ বোখারা প্রদেশ। বর্তমান উজবেকিস্তানে বুখারা এবং সমরখন্দ উভয় নগরী অবস্থিত।

চেঙ্গিশ খান ১২২০ খৃষ্টাব্দে এবং তৈমুর লঙ ১৩৭০ খৃষ্টাব্দে বুখারা জয় করেন। ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত এ দেশের রাজাদের উপাধি ছিল খান এবং বংশ বা সরকারকে বলা হতো খানেইট বা খান বংশ।

১১২৭ খৃষ্টাব্দে আযান দেয়ার জন্যে বুখারা নগরীতে সুলতান আরসালান খান কর্তৃক নির্মিত কালান মিনার। ১৩৬.৮ ফুট উঁচু মিনার তৈরি হয়েছে আগে, পরে ১৫১৪ খৃষ্টাব্দে নির্মিত হয়েছে কালান মসজিদ। আবদুল আজিজ খান মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয় ১১৬৫ খৃষ্টাব্দে।

বিদগ্ধ শাসক উলুম বেগ (১৪১৭ খৃঃ) তিনটি মাদ্রাসা বোখারায় স্থাপন করেন। একটি মাদ্রাসা এখনও টিকে আছে।

১৫শ শতকে প্রতিষ্ঠিত মীর-ই আরব দ্বিতল মাদ্রাসায় ১১০টি প্রকোষ্ঠ ছিল। শায়বানী রাজবংশের বিভিন্ন শাখা দীর্ঘকাল বোখারা প্রদেশ শাসন করেন। তারাই সমরখন্দ হতে রাজধানী বোখারায় স্থানান্তর করে। খান্যাট বা খানরাজ্য শব্দটি তাদের আমল থেকেই প্রচলিত হয় : দ্বিতীয় আবদুল্লাহ খান (১৫৫৭-৯৮) বলখ, তাসখন্দ, খোরাসান, ফারগানা, হিরাত, শাহরুদ, খারিজম ইত্যাদি জয় করে এ রাজ্যের সমৃদ্ধি সাধন করেন।

১৮৬৫ সনে বোখারার সঙ্গে বন্ধুত্বসূচক মৈত্রী চুক্তি সম্পাদনের জন্যে রাশিয়ান মিশন প্রেরিত হয়। এ মৈত্রী চুক্তির আড়ালে গোপন উদ্দেশ্য বুঝতে বুদ্ধিমানের পক্ষে অসুবিধাজনক ছিল না। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে রাশিয়ান জার-এর সেনাপতি মোমানভস্কি বোখারা জয় করেন। ১৮৬৮ সনের মধ্যে সমরখন্দের বাণিজ্য এলাকাসমূহ অধিকৃত হয়ে তা রাশিয়ান তুর্কিস্তান প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

রাজত্ব এবং সিংহাসন হারাবার ভয়ে বোখারার আমীর বাধ্য হয়ে রাশিয়ান মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ হন। বন্ধুত্বের আবরণে বোখারার আমীর অধীনতার দাসখতে স্বাক্ষর করতে বাধ্য হন। ১৯২০ সনে বোখারার মুসলিম শাসক বা আমীর কমিউনিস্টদের দ্বারা বিতাড়িত হন। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের মৈত্রী চুক্তির বরাত দিয়ে ১৯২১ সনে আফগানিস্তানের উত্তরের সমগ্র বোখারা রাজ্য রাশিয়া দখল করে নেয়।

কমিউনিস্ট বিপ্লবের পর লালফৌজ বোখারায় প্রবেশ করে। বোখারার অধিবাসীগণ ৩৫ হাজার সৈন্য সংগ্রহ করে বাধা দেন। কোলেসভ এবং বাঙ্গালী এম. এন. রায় ছিলেন আক্রমণকারী দলের সেনাপতি এবং উপদেষ্টা। ১৯২০ সনে আগষ্ট মাসে বোখারাবাসীর চূড়ান্ত পরাজয় ঘটে। সর্বশেষ পর্যায় পর্যন্ত মুজাহিদ বাহিনীর সংখ্যা দাড়ায় ৪৩ হাজারে। কিন্তু বৃহত্তর বাহিনী এবং সামরিক কলা কৌশলের নিকট দুর্বল আমীরের নেতৃত্বে মুজাহিদ বাহিনী পরাজিত হয়।

১৯২০ সনের পরও ক্ষুদ্রতর পর্যায়ে কম্যুনিষ্ট বিরোধিতা চলতে থাকে। তারা এক পর্যায়ে বোখারার এক অংশ দখল করতে সমর্থ হয়। কিন্তু স্বাধীনতা রক্ষায় লালফৌজ বাহিনীর নিকট পরাজিত হয়।

ইমাম বুখারী

সোভিয়েট সাম্রাজ্য ১৯৯১ সনে ভেঙ্গে পড়ার পর ১৯৯২ সনের ৮ই ডিসেম্বর উজবেকিস্তান স্বাধীনতা ঘোষণা করে। বুখারী শরীফের সঙ্কলক ইমাম বুখারীর জন্ম বুখারা নগরে হলেও কোন প্রতিষ্ঠান বা অন্য কোন কিছুর নামকরণ ইমাম বুখারী নামে মুসলিম আমলে বা পরবর্তীতে হয়েছে বলে মনে হয় না।

শৈশবে ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল ইবনে মুগীরা ইবনে বারদিযবাহ বুখারী পিতৃহারা হন। ইমাম বুখারী বাল্যকালে অন্ধ হয়ে যান এবং মায়ের দোয়ার আল্লাহ করুণায় দৃষ্টিশক্তি ফিরে পান। বুখারীভাষীদের পরিভাষায় ইমাম বুখারীর দাদার নাম 'বারদিযবাহ' শব্দের অর্থ হলো কৃষক, মালী, অর্থাৎ সমাজের নিম্ন পর্যায়ের শ্রমিক মানুষ। তার সঙ্কলিত হাদীসের কিতাব বুখারী শরীফ কুরআনের পরই বিশুদ্ধতম এবং পবিত্রতমগ্রন্থ হিসেবে মুসলিম বিশ্বে সমাদৃত।

মার্ভ তুর্কমেনিস্তান দখল

১৮৭৭ সনে খোকান্দ দখলের পর রাশিয়া মার্ভ প্রদেশ দখলের দিকে মনোযোগ দেয়। এই মার্ভ নগরী একসময় আব্বাসিয়া খলিফা মামুনুর রশিদের রাজধানী ছিল।

আফগানিস্তান এবং বুখারার রাজনৈতিক এবং কূটনৈতিক সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ট ছিল। বুখারায় রাশিয়ান প্রভাব আফগানিস্তানের বিশেষ শংকা বা সাবধানতার কারণ ছিল।

রাশিয়া কর্তৃক সমরখন্দ দখলের পর (১৮৬৮ খৃঃ) আফগানিস্তানের আমীর কিছুটা ভীত হয়। যদিও রাশিয়ার সঙ্গে তার সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল। কাবুলে তখন বৃটিশ দূতাবাস ছিল না। আফগান আমীরের দূত সিমলায় এসে বৃটিশ গভর্নর জেনারেলের নিকট কাবুলের ভীতির বিষয় জ্ঞাপন করে এবং বৃটিশের সাহায্য প্রার্থনা করে।

বৃটিশ সরকার বিষয়টি রাশিয়ান জারের সঙ্গে উত্থাপন করে।

বৃটিশ-রাশিয়া আলোচনার সময় ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে রাশিয়া আফগানিস্তানের উত্তর সীমা আমুদরিয়া পর্যন্ত মেনে নিতে স্বীকৃত হয়। এ মর্মে একটি ঘোষণাও স্বাক্ষরিত এবং ঘোষিত হয়। পামিরে আমুদরিয়ার উৎস থেকে নিম্নে খাজা সালার পর্যন্ত আমুদরিয়ায় দক্ষিণ তীরের সমগ্র এলাকা আফগানিস্তানের অন্তর্ভুক্ত থাকবে—এ স্বীকৃতি রাশিয়া প্রদান করে। ফলে বলখ, মাইমানা, হেরাত, আন্দকুই ইত্যাদি আফগানিস্তানের অন্তর্ভুক্ত থাকার কথা।

রাশিয়ান জার সরকার ক্রমাগত দক্ষিণ দিকে অগ্রসরমানতায় বৃটিশ সরকার শংকিত হয়ে ওঠে। রাশিয়ান সরকার মৌখিক আশ্বাস দেওয়ার পর চুক্তিবদ্ধ হয় যে, আফগানিস্তান সর্বদাই রাশিয়ার প্রভাব বলয়ের বাইরে থাকবে। স্বীকৃত হয় যে, রাশিয়া ব্রিটেনকে আফগানিস্তান ছেড়ে দিবে। তবে মধ্য এশিয়ার রুশ আধিপত্য মেনে নিতে হবে।

রাশিয়া অধিকৃত মধ্য এশিয়াকে ১৯২৫ সনের মে মাসে প্রশাসনিক পুনর্গঠন করে তাজিকিস্তান, উজবেকিস্তান, এবং তুর্কমেনিস্তান-এ তিনটি রাজ্যে ভাগ করা হয়। এ বিভাগ অনুসারে প্রাচীন ঐতিহাসিক শহর মার্ভ পড়ে তুর্কমেনিস্তানে। অপর কয়েকটি প্রখ্যাত এবং ঐতিহাসিক নগরী পড়ে যায় উজবেকিস্তানের ভাগে। এগুলো হলো বুখারা তাসখন্দ, সমরখন্দ, খিভা।

১৭

আফগানিস্তানে কম্যুনিস্ট শাসন

আহমদ শাহ আবদালী দুররানী বংশের (১৭৪৭ - ১৮১৮ খৃঃ) পরবর্তী আট বছর পর্যন্ত আফগানিস্তানে কেন্দ্রীয় সরকার বা নাম করার মত তেমন কোন সরকার ছিল না। রাজার অভাবে দেশে বিরাজ করছিল অরাজকতা এবং বিশৃঙ্খলা। এর পর ছয় বছর বিভিন্ন প্রদেশ বিভিন্ন ব্যক্তি শাসন করেন। ১৮২৬ হতে ১৩৩৪ খৃঃ পর্যন্ত বারাকজাঁই মোহাম্মদ জাঁই বংশের আমীর দোস্ত মোহাম্মদ খান আফগানিস্তানের অধিকাংশ এলকায় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ক্রমশঃ আফগানিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চল পদানত করে বর্তমান আফগানিস্তানের রূপ দেন(১৮৩৪-৬৩ খৃঃ)।

আমীর দোস্ত মোহাম্মদ খানের পর তার তৃতীয় পুত্র আমীর শের আলী (১৮৬৩-৬৬ খৃঃ), প্রথম পুত্র মুহাম্মদ আফজল খান (১৮৬৬-৬৭ খৃঃ), দ্বিতীয় পুত্র মুহাম্মদ আজিম (১৮৬৭-৬৯), পুনরায় তৃতীয় পুত্র শের আলী (১৮৬৯-৭৯) আফগানিস্তানের রাজা বা আমীর ছিলেন।

শের আলীর মৃত্যুর পর তার পুত্র ইয়াকুব খান (১৮৭৯ খৃঃ), শের আলীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মুহাম্মদ আফজালের পুত্র আবদুর রহমান (১৮৮০-১৯০১ খৃঃ) আফগানিস্তানের রাজা হন।

আমীর আবদুর রহমানের পর তৎপুত্র হাবিবুল্লাহ (১৯০১-১৯ খৃঃ), হাবিবুল্লাহর পর তদীয় তৃতীয় পুত্র আমানুল্লাহ খান (১৯১৯-২৯ খৃঃ) পর্যন্ত

আফগানিস্তানে রাজত্ব করেন। পাশ্চাত্য অন্ধ অনুসরণ এবং গোড়ামীর জন্যে তিনি এক ভিস্তিওয়ালার পুত্র এবং দস্যুসরদার হাবিবুল্লাহ বাছা-ই সাক্কোর দ্বারা রাজ্যচ্যুত হন। বাছা-ই সাক্কোকে পরাজিত এবং নিহত করে বারাকজাঁই বংশের প্রথম আমীর দোস্ত মোহাম্মদের ভ্রাতা সুলতান মোহাম্মদের বংশধর নাদির শাহ (১৯২৯-৩৩ খৃঃ) আফগানিস্তানের রাজা হন। নাদির শাহের পর তার পুত্র জহির শাহ (৮ই নভেম্বর ১৯৩৩ হতে ১৭ই জুলাই, ১৯৭৩খৃঃ) ৪০ বছর পর্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে রাজত্ব করেন। তিনি তার চাচাতো ভাই এবং ভগ্নিপতি জেনারেল দাউদ খান কর্তৃক রাজ্যচ্যুত হন।

সর্দার দাউদ খান (১৯৭৩-৭৮ খৃঃ)

সরদার দাউদ খান ছিলেন নাদির শাহের ভ্রাতা সরদার মোহাম্মদ আজিম খানের পুত্র। দাউদ খানের সমর্থন এবং প্রশ্রয়ে কম্যুনিস্টগণ আফগানিস্তানে অত্যধিক শক্তিশালী হয়ে উঠেন। তিনি রাজতন্ত্র বিলোপ করে আফগানিস্তানকে প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করেন। ১৯৩২ সনে তিনি কান্দাহারের গভর্নর নিযুক্ত হন। ১৯৩৭ সনে সরদার দাউদ আফগান সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত হন। ১৯৫৩ সনের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি জহির শাহের ভগ্নিকে বিয়ে করেন এবং প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। ১৯৬৩ সন পর্যন্ত তিনি আফগানিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন।

কম্যুনিস্ট বিপ্লবের মাধ্যমেই সরদার দাউদ ক্ষমতায় আসেন। এ বিপ্লবে রাশিয়ার হস্তক্ষেপ ছিল স্পষ্ট। জহির শাহের বিরুদ্ধে বিপ্লবের সময় নূর মোহাম্মদ তারাকী, হাফিজুল্লাহ আমীন ও বারবাক কারমাল কারাগারে ছিলেন। বিপ্লবীরা তাদেরকে কারাগার থেকে মুক্ত করে দেয়। বিপ্লবের সাফল্য সম্বন্ধে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত তাদের তিনজনকে কাবুল শহরে বা উপকণ্ঠে বিপ্লব দিবাগত রাত, তার পরদিন এবং পরদিন দিবাগত রাত কাবুলে বা কাবুলের উপকণ্ঠে কাটাতে দেয়া হয়নি। সোভিয়েট দূতাবাসের পরামর্শ বা নির্দেশে তাদেরকে সোভিয়েট পরিবহন বিমান আন্টোনিভ ১২তে দু'রাত এবং একদিন কাটাতে হয়। উদ্দেশ্য ছিল যে, বিপ্লব ভিন্ন দিকে মোড় নিলে তারা যেন বিমানে মস্কো চলে যেতে পারেন।

১৯৭৮ সনের ৩০শে এপ্রিল রাষ্ট্রপতি ভবনে ট্যাঙ্ক চালিয়ে দাউদ খান পরিবারের সকল সদস্যকে হত্যা করে জেনারেল নূর মোহাম্মদ তারাকী রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করেন।

নূর মোহাম্মদ তারাকী (৩০শে এপ্রিল, ১৯৭৮-১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৯)

নূর মোহাম্মদ তারাকী ১৯৫২-৫৩ সনে ওয়াশিংটনে আফগান দূতাবাসে প্রেস সেক্রেটারী ছিলেন। পরে চাকরী ছেড়ে দিয়ে রাজনীতিতে যোগ দেন। জেনারেল নূর মোহাম্মদ তারাকী দেড় বছর ক্ষমতায় ছিলেন। ক্ষমতার পট পরিবর্তনকালে বিরুদ্ধবাদীদের হাতে নূর মোহাম্মদ তারাকী নিহত হন। নূর মোহাম্মদ তারাকী পরচম পার্টিকে সন্দেহের চোখে দেখতেন। তারাই তাকে অপসারণের উদ্যোগ নেয়।

নূর মোহাম্মদ তারাকীর নেতৃত্বে সংগঠিত ৩০শে এপ্রিল ১৯৭৮-এর বিপ্লবকে বলা হয় সাওর বিপ্লব। বাংলা ক্যালেন্ডার অনুযায়ী এপ্রিল মাসের বিপরীতে বাংলা মাস হলো চৈত্র-বৈশাখ। আফগান ক্যালেন্ডারে এপ্রিল মাসকে বলা হয় সাওর। তাই ৩০শে এপ্রিলের বিপ্লবকে সাওর বিপ্লব নামে অভিহিত করা হয়। ক্ষমতা দখল করেই নূর মোহাম্মদ তারাকী সমাজতন্ত্রকে রাষ্ট্রীয় আদর্শ করে ফরমান জারী করেন।

নূর মোহাম্মদ তারাকীর সমর্থক কমিউনিস্টদের ২টি গ্রুপ ছিল ঃ

(১) চীনঘেঁষা খালক্ (জনতা) পার্টি এবং (২) সোভিয়েতঘেঁষা পরচম (পতাকা) পার্টি। পরচম পার্টির টার্গেট ছিল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, প্রশাসন এবং সেনাবাহিনী। পরচম পার্টি এবং খালক পার্টি অর্থনৈতিক সমস্যার কথা বেশী বলতো। পরচম (পতাকা) পার্টি আদর্শগতভাবে অধিকতর কমিউনিস্ট এবং খালক পার্টি (১৯৬৫ খৃঃ) ছিল কিছুটা জাতীয়তাবাদী। খালক পার্টি নিষিদ্ধ হওয়ার পর পুলিশ ইন্সপেক্টর আলী আকবর খাইবারের নেতৃত্বে পরচম পার্টি গঠিত হয়। পরচম পার্টিও বাদশাহ জহির শাহের আমলে নিষিদ্ধ হয়। পরচম পার্টির প্রতিষ্ঠাতা মীর আকবর খাইবার নূর মোহাম্মদ তারাকীর ক্ষমতা দখলের দশদিন পূর্বে প্রকাশ্য দিবালোকে নিজ দলের সদস্যদের হাতে নিহত হন।

হাফিজুল্লাহ আমীন (১৪ই সেপ্টেম্বর ১৯৭৯-২৭শে ডিসেম্বর, ১৯৭৯)

হাফিজুল্লাহ আমীন ছিলেন মূলতঃ একজন স্কুল শিক্ষক এবং সুচতুর সংগঠক। ১৯৫৭ সনে যুক্তরাষ্ট্রের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর ডিগ্রীর জন্যে গমন করেন। এম. এ ডিগ্রী নিয়ে এসে কাবুল টিচার্স ট্রেনিং হাই স্কুলের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ১৯৬২ সনে পুনরায় কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে যান। ফিরে এসে তিনি রাজনীতিতে যোগ দেন। ১৯৬৫ সনে পিডিপি-এর সদস্য হিসেবে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে পরাজিত হন এবং পরবর্তীতে ১৯৬৯ সনে নির্বাচনে জয় লাভ করেন।

প্রায় দেড় বছরের মধ্যে ১৯৭৯ খৃষ্টাব্দের ১৪ই সেপ্টেম্বর উপ-প্রধানমন্ত্রী হাফিজউল্লাহ আমীন জেনারেল নূর মোহাম্মদ তারাকীকে অপসারণ করে নিজেই প্রধানমন্ত্রী হন। হাফিজউল্লাহ আমীন প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের ফসল ৩ মাসের বেশী ভোগ করতে পারেননি। ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পরেই নূর মোহাম্মদ তারাকী নিহত হন।

সেনাবাহিনীতে দাউদ খানের আমল থেকেই সোভিয়েত সমর্থকদের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। সেনাবাহিনীর মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা বেশ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। পরচমপন্থী সেনাকর্মকর্তারা মনে করেন হাফিজউল্লাহ আমীনের নীতি ছিল কিছুটা মার্কিনঘেঁষা।

বারবাক কারমাল (১৯৭৯-৮৬ খৃঃ)

বারবাক কারমাল কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনে স্নাতক ডিগ্রী নেন। ৫০-এর দশকে রাজনৈতিক কারণে ৫ বছর জেলে কাটান। ১৯৫৭-৬৫ পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে চাকরী করেন। পরবর্তীতে পিডিপি হতে সংসদে নির্বাচিত হন। সোভিয়েত সৈন্য আফগানিস্তানে প্রবেশের দু'দিন পরেই সোভিয়েতপন্থী পরচম পার্টির সমর্থনপুষ্ট বারবাক কারমাল হাফিজ উল্লাহ আমীনকে অপসারণ করে ২৭শে ডিসেম্বর ১৯৭৯ খৃষ্টাব্দে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করেন।

ক্ষমতা হস্তান্তরে রুশ সরকারের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ ছিল। কাবুলে নিরাপত্তা বিধানের নাম করে ২৪ ডিসেম্বর হতে ২৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত তিন দিনে তিন হাজার সোভিয়েত সৈন্য কাবুল বিমান বন্দরে অবতরণ করান হয়।

হাফিজুল্লাহ আমীনের অজ্ঞাতেই তাকে সরাবার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এতে কাবুলে আফগানসৈন্য এবং সোভিয়েতসৈন্যদের মধ্যে মধ্য রাতেই সংঘর্ষ শুরু হয়। সোভিয়েত ডেপুটি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ভিকটর এস পাপুটিন স্বয়ং এ অভিযান পরিচালনা করেন এবং তিনি রজনীর অভিযানে আফগানসৈন্যদের হাতে নিহত হন। ২৬ ডিসেম্বর রাতে প্রতি দশ মিনিটে একটি রুশ সামরিক বিমান এবং সরঞ্জাম নিয়ে কাবুল বিমান বন্দরে অবতরণ করতে থাকে। পরিবহন সুপারভিশন করেন কাবুলে আগমনকারী সোভিয়েত যোগাযোগমন্ত্রী নিকোলাই তালেজিন।

১৯৭৮ এর ৩০শে এপ্রিল হতে মে ১৯৭৯ এর ২৭শে ডিসেম্বরের মধ্যে তিনজন আফগান প্রেসিডেন্ট জেনারেল দাউদ খান, কর্নেল নূর মোহাম্মদ তারাকী এবং হাফিজুল্লাহ আমীনের হত্যাকাণ্ড সমাজতন্ত্রী নৃশংসতার এক জলন্ত দৃষ্টান্ত। অথচ এরা তিনজনই ছিলেন রুশ অনুগত এবং সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী।

বারবাক কারমাল (১৯৭৯-১৯৮৬ খৃঃ) সোভিয়েত রাশিয়ার অনুগ্রহপুষ্ট এজেন্ট হিসেবেই সাত বছর বিরাজ করেন এবং তারই আহ্বানে বা সমর্থনে সোভিয়েত রাশিয়া আফগানিস্তানে সৈন্য প্রেরণ করে।

জেনারেল হাফিজুল্লাহ আমীনকে অপসারণের জন্যে কাবুলে আফগানীদের মধ্যে যারা যারা দায়ী ছিলেন তারা কেউই ক্ষমতায় আসতে পারেননি। বরং বহু পূর্বে আফগানিস্তান থেকে বিতাড়িত এবং মস্কোতে অবস্থানকারী বারবাক কারমাল মস্কো হতে ২৮শে ডিসেম্বর ১৯৭৯ তার মন্ত্রীসভার সদস্যদের নাম ঘোষণা করেন। মন্ত্রীসভার নাম ঘোষণার ৭ দিন পর তিনি কাবুলে প্রত্যাবর্তন করেন। ১৯৭৮ খৃষ্টাব্দের ৫ই ডিসেম্বর নূর মোহাম্মদ তারাকীর আমলে আফগান-সোভিয়েত 'মৈত্রী ও সহযোগিতা' চুক্তিনামে সোভিয়েত রাশিয়া ও আফগানিস্তানের মধ্যে ২০ বছর মেয়াদী পারস্পরিক মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির আওতায় সোভিয়েত সৈন্য ডিসেম্বর ২৫, ১৯৭৯ আফগানিস্তানে প্রবেশ করে।

বাদখশান প্রদেশে প্যারাস্যুটের মাধ্যমে সোভিয়েত ট্যাংক নামানো হয়। হাজার হাজার ট্যাংক ছাড়া সোভিয়েত দখলাধীনে আফগানিস্তানে এক লক্ষ পাঁচ হাজার সোভিয়েতসৈন্য এবং ৪০০টির বেশী হেলিকপ্টার গানশীপ নিয়োজিত ছিল।

১৯৭৯ সনে কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক কাবুল দখল করার পর হেরাত দখল করে। হেরাত শহরের ২ লক্ষ অধিবাসীদের মধ্যে ২৫ হাজার অধিবাসীকে হত্যা করা হয়। কমিউনিস্ট শাসনামলে ১৫ লক্ষ আফগানকে হত্যা করা হয়।

১৯৭৯ থেকে ১৯৮৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সুদীর্ঘ ১০ বছর সোভিয়েত সেনাবাহিনী আফগান জনগণের বুকে জগদ্দল পাথরের মতো চেপে থাকে। ১৯৮৯ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে জেনেভা চুক্তি মোতাবেক আফগানিস্তান থেকে সোভিয়েত সৈন্য অপসারণ সম্পন্ন হয়। ১৯৮৮ খৃষ্টাব্দে ২৪শে এপ্রিল আফগানিস্তানে শান্তি স্থাপন সংক্রান্ত জেনেভা চুক্তিতে পররাষ্ট্র পর্যায়ের স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রসমূহ ছিল সোভিয়েত রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান।

ডঃ নজিবুল্লাহ (১৯৮৬-৯২ খৃঃ)

মুজাহিদদের গেরিলা অভিযান দমনে ব্যর্থ বারবাক কারমালের প্রতি সোভিয়েত কর্তৃপক্ষ অসন্তুষ্ট ছিল। বস্তুত সোভিয়েত কর্তৃপক্ষই ১৯৮৬ খৃষ্টাব্দে বারবাক কারমালকে অপসারণের মাধ্যমে ডঃ নজিবুল্লাহকে আফগানিস্তানের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করে। অপসারিত হওয়ার পর তার পূর্বসূরী সর্দার দাউদ, নূর মোহাম্মদ তারাকী, হাফিজউল্লাহ আমীন প্রমুখের হত্যা এবং করুন পরিণতির কথা ভেবেই হয়ত বারবাক কারমাল রাশিয়ায় পলায়ন করেন এবং এখনো রাশিয়ায়ই অবস্থান করছেন।

১৯৮৯ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে আফগানিস্তান থেকে সোভিয়েতসৈন্য প্রত্যাহারের পরেও ডঃ (চিকিৎসক) নজিবুল্লাহ ১৯৯২ খৃষ্টাব্দের ১৫ই এপ্রিল পর্যন্ত কাবুলে ক্ষমতাশীন থাকেন।

ডাক্তার নজিবুল্লাহ একসময় আফগান গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান ছিলেন। প্রথম দিকে তিনি তেহরানে আফগান রাষ্ট্রদূত ছিলেন।

ডঃ নজিবুল্লাহ ছিলেন পেশায় চিকিৎসক। তিনি আহমদজাঁই গিরজাঁইভুক্ত পুশতুন। বারবাক কারমালের বন্ধু ডঃ নজিবুল্লাহ ছিলেন আফগানিস্তানের গোপন পুলিশ সংগঠন খাদ-এর প্রধান। এটা ছিল সোভিয়েত কেজিবি'র সহোদর প্রতিষ্ঠান।

ডঃ নজিবুল্লাহ ১৯৮৬ থেকে ১৯৯২ খৃষ্টাব্দের ১৫ই এপ্রিল মুজাহিদদের হাতে কাবুলের পতনকাল পর্যন্ত ৬ বছর আফগানিস্তানে ক্ষমতাসীন ছিলেন। ২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৯৯৬ শুক্রবার তালেবানদের কাবুল জয়ের পর তিনি ফাঁসিকাষ্ঠে মৃত্যুবরণ করেন। ২৯শে সেপ্টেম্বর রবিবার ডঃ নজিবুল্লাহ এবং তার ভ্রাতার মৃতদেহ তার নিজস্ব গোত্র আহমদ জাঁই গোত্রপ্রধানের নিকট হস্তান্তর করা হয়। পাকতিয়া প্রদেশে তার নিজস্ব শহর গারদেজ নগরীতে তাদের সমাহিত করা হয়। গারদেজ শহর কাবুল হতে প্রায় ১০০ কিলোমিটার দক্ষিণে।

১৮

মুজাহেদীন এবং তালিবান নেতৃবৃন্দ

শিয়া মুজাহিদ দলসমূহ

আফগান মুজাহিদ গ্রুপগুলোর মধ্যে ত্যাগের প্রবণতা আছে ; কিন্তু ঐক্যের প্রবণতা অত্যন্ত দুর্বল। অনৈক্য শুধুমাত্র সুন্নীদের মধ্যে নয়, শিয়া মুজাহিদ আন্দোলনগুলোও বিচ্ছিন্ন। শিয়াদের বড় গ্রুপ হলো পাঁচটি ঃ

(১) সৈয়দ আলী বেহেস্তির নেতৃত্বাধীন শূরা দল, (২) শেখ মুহসিন-এর নেতৃত্বাহীন হারাকাত-ই ইসলামী (ইসলামী আন্দোলন), (৩) মুহসিন রেজার নেতৃত্বাধীন সেফা-ই পাসদারা (বিপ্লবী গার্ড), (৪) সাজমানই ন'সর (বিজয় সংগঠন) এবং (৫) হিজবুল্লাহ (আল্লাহর দল)।

সিবগাতুল্লাহ মুজাদ্দেদী

জাবহা-ই নাজাত-ই মিল্লি (ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট) পার্টির নেতা হলেন প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক সিবগাতুল্লাহ মুজাদ্দেদী। ১৯৩৮ সনে এ দল

প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি নকশবন্দী তরীকার পীর। দাউদ খান কর্তৃক সংঘটিত সমাজতান্ত্রিক অভ্যুত্থানের সময় সিবগাতুল্লাহ মুজাদ্দেদী বিদেশে ছিলেন। লিবিয়ার রাষ্ট্রপতি মুয়াম্মার গাদ্দাফী তাকে বেলজিয়াম ও ইউরোপীয় কয়েকটি দেশে মুবাল্লিগ হিসেবে অবদান রাখার ব্যবস্থা করে দেন। দক্ষিণ-পূর্ব আফগান এলাকায় এ দলের সমর্থন বেশী। এ দল সুফিবাদী রক্ষণশীলতায় বিশ্বাসী শরিয়তপন্থী দল।

পীর সৈয়দ আহমদ জিলানী

অধ্যাপক পীর সৈয়দ আহমদ জিলানী নেতৃত্ব দিচ্ছেন মাহাজ-ই মিল্লি ইসলামীয়া-এর (ইসলামী জাতীয় ফ্রন্ট)। তিনি কাদেরিয়া তরীকার পীর। তার ভ্রাতুষ্পুত্র এবং উত্তরসূরী সৈয়দ হাসান জিলানী (জন্ম ১৯৫৩) অত্যন্ত প্রতিশ্রুতিশীল তরুণ নেতা। আফগানিস্তানে কাদেরিয়া তরীকার প্রভাব বেশী। হযরত আবদুল কাদের জিলানী (রহঃ) (১০৭৭-১১৬৬) এদেশে পীর বাবা নামে খ্যাত। পাকতিয়া প্রদেশে এ দল শক্তিশালী। এ দলের নীতি রক্ষণশীল।

বুরহানুদ্দিন রব্বানী

সবচেয়ে বড় দু'টি দল হলো অধ্যাপক বুরহানুদ্দিন রব্বানীর জমিয়াত-ই ইসলাম এবং গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ারের নেতৃত্বাধীন হেজব-ই ইসলামী (ইসলামী দল)। জহির শাহের আমলে জমিয়াত-ই-ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়। আহমদ শাহ মাসুদ এ দলের প্রধান সেনাধ্যক্ষ। রুশ দখলের সময় গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ার ছিলেন কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্যাকাল্টির ছাত্র। তারচেয়ে ৭ বছর বেশী বয়স্ক বুরহানুদ্দিন রব্বানী একই সময়ে ছিলেন কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামিয়াত বিভাগের অধ্যাপক। রব্বানীর প্রভাবিত এলাকা হলো উত্তরের বাদখশান, টাকহার, বাখলান এবং পরওয়ান প্রদেশ। জমিয়াতে ইসলামীর লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য হলো ইসলামী আদর্শভিত্তিক আধুনিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা।

গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ার

হেজব-ই ইসলামী দল দু'ভাবে বিভক্ত। বৃহত্তর অংশের নেতৃত্ব দিচ্ছেন গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ার। হিজব-ই ইসলামী প্রচারপন্থী দল হিসেবে পরিচিত। হেকমতিয়ার একজন ইঞ্জিনিয়ার। দলের লক্ষ্য কল্যাণভিত্তিক ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। বাদশাহ জহির শাহের আমলে এ দল প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশব্যাপি এর শাখা আছে। পুশতু ভাষাভাষী যুবকদের মধ্যে এর প্রভাব বেশী।

ইউনুস খালিস

অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র অংশ হেজর-ই-ইসলামী দলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন ধর্মতত্ত্বের অধ্যাপক ইউনুস খালিল। তিনি বৃদ্ধ। ১৯৭৮ সনে প্রতিষ্ঠিত এ দলের লক্ষ্য এবং আদর্শ আধুনিক ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। নানগ্রাহার (জালালাবাদ) প্রদেশে এ দল বেশী শক্তিশালী। দুর্ধর্ষ যোদ্ধা হিসেবে দলের সদস্যদের খ্যাতি আছে। তার বয়স হেকমতিয়ার-এর বয়স হতে ৩২ বছর বেশী।

নবী মোহাম্মাদ লুগার

নবী মোহাম্মাদ লুগার হারাকাত-ই ইনকিলাব-ই ইসলামী (ইসলামিক রিভোলিউশনারী আন্দোলন)-এর নেতা। তার জন্ম-১৯২৪ ইং। এই আন্দোলন লোগার, কাবুল, জাবুল, নিমরোজ এলাকায় শক্তিশালী। নবী মোহাম্মদ রক্ষণশীল আলেম। ১৯৭৮ সনে এ দল প্রতিষ্ঠিত হয়। তার দলের প্রভাব আলেম, পীর, সুফি ও ভুস্বামীদের উপর।

উপজাতীয় ও আঞ্চলিক ভিত্তিতে গঠিত আরও কিছু কিছু মুজাহেদীন সংগঠন বিভিন্ন অঞ্চলে কাজ করে। এর মধ্যে আছে মোল্লা মুয়াজ্জিনের নেতৃত্বাধীন হারাকাতে ইনকিলাব, মোল্লা মোহাম্মদ মীরের নেতৃত্বাধীন জিবহাতে মিল্লী, হাজারাজাতে শিয়া হাজারী প্রতিষ্ঠান, পূর্ব অঞ্চলে নুরিস্তানী, ইখওয়ানুল মুসলেমীন ইত্যাদি।

আবদুর রাব্বুর রাসূল সাইয়াফ বিন ফকির মুহাম্মদ

ইত্তেহাদে ইসলামী নেতা হলেন আবদুর রাববুর রাসূল সাইয়াফ। ১৯৮১ সনের আগষ্ট মাসে গঠিত ইত্তেহাদে ইসলামী ঐক্যমত পোষণকারী দলসমূহের একটি ফেডারেশন। ৫০ সদস্যের একটি মজলিশ-ই শুরাও এর রয়েছে।

আবদের রাসূল সাইয়াফের জন্ম (১৯৪৫ খৃঃ) পাগমান জেলায়। কাবুল বিশ্ববিদ্যালয় হতে আইনে ডিগ্রী গ্রহণের পর তিনি আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন এবং পি.এইচ.ডি. ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি ছিলেন কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত অধ্যাপক।

১৯৭৪ সনে সরদার দাউদের আমলে তিনি কারাবরণ করেন। নূর মোহাম্মদ তারাকীর আমলে তার ফাঁসির আদেশ হয়। রুশ আগ্রাসনের সময় সাধারণ ক্ষমা ঘোষিত হয়। ১৯৮০ সনে মুক্তি পেয়ে পেশোয়ার চলে যান।

জিহাদ সমন্বয়ের জন্যে বহু পদক্ষেপ নেয়া হয়। ১৯৮০ সনে জানুয়ারীতে পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত সম্মেলনের মাধ্যমে Islamic Alliance for Liberation of

Afghanistan গঠিত হয়। ১৯৮১ সনের আগষ্ট মাসে আবদুর রাববুর রাসূল সাঈয়াফের নেতৃত্বে ইত্তেহাদে ইসলামী গঠিত হয়। উল্লেখযোগ্য বড় মুজাহিদ গ্রুপের সংখ্যা ১৫-১৬টির মত।

ইত্তেহাদে ইসলামী বা ঐক্য ফ্রন্টের সদর দফতর সীমান্ত এলাকায়। বিশ্ব জনমত গঠন, সাংবাদিকদের সফরের ব্যবস্থা করা, মুজাহিদ রিক্রুট করা, তহবিল সংগ্রহ ইত্যাদি কাজে ইত্তেহাদে ইসলামী ছিল সক্রিয়।

সামরিক প্রশিক্ষণ, অস্ত্র সংগ্রহ, বিতরণ, জিহাদ অভিযানের পরিকল্পনায় সমন্বয় করার চেষ্টা ইত্তেহাদে ইসলামী করে থাকে। সাধারণতঃ যে এলাকায় যে যে নেতার সমর্থন বেশী সে অঞ্চলেই ঐ দলের অভিযান পরিচালিত হতো। মুজাহেদীনদের বিশেষ বিশেষ এলাকায় প্রভাব থাকলেও সুস্পষ্ট বিভক্তি ছিল না। নেতাদের মধ্যে শত্রুতা না থাকলে একই এলাকায় একাধিক ব্যক্তি কাজ করতে পারেন।

সরকারী বাহিনী হতে সমরোপকরণ সংগ্রহ করা মুজাহেদীন বাহিনীগুলোর একটি বিশেষ লক্ষ্য থাকতো। এজন্যে বিশেষ প্রশিক্ষণ দেয়া হতো। মুজাহেদীন গ্রুপের মধ্যে সমরাস্ত্র সম্পর্কে ট্রেনিংপ্রাপ্ত মুজাহিদগণ রনাঙ্গন ঘুরে ঘুরে ব্যবহারোপযোগী অস্ত্রসমূহ সংগ্রহ করতেন।

ঘোরতর যুদ্ধের এলাকা ছিল কাবুল, পারওয়ান, পাগমান, কুনার, নান গ্রাহার, লোগার, গজনী, হিরাত, ফারিয়ার, বলখ, সামানগান, বাগদান, কান্দুজ, বাদখশান, ওয়ারডাক, পাঞ্জাশীর, পাকতিয়া। মাঝামাঝি মুজাহেদীন এলাকা ছিল জাবুল, হেলমন্দ, ফারাহ, তাখার, নিমরোজ। অপেক্ষাকৃত শান্তিপূর্ণ এলাকা ছিল বামিয়ান, ওরজগান, ঘুর, বাদগীজ, দক্ষিণ গজনী ইত্যাদি।

তালিবান নেতৃবৃন্দ

১৯৯৪ সনের অক্টোবর-নভেম্বরে গঠিত তালিবান কর্তৃক ২৭শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার ১৯৯৬ কাবুল দখলের পর তালেবানদের যে কেন্দ্রীয় শুরা গঠিত হয় তার সদস্য সংখ্যা হলো ছয়। এ সদস্যরা হলেন ঃ

১। হাজী মোহাম্মদ হাসান – কান্দাহার প্রদেশের আমীর ২। মোল্লা আবদুর রাজ্জাক—তালিবান সামরিক বিষয়ক প্রধান ৩। উজবেক নেতা মৌলভী গিয়াস উদ্দিন—ফারিয়ার প্রদেশের আমীর ৪। মোল্লা মোহাম্মদ ফাজিল—নিরাপত্তা বিষয়ক প্রধান ৫। মোল্লা মোহাম্মদ গাউস – পররাষ্ট্র বিভাগের প্রধান এবং ৬। মোল্লা মোহাম্মদ ওমর—আমিরুল মুমেনীন। কম্যুনিষ্ট বিরোধী জেহাদে হাজী মোহাম্মদ হাসান পঙ্গু হয়ে যান। ক্রাচে ভর করে তাকে চলতে হয়। মোল্লা

মুহাম্মদ উমর চারবার আহত হন। তার একটি চক্ষু সম্পুর্ন নষ্ট হয়ে যায়। তিনি চোখের পাতা দু'টি সেলাই করে নিয়েছেন।

তালিবান শুরার ৬ জন সদস্যের মধ্যে ৪ জন আধ্যাত্মিক নেতা অথবা মোল্লা, ১ জন মৌলভী, ১ জন হাজি। মোল্লাগণ সূফী প্রকৃতির পরহেজগার। মোল্লা ঐ ব্যক্তিত্বদের বলা হয় যিনি আল্লাহকে দুনিয়ার অন্যান্য জিনিস অপেক্ষা প্রিয় মনে করেন। তিনি আমাদের দেশের বুজুর্গদের মতো শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি।

তালেবানদের শিক্ষক এবং মূল নেতা মোল্লা মোহাম্মদ ওমরের বয়স ৩৭ (জন্ম ১৯৬০ খৃঃ)। কারো কারো মতে তাঁর বয়স ৩২ বছর।

(সাপ্তাহিক টাইম ১৪ই অক্টোবর, ১৯৯৬ খৃঃ)

তার কোন বক্তব্য বা ছবি পাশ্চাত্যের কোন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি। তালেবানদের বর্তমান সংখ্যা ১৫ হাজারের মতো। সাপ্তাহিক নিউজ উইক তালিবান বাহিনীর সংখ্যা দশ হাজার বলে উল্লেখ করে (৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯৯৬)। বাহিনী হিসেবে তালিবান বড় কিছু নয়। তবে তাদের আছে এখলাস এবং প্রচারবিমুখতা।

১৯

মুজাহেদীন শাসন হতে তালিবান সরকার

মুজাহিদদের মধ্যে অনৈক্য

আফগানদের মধ্যে গোত্রীয় অনুভূতি অত্যন্ত তীব্র। ফলে শক্তিশালী রাজার শাসনে বিভিন্ন গোত্র এক রাজ্যভুক্ত হলেও তাদের মধ্যে একক জাতিসত্ত্বা গড়ে ওঠেনি। আফগানগণ প্রকৃতিগতভাবে স্বাধীনচেতা ও স্বতন্ত্রবাদী। তাদের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি চেতনা দুর্বল। আফগানিস্তানের যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রাকৃতিক কারণে এতোই অনুন্নত যে, বছরের কয়েক মাসই এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় গমনাগমন কষ্টসাধ্য। তার ফলে বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের মধ্যে স্বনির্ভরতা এবং স্বাতন্ত্র্যবোধ গড়ে উঠেছে।

সিবগাতুল্লাহ মুজাদ্দেদী

১৯৯২ খৃষ্টাব্দের ১৫ই এপ্রিল কমিউনিস্ট ডঃ নজিবুল্লাহর উৎখাত তথা মুজাহিদদের হাতে কাবুলের পতনের পর হতে ১৯৯৬ খৃষ্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর

সাড়ে চার বছর পর্যন্ত সিবগাতুল্লাহ মুজাদ্দেদী এবং অধ্যাপক বোরহানুদ্দিন রব্বানী কাবুলে ক্ষমতাশীন ছিলেন।

১৯৯২ খৃষ্টাব্দের ১৫ই এপ্রিল ডঃ নজিবুল্লাহর পতনের পর ২৮শে এপ্রিল ১৯৯২ (খৃঃ) যাবহা নাজাত মিল্লি (জাতীয় মুক্তি ফ্রন্ট) নেতা সিবগাতুল্লাহ্ মুজাদ্দেদী প্রেসিডেন্ট হিসেবে মনোনীত হন। সিবগাতুল্লাহ মুজাদ্দেদী (জন্ম ১৯৩০ খৃঃ) আল-আজাহার বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করেন। তিনি ছিলেন কাবুল ইসলামিয়া কলেজের অধ্যাপক। তিনি একজন বুদ্ধিমান এবং বিচক্ষণ নেতা।

বুরহানুদ্দিন রব্বানী

সিবগাতুল্লাহ মুজাদ্দেদীর পর ১৯৯২ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বোরহানুদ্দিন রব্বানী প্রেসিডেন্ট মনোনীত হন।

অধ্যাপক বোরহানুদ্দিন রব্বানী ছিলেন জমিয়াত-ই ইসলামীর প্রতিনিধি। জমিয়াত-ই ইসলামীর মূল কেন্দ্র ছিল পেশোয়ার। রব্বানী সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মনোনীত হন হিজব-ই ইসলামী দলের নেতা গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ার।

আহমদ মাসুদ বনাম হেকমতিয়ার

বোরহানুদ্দিন রব্বানী এবং সেনাবাহিনী প্রধান আহমদ শাহ্ মাসুদ তাজিক বংশোদ্ভূত। হিজব-ই ইসলামী প্রধান গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ার পুশতুন গোত্রভুক্ত।

আহমদ শাহ্ মাসুদ মনোনীত হন রব্বানী সরকারের প্রতিরক্ষামন্ত্রী। আহমদ শাহ মাসুদ এবং হেকমতিয়ারের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক কোন পর্যায়ে তেমন ভাল ছিল না। তারা উভয়ে ছিলেন কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ের সমসাময়িক ছাত্রনেতা। গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ার রক্ষণশীল এবং আহমদ শাহ ছিলেন সমাজতন্ত্রের প্রতি সহানুভূতিশীল।

মন্ত্রীসভায় আহমদ শাহ্ মাসুদের অন্তর্ভুক্তিতে গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ার আপত্তি উত্থাপন করেন। কিন্তু তার আপত্তি গৃহীত না হওয়ায় ১৯৯৩ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে এক মাসের মাথায় হেজব-ই ইসলামী দলের গুলবুদ্দিন হিকমতিয়ার প্রধানমন্ত্রীর পদ ত্যাগ করেন এবং বোরহানুদ্দিন রব্বানীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে লিপ্ত হন। নয় মাসের মাথায় রব্বানী এবং হেকমতিয়ার গ্রুপের পূর্ণ ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়।

দশ মুজাহিদ দলের শান্তিচুক্তি —১৯৯৩

১৯৯৩ সনের মার্চ মাসে আফগানিস্তানের ১০টি প্রধান মুজাহিদ দল একটি শান্তিচুক্তি সম্পাদন করেন। এই চুক্তি অনুসারে ১৯৯৩ সনের ডিসেম্বর মাসে

প্রেসিডেন্ট রব্বানীর পদত্যাগ করার কথা। কিন্তু তিনি তা করেননি। ১৯৯৩ সনের শান্তি চুক্তি অনুযায়ী ১৯৯৪ সনে একটি সাধারণ নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তা-ও সম্ভব হয়নি।

৯২-৯৫ মুজাহিদদের আত্মঘাতি যুদ্ধে প্রায় ৩৫ হাজার আফগান নিহত হন। দশ মুজাহিদ দলের শান্তিচুক্তিমত ১৯৯৪ সনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে বা চুক্তির ধারা মতো ১৯৯৪ সনের ডিসেম্বর মাসে প্রেসিডেন্ট রাব্বানী ক্ষমতা অন্য কারো হাতে ছেড়ে দিলে সমস্যা অতো জটিল হয়ত হতো না। যেমন হয়নি সিবগাতুল্লাহ মুজাদ্দেদীর ক্ষমতা ত্যাগের ফলে। পীর সৈয়দ আহমদ জিলানী বা আবদুর রাববুর রাসূল সাইয়াফ বা অন্য কেউ পরবর্তী প্রেসিডেন্ট মনোনীত হতে পারতেন।

তালিবান বিরোধী শান্তিচুক্তি — ১৯৯৬

১৯৯৬ সনের ২৪শে মে তালেবানদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য বোরহানুদ্দিন রব্বানী এবং গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ার এক শান্তিচুক্তি সম্পাদন করেন। ২৬শে জুন, ১৯৯৬ তার শপথ গ্রহণের তারিখ নির্ধারিত থাকলেও ২৯শে জুন ১৯৯৬ হেকমতিয়ার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। তার সঙ্গে তার সহকর্মী ওয়াহিদুল্লাহ সাবাউন প্রতিরক্ষামন্ত্রী হিসেবে এবং আবদুল হাদী অর্থমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। শপথ গ্রহণের দিন সকাল বেলাই তালিবান বাহিনী কাবুল শহরে রকেট বৃষ্টি বর্ষণ করে।

রব্বানী-হেকমতিয়ার জোটভুক্ত দশটি দলের মধ্য হতে ৫টি দলের মোট ৯ জন মন্ত্রী ২৯শে জুন, ১৯৯৬ শপথ গ্রহণ করেন। এই পাঁচটি দল হলো ঃ

(১) আবদুর রশীদ দোস্তামের জামাবিশী মিল্লি। (২) সিবগাতুল্লাহ মোজাদ্দেদী জাবাহ নাজাত মিল্লি (৩) করিম খালিলির হিজবে (শিয়া) ওয়াহাদাত, (৪) সাদেক মুদাবিবের হারকাত ইসলাম এবং (৫) হেকমতিয়ারের হিজবে ইসলাম। এই জোটের নাম দেয়া হয় ন্যাশনাল ফ্রন্ট ফর পিস ইন আফগানিস্তান। কিন্তু ৪ মাসের মধ্যেই তালেবানদের হাতে কাবুলের পতনের পর হেকমতিয়ারকে কাবুল ত্যাগ করতে হয়।

জাতিসংঘ মধ্যস্থতা মিশন

১৯৯৪ সনে তিউনিসিয়ার মাহমুদ মিস্তারীর নেতৃত্বে জাতিসংঘ আফগানিস্তানের এক মিশন পাঠায়। এই মিশনের লক্ষ্য ছিল বিবাদমান মুজাহিদদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে একটি সমঝোতা সৃষ্টি করা। কিন্তু তার মিশনের উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হয়ে অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে তিনি কাবুল ত্যাগ করেন।

কান্দাহার, হেরাত দখল ও কাবুল আক্রমণ

১৯৯৪ সনের অক্টোবর মাসে তালিবান বাহিনী কান্দাহার দখল করে। তালিবান নেতা মোহাম্মদ ওমরের বাড়ী কান্দাহারে।

১৯৯৫ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে তালেবানগণ কাবুল আক্রমণ করে। প্রথমে তারা গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ারের অধিকৃত স্থান দখল করে নেন।

কাবুলের দক্ষিণে অবস্থিত হেকমতিয়ারের ঘাঁটি দখল করা সম্ভব হলেও তালেবানগণ ১৯৯৫ সনে কাবুল দখল করতে পারেননি। তখন তারা পশ্চিম দিকে অগ্রসর হন এবং ১৯৯৫ সনের সেপ্টেম্বর মাসে হেরাত দখল করে নেন। হেরাতে তালিবান গভর্নর নিযুক্ত হন মৌলভী ইয়ার মোহাম্মদ খান।

জালালাবাদের পতন

৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৯৯৬ তালেবানগণ জালালাবাদ অবরোধ করে। এক সপ্তাহ অবরোধের পর ১১ই সেপ্টেম্বর ১৯৯৬ সনে তারা জালালাবাদ দখল করে নেয়।

জালালাবাদের গভর্নর হাজী আবদুল কাদের পালিয়ে পেশোয়ার পৌঁছেন। ভারপ্রাপ্ত গভর্নর ইঞ্জিনিয়ার মাহমুদ পলায়ণের সময় নিহত হন।

শারবির পতন

১৯৯৬ সনের আগষ্ট মাসে তালেবানগণ দ্বিতীয় বারের মতো কাবুল অবরোধ করে। ১১ইং সেপ্টেম্বর ১৯৯৬ সনে তালেবানদের নিকট জালালাবাদের পতনের পর তালেবানগণ কাবুলের ৭০ কিলোমিটার পূর্বে শারবির দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। শারবি ছিল প্রধানমন্ত্রী গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ার সমর্থকদের হাতে। ২৫শে সেপ্টেম্বর অনেকটা বিনা যুদ্ধেই শারবির পতন হলে হেকমতিয়ারের সৈন্যগণ যুদ্ধ না করে তালেবানদের সঙ্গে যোগ দেন। শারবি শহরের পতনের পরেই তালেবানগণ কাবুলের দিকে অধিকতর মনোযোগ দেন।

কাবুল আক্রমণ

শারবী শহরের অবস্থান হলো জালালাবাদ এবং কাবুলের মাঝামাঝি। কাবুলের সরকারী বাহিনী ১৯৯৬ সনের ২৭শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার কাবুল ছেড়ে চলে যাওয়ার একটি বড় কারণ হলো তালেবানগণ চারিদিক হতে কাবুল প্রায় ঘিরে ফেলেছিলেন। ১৯৯৫ সনে ফেব্রুয়ারী মাসে তারা কাবুলের দক্ষিণে হেকমতিয়ারের ঘাঁটি দখল করেন। ১১ই সেপ্টেম্বর ১৯৯৬ সনে জালালাবাদ দখলের পর তালিবান জালালাবাদ হতে অগ্রসর হয়ে কাবুল শহরের উত্তর দিকে অবস্থান নেন।

তাজিকনেতা আহমদ শাহ্ মাসুদ মনে করলেন যে, উত্তর দিকের রাস্তা তালেবানদের হাতে চলে গেলে তার পক্ষে অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে পাঞ্জেশীর উপত্যকায় পিছু-হটা সম্ভব হবে না। পাঞ্জশীর উপত্যকাই হলো তার ক্ষমতার ভিত্তি।

আহমদ শাহ মাসুদ তালেবানদের বিজয় অবশ্যম্ভাবী মনে করে অযথা রক্তপাত না করে যত বেশী সম্ভব অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে সরে পড়ার চিন্তায় থাকেন।

আহমদ শাহ মাসুদ অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে পাঞ্জেশীর উপত্যকায় চলে গেলে রব্বানীদের পক্ষে কাবুলের থাকা সম্ভব নয়। ফলে অনেকটা বিনা যুদ্ধেই ২৭শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার ১৯৯৬ সনে কাবুল তালেবানদের হাতে এসে যায়।

২০

তালেবানদের পরিচিতি ও কর্মকান্ড

অনেকগুলো দল আছে যাদের দলের পরিচিতি অপেক্ষা তাদের নেতাদের পরিচিতি বেশী। এ ক্ষেত্রে তালিবান হলো ব্যতিক্রম। তাদের নেতৃত্ব প্রচারবিমুখ।

আফগানিস্তানের রাজনীতিতে তালেবানদের উদ্ভব এবং সাফল্য অনেকটা ধূমকেতুর মতো। কারা এই তালিবান ? কি তাদের আদর্শ ও নীতি ? আখলাক ও আচরণ ?

আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুল ২৭-০৯-৯৬ হতে তালিবান দখলে। দেশের চার ভাগের তিন ভাগই এখন তাদের নিয়ন্ত্রণে। যারাই রাজধানী দখল করে থাকেন, তাদেরকেই সাধারণতঃ সে দেশের মূল রাষ্ট্রীয় শক্তি হিসেবে সারাবিশ্ব মেনে নিয়ে থাকে। কিন্তু আজকের বিশ্ব তালেবানদের সে স্বীকৃতি দেয়নি। এমনকি কোন মুসলিম রাষ্ট্রই এ পর্যন্ত (মে, ৯৭) তালেবানদেরকে স্বীকৃতি দেয়নি। আশু স্বীকৃতির কোন লক্ষণও দেখা যায় না।

তালিবান উৎস

তালেব আরবী শব্দ। এর অর্থ জ্ঞান তলবকারী বা ছাত্র। তালেবুল ইলম অর্থ জ্ঞান তালাশকারী ছাত্র। তালিবান শব্দটি ফারসীতেও প্রচলিত। আরবীতে তালিবান অর্থ ২ জন ছাত্র। ফারসী ভাষায় তালিবান অর্থ বহু ছাত্র। বহু ছাত্রের আরবী প্রতিশব্দ হলো তালেবুন, তালেবীন ইত্যাদি। মুসলিম শব্দটি আরবী। কিন্তু মুসলমান শব্দটি ফারসী।

কুরানিক মাদ্রাসায় তালিবান প্রাথমিক কোর্স মাত্র ২২ মাসব্যাপী। তালেবানগণ শুরুতে পাকিস্তানের বেলুচিস্তান এবং আফগানিস্তানের কান্দাহার, হেলমন্দ, পাকটিকা, খোস্ত সীমান্তবর্তী অঞ্চলে এবং রিফিউজি ক্যাম্পে স্থাপিত মাদ্রাসার ছাত্র ছিল। ক্রমশঃ অন্যান্য অঞ্চলের ছাত্ররা তাদের সাথে যোগ দেয়।

পাকিস্তানের মাওলানা ফজলুর রহমান ছিলেন তালেবানদের প্রতি সহানুভূতিশীল। তার প্রভাবাধীন এলাকা ছিল বেলুচিস্তান এবং তার দলের নাম পাকিস্তান জমিয়াতে উলামা-ই ইসলাম।

প্রাথমিক পদক্ষেপ

তালেবানরা সব সময় বিভিন্ন মুজাহিদ গোষ্ঠির ক্ষমতার লড়াইয়ের প্রতি ছিল বীতশ্রদ্ধ। তালেবানদের প্রথম দিকে প্রধান কাজ ছিল মোজাহিদদের কিছু অন্যায় পদক্ষেপের প্রতিরোধ। তারা ছিল নারী ধর্ষণ, আফিম ব্যবসা, চাঁদাবাজী ও লুণ্ঠন বিরোধী। মোজাহিদদের কিছু কিছু জুলুম প্রতিরোধ করে তারা সর্বপ্রথম জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ ও সহানুভূতি অর্জন করেন।

১৯৯৪ খৃষ্টাব্দের প্রথম দিকে তালেবানরা আফিম ব্যবসা বন্ধ করার উদ্দেশ্যে এই সমস্ত ব্যবসার পৃষ্ঠপোষকতাকারী কয়েকটি সীমান্ত চৌকি আক্রমণ করেন এবং আফিম ব্যবসায়ীদেরকে হ্যস্তন্যস্ত করেন।

বাণিজ্য কাফেলা মুক্তকরণ

১৯৯৪ খৃষ্টাব্দের শুরুতে পাকিস্তান হতে একটি মালবাহী ট্রাক বহর (কনভয়) কান্দাহার হয়ে হেরাতের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। এ কনভয়ের মালিক ছিলেন পাকিস্তানের প্রভাবশালী ব্যবসায়ীবৃন্দ। কান্দাহারের উত্তর দিকে তালেবান-প্রাক মুজাহিদগণ এ কনভয়টি আটক করেন। কনভয়ের মালিকগণ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে কনভয়টি উদ্ধারের চেষ্টা করেন।

কান্দাহারের সরকারী শাসক ছিলেন অত্যন্ত দুর্বল এবং দুর্নীতিপরায়ন। তিনি বাণিজ্য কাফেলাকে কোন সাহায্য করতে সমর্থ হননি।

কনভয়ের মালিকগণ অগত্যা কান্দাহারের মাদ্রাসা ছাত্রদের দ্বারস্থ হয়। এ মাদ্রাসাগুলো ছিল জমিয়াত-ই ইসলামী দল প্রভাবিত। মাদ্রাসার ২ হাজার ছাত্র কান্দাহারের পৌঁছে বাণিজ্য কনভয়টি মুক্ত করে রাস্তায় চালু করে দেন।

তালেবানগণ আরো খবর পান যে, কান্দাহারের সরকারী শাসক তার হেরেমে হেরাতের দু'টি মেয়েকে আটকিয়ে রেখে তাদের শ্লীলতাহানি করছে। তারা মেয়ে দু'টিকে উদ্ধার করে। এতে তাদের শক্তির প্রতি জনগণের শ্রদ্ধা সৃষ্টি হয়।

বাণিজ্য কাফেলা উদ্ধারের পর তালেবানদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি হয়। তারা অস্ত্র সংগ্রহে আগ্রহী হয়। অর্থ এবং অস্ত্র পেয়ে তারা লুটেরা এবং সন্ত্রাসী না হয়ে আল্লাহর সৈনিকে পরিণত হয়েছে। ১৯৯৪ সনের অক্টোবর-নভেম্বরে বার্ষিক পরীক্ষা এবং সনদ বিতরণী উৎসব উপলক্ষে একত্রিত হওয়ার পর সাংগঠনিক শক্তি হিসেবে তালিবান আত্মপ্রকাশ করে।

পাকিস্তানী সাহায্য

পাকিস্তান সরকারের নীতি ছিল মুজাহেদীন দলের একটিকে সমর্থন না করে অনেকগুলোকেই কিছু কিছু অস্ত্র দেয়া। এতে তাদের উপর প্রভাব থাকে এবং তাদের বিবাদের সময় মধ্যস্থতা করতে পারা যায়। ইতিপূর্বে কয়েক ডজন মুজাহিদ গ্রুপকে তারা অস্ত্র দিয়েছে।

তালেবানদেরকে অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করা বিচিত্র কিছু নয় এবং এটা ছিল তাদের সরকারী নীতিরই একটি অংশ। আফগানিস্তানের কোন মুজাহিদ গ্রুপকে অর্থ সাহায্য করতে পাকিস্তান সীমান্তের শান্তি রক্ষায় নিয়োজিত কর্তৃপক্ষের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি প্রয়োজন ছিল না।

অনুমান করা হয় যে, পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা তাদেরকে কিছু কালাসনিকভ রাইফেল বিভিন্ন ধরনের হালকা অস্ত্র সরবরাহ করে। এ ছাড়া শিক্ষা দেয় যুদ্ধ কৌশল এবং প্রদান করে বিভিন্ন স্তরের প্রশিক্ষণ।

অস্ত্র-শস্ত্র

তালেবানগণ কিছু সংখ্যক কালাসানিকভ রাইফেল, চীনা বি,এম,আই মিসাইল নিয়ে অক্টোবর ১৯৯৪ সনে তাদের অভিযান শুরু করেন। প্রথম বছর অক্টোবর মাসে (১৯৯৪) তারা কান্দাহার দখল করেন। আর মাত্র দু'বছরের মধ্যে তারা কামান, বন্দুক, ট্যাংক এমনকি জঙ্গি বিমান চালনাও শিখেছেন।

উপমহাদেশের মিলিটারী একাডেমীগুলোতে বুনিয়াদী সামরিক প্রশিক্ষণ ও ঊর্ধতন কর্মকর্তাদের অধীনে শিক্ষানবিশী কাল শেষ করতেই লেগে যায় চার বছর। তালেবানরা কোন মিলিটারী একাডেমীতে নিয়মিত প্রশিক্ষণ পাননি। ওস্তাদের নিকট সামরিক প্রশিক্ষণ নিয়ে দু'বছরের মধ্যে একটি দেশের ক্ষমতা দখল করা অত্যন্ত বিস্ময়কর ঘটনা।

সার্বজনীনতা

রব্বানী, দোস্তাম ও হেকমতিয়ারের ক্ষমতার ভিত্তি গোত্রগত। তালেবানগণ আফগানিস্তানের সকল গোত্রের প্রতিনিধিদের দাবিদার। হেকমতিয়ার পুশতুন।

মোল্লা ওমর হেকমতিয়ারের ক্ষমতার ভিত আয়ত্ব করে নিয়েছেন। তিনি নিজেও পুশতুন। তবে আব্দুর রশিদ দোস্তামের এবং বুরহান উদ্দিন রব্বানীর নিজস্ব জাতিগত এলাকায় তালিবান প্রভাব বিস্তাব করা অধিকতর কঠিন হবে।

তালেবানগণ যে গোঁড়া এবং মৌলবাদী ইসলামপন্থী তাতে কোন সন্দেহ নেই। তালেবানদের মধ্যে গোত্রীয় দৃষ্টিভঙ্গি নেই। যদিও তালেবানদের অধিকাংশই পুশতুন গোত্রভুক্ত, তাদের মধ্যে সব গোত্রেরই ছাত্র রয়েছে।

দুরাহী দখল

তালিবান ১৯৯৪ সনে কান্দাহারের নিকটবর্তী ছোট শহর দূরাহী আক্রমণ করে দখল নিয়ে নিজস্ব ধর্মীয় প্রশাসন কায়েম করেন। দূরাহী একটি ক্ষুদ্র বাজারের মত শহর বিধায় বিয়ষটি কর্তৃপক্ষ তেমন আমল দেননি। দূরাহী শহরে নৈতিক প্রশাসনের মাধ্যমে তারা অন্যান্য মাদ্রাসা ছাত্রদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

মোল্লা উমর

কান্দাহার প্রদেশের মেওওয়ান্দ জেলার দরিদ্র কৃষক সন্তান মোহম্মদ উমর (জন্ম ১৯৬০ খৃঃ)। আফগানিস্তান হতে রাশিয়ান সৈন্য অপসারণের পর যুদ্ধক্ষেত্র হতে মুহাম্মদ উমর আসেন নিজ গ্রামের কুরানিক স্কুলে। দেশ পরিচালনা, সেনাবাহিনীর চাকরী কোন কিছুরই লোভ ছিল না তার।

মস্কো সমর্থক নজিবুল্লাহ সরকারের পতনের পর নীরবে মুজাহেদীনদের অধৈয, আত্মঘাতি যুদ্ধবিগ্রহ, নৈরাজ্য, হত্যা, লুণ্ঠন অনেক কিছুই দেখেছে এবং শুনেছে মুহাম্মদ উমর। মুজাহিদীন সাথীগণ তাকে কিছু একটা করতে বহু চাপ দিয়েছেন।

জেহাদে চার বার আহত এবং একটি খোঁড়া পা নিয়ে মুহাম্মদ উমর মুজাহেদীন নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে কিছু বলা বা অস্ত্রধারণ করা তার কর্তব্য মনে করেননি। তার একটি চোখ যুদ্ধকালে নষ্ট হয়ে যায়। চোখের পাতা সেলাই করে চোখটি বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। এক চক্ষু এবং এক পা নিয়ে একজন অল্প শিক্ষিত ব্যক্তির কতটুকুইবা করার আছে?

মোল্লা উমর ছিলেন একজন তালিবান স্কুল শিক্ষক। শিক্ষক হলেও নিজেকে তিনি তালিবান বলেই পরিচয় দিয়ে থাকেন। অন্যেরা মনে করে এটা তার বিনয়। তিনি নিজেকে তালিবান বলেই বিশ্বাস করেন।

মুজাহেদীনগণ বিভিন্ন বিষয়, অনেক ক্ষেত্রে নীতিগত বিষয় নিয়ে এপ্রিল, ১৯৯২, কম্যুনিস্ট সরকার পতনের পর নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করছেন। কিন্তু ব্যক্তিগত তুচ্ছ বিষয় নিয়েও তারা ট্যাঙ্ক যুদ্ধে লিপ্ত হবেন এটা ছিল অনেকের নিকট অকল্পনীয়।

কান্দাহারের দু'জন মিলিটারী কমান্ডার ট্যাঙ্ক যুদ্ধে লিপ্ত হন একটি সুন্দর মেয়েকে কেন্দ্র করে (আন্তর্জাতিক সাপ্তাহিক টাইম, মার্চ, ৩১, ১৯৯৭ খৃঃ)। মোল্লা উমরের ভক্তরা বিষয়টি মোল্লাকে জানিয়ে জিজ্ঞাসা করে—'একটি মেয়েকে নিয়ে দু'জন মুজাহেদিন কমান্ডার ট্যাঙ্ক যুদ্ধে লিপ্ত হতে পারে। আর আপনি আড়াই কোটি আফগানীর স্বার্থ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে যুদ্ধ করাও জরুরী মনে করেন না? এটা কি আপনার ঈমানী দায়িত্ব নয়?'

শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে, একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে অস্ত্র ধারণ করার মতো সঙ্গী পেলে মোল্লা উমর পুনরায় অস্ত্র ধরতে রাজী হলেন। পার্শ্ববর্তী কুরানিক মাদ্রাসার হাজার হাজার ছাত্র মোল্লাহ উমরের এক শর্তে রাজী হয়ে তার সঙ্গে নতুন জিহাদে দেয়ার শপথ নিলো। সহজ সরল কম বুঝওয়ালা তরুণ ছাত্রদেরকে নিয়েই মোল্লা উমর গঠন করলেন তালিবান বাহিনী।

তালিবান বাহিনীর বর্তমান প্রধান হলেন মোল্লা মোহাম্মদ উমর এবং প্রধান সেনাপতি হলেন নূর হাকমল। তালেবানগণ মনে করেন, মোল্লা মোহাম্মদ উমর এবং মোল্লা মোহাম্মদ রব্বী (অন্য আর একজন নেতা) সাধারণতঃ ভুল সিদ্ধান্ত নেন না।

তালেবানদের মধ্যে আত্মপ্রচারের কোন মোহ নেই। ১৯৯৬ সনে কোন প্রকার পাবলিসিটি ছাড়াই মোল্লা মোহাম্মদ উমর তালেবানদের আমীরুল মুমেনীন হিসেবে নির্বাচিত হন। তার কোন ছবি পত্র-পত্রিকাতে মুদ্রিত হয়নি। কোন বিদেশী সাংবাদিককে সাক্ষাৎকার দিয়ে পরিচিত হওয়ার আগ্রহ তাঁর মধ্যে পরিলক্ষিত হয়নি।

২১

তালেবানদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার

সেপ্টেম্বর ১৯৯৫ হতে বছরাধিক কাল হেরাতের শাসনভার তালেবানদের হাতে ছিল। অশান্ত আফগানিস্তানের চার ভাগের তিন ভাগ স্থানে তালেবানরা শাসন ও কর্তৃত্ব কায়েম করেছে। এ সময় তাদের বিরুদ্ধে তেমন কোন বদনাম শোনা যায়নি।

তালেবানগণ ১৯৯৬-এর ২৭শে সেপ্টেম্বর কাবুল দখল করার পর সমগ্র পাশ্চাত্য দুনিয়া এমনকি মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের ইসলাম বিরোধী শিবিরগুলো একজোট হয়ে তালেবানদের বিরুদ্ধে অপপ্রচারে লেগেছে। তারা তালেবানদের তিল পরিমাণ ত্রুটিকে আধুনিক প্রচার মাধ্যমে পাহাড়ে পরিণত করে দুনিয়ার মানুষের ঘৃণা সৃষ্টির প্রাণান্তকর অপপ্রয়াসে লিপ্ত আছে। যেকোন তুচ্ছ ঘটনাকেও ইসলাম বিরোধী প্রচার মাধ্যমসমূহ ফুলিয়ে-ফাপিয়ে তালেবানদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করে যাচ্ছে।

টিয়া পাখী পোষা, তাস খেলা, দাবা খেলা, ঘুড়ি উড়ানো নিষিদ্ধকরণ

তালেবানগণ টিয়া পাখী পালন, দাবা খেলা, তাস খেলা এবং ঘুড়ি উড়ানো নিষিদ্ধ করেছে এমন খবরও বহুল প্রচারিত এবং ইহুদী মালিকানাধীন সংবাদ মাধ্যম প্রচার করছে (সাপ্তাহিক নিউজউইক, অক্টোবর ১৪, ১৯৯৬ পৃঃ ১৩)। মনে হয় তাদের পত্র-পত্রিকায় লেখার মতো এরচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অভাব ঘটেছে।

ঘুড়ি উড়াতে গিয়ে বহু শিশু ছাদের উপর থেকে পড়ে মৃত্যুবরণ করে। যেখানে এমনটি ঘটে সেখানে অন্ততঃ কিছু দিনের জন্য হলেও তা বন্ধ রাখা হয়। নিউজউইক আরো লিখেছে—'তালেবানগণ সিনেমা দেখা, গান বাজনা, ধূমপান নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে।'

যাদের করার মতো কোন কাজ থাকে, তারা এ ধরনের আকামে সময় নষ্ট করতে পারে না।

মুসলিম দেশের হাক্কানী উলামায়ে কেরাম ধূমপান, দাবা খেলা, গান-বাজনা ইত্যাদি হালাল মনে করেন না। টেলিভিশনে সিনেমা দেখা আমাদের বাংলাদেশের

ন্যায় ধর্মনিরপেক্ষ পাশ্চাত্যঘেষা বহু মুসলিম উলামায়ে কেরামের মতে হারাম। অত্যন্ত উদারপন্থী উলামাদের মতেও বর্তমান পদ্ধতির ডিস এন্টিনার মাধ্যমে টেলিভিশনে প্রচারিত নোংরা অনুষ্ঠান ও সিনেমা দেখা অবশ্যই হারাম।

সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জনৈক পরিচালক কুড়াল দিয়ে তার বাড়ীর রেডিওগুলো ভেঙ্গেছেন। তার তিন ছেলে হাফেজ। অন্য কাউকে দিয়ে দিলেন না কেন জিজ্ঞাসা করায় তিনি আমাকে বলেছেন যে—'যা আমার ছেলে-মেয়ের জন্য খারাপ, তা আমি অন্যকে দিতে পারি না।'

বাংলাদেশ সরকারের একজন যুগ্ম সচিবকে জানি যিনি বাড়ীর টেলিভিশন সরিয়ে দিয়েছেন। টেলিভিশনে তো কোরআন তেলাওয়াত হয়, আযান দেয়া হয়, ইসলামী প্রোগ্রাম হয় বলায় তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন—'যদি কোন গাভীর এক বাট হতে দুধ, আর এক বাট হতে রক্ত, অন্য বাট হতে পুঁজ এবং অপর বাট হতে মধু বের হয়, আপনি এমন গাভীর দুধ খাবেন কি ?'

ঐকান্তিকতার সঙ্গে তাবলীগের তিন চিল্লা দিলে আমাদের দেশের বয়স্ক ইংরেজী শিক্ষিতদের যদি এরূপ পরিবর্তন হয়, জীবন-মরণ জেহাদে গেলে ২০ - ৩০ বছরের কোটার কিশোর যুবক মাদ্রাসা ছাত্রদের মানসিক পরিবর্তন কতটুকু হবে, তা ভেবে দেখতে হয়।

তালেবানগণ যা করে তার অপপ্রচার হয় বেশী। তালেবানগণ অতি উৎসাহের বশে ধুমপান নিষিদ্ধ করেছে। কিন্তু একজন ধূমপায়ীর গায়ে হাত তুলেছে বলে কোন পাশ্চাত্য প্রচার মাধ্যম খবর দিতে পারেনি। কাবুলের যেকোন দোকানে প্রকাশ্যভাবে সিগারেট বিক্রি হয়, তবে তালেবানদের ঘোষণার ফলে ধূমপায়ীরা একটু সংযত হয়েছে।

তালিবান নীতি

তালেবানদের বয়স ২০-৩০-এর কোটায়। তাদের সরকার এখনো সুপ্রতিষ্ঠিত এবং সুদৃঢ় হতে পারেনি। তালেবানদের সরকার প্রধান যে কে তা ঘোষিত হয়েছে কাবুল দখলের অনেক পরে। তাদের নেতা মোহাম্মদ উমর-এটা সকলের জানা। তার স্থান অনেকটা আয়াতুল্লাহ খোমেনীর মতো।

দুনিয়ার কোন তথাকথিত সভ্য দেশে সরকার বা সরকার প্রধান না থাকলে এবং তরুণদের হাতে অস্ত্র থাকলে তারা কি ধরনের লুট, হত্যা, রাহাজানি, ধর্ষণ ইত্যাদিতে লিপ্ত হবে, তা শুধু কল্পনা করে দেখতে হয়।

তালেবানরা কি করে এতো অল্প সময়ে অনেকটা বিনা বাধায় আফগানিস্তানের তিন চতুর্থাংশে তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করলো ? তালেবানরা

জোর করে এসব এলাকা দখল করেননি। স্থানীয় লোকেরা তাদের স্বাগত জানিয়েছেন। তাদের বিরোধী অস্ত্রধারীরা জনতার রুদ্ররোষে পতিত হওয়ার ভয়ে তালেবানদের পথ ছেড়ে তাদের জন্য নিরাপদ স্থানে চলে গেছে।

কোন এলাকা দখলের পরই তালেবানগণ সেখানে একটা মজলিসে শূরা প্রতিষ্ঠিত করেন। এই শূরাতে তালেবানদের ছাড়া রয়েছে স্থানীয় নেতৃবৃন্দ এবং গোত্রের প্রধানগণ। যারা যুদ্ধের পর তালেবানদের নিকট আত্মসমর্পণ করে, তারাও এ শূরার অন্তর্ভুক্ত হয়। এ শূরাই এখন এলাকার শাসন পরিচালনা করে।

২২

তালিবান প্রশাসন ও শান্তি-শৃঙ্খলা

শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপন

১৯৭৯ সন থেকে ১৯৯৬ সন পর্যন্ত ১৭ বছর কাবুলের জনগণ নিরুদ্বেগে নিদ্রা যেতে পারেনি। যেকোন সময় তাদের উপর রকেট সেল, গোলাগুলী বৃষ্টির মতো বর্ষিত হতো।

১৯৯২ সনে কাবুল কমিউনিস্ট শাসন থেকে মুক্ত হওয়ার পর থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত ৩০ হাজার মানুষ কাবুলে নিহত হয়েছে। এই হত্যাকাণ্ডের ধারা তালিবান কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বিদূরিত হয়েছে। কমিউনিস্ট শাসনামলে নিহত হয়েছে কমপক্ষে ১২ লক্ষ লোক। সে সময় আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের কর্মকর্তাদের কাবুলে থাকতে ভয়-ভীতি ছিল না।

তালেবানগণ কর্তৃক কাবুল দখলের পর কাবুল এয়ারপোর্ট বেসরকারী বিমান চলাচলের জন্য খুলে দেয়া হয়। তাদের কাবুলে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার পূর্বে এগার মাস পর্যন্ত সেখানে বিমান উঠা-নামা বন্ধ ছিল।

তালিবান বাহিনী ক্ষমতায় আসার পর আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো ভয়ে ও ঘৃণায় কাবুল ত্যাগ করেছে। এখন কাবুলে আন্তর্জাতিক সংস্থার লোক নেই বললেই চলে।

তালিবান কর্তৃক কাবুল মুক্ত হবার পর এখন অন্ততঃ মানুষ রকেট, মিসাইল ও গোলাগুলীর ভীতিমুক্ত হয়ে শান্তিতে নিদ্রা যেতে পারে। তালেবানদের নিয়ন্ত্রিত এলাকায় আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক, রাস্তা-ঘাট নিরাপদ। কাবুলের ৭০-৮০% বিধ্বস্ত হয় ১৯৯২-৯৫ সময়কালে (এএফপি)।

কাবুল নগরীতে বিদ্যুৎ সরবরাহ ৩ বছর পর্যন্ত ছিল অনিয়মিত এবং শহরের অধিকাংশ এলাকায় বিরাজ করতো সম্পূর্ণ অন্ধকার। সন্ধ্যার পর কাবুল নগরী ছিল অনেকটা ভূতুড়ে শহরের মতো।

কর্মকর্তা/কর্মচারীরা নিজের ইচ্ছামতো চলতো। নানা অজুহাতে বৈদ্যুতিক সংযোগ ব্যাহত হতো। তালেবানগণ কর্তৃক কাবুল অধিকারের পর এক সপ্তাহের মধ্যে পুরো কাবুল শহরে বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়।

তালেবানদের ক্ষমতা দখলের পূর্বে রাস্তায় কয়েক মাইল পরপরই থাকতো চাঁদাবাজদের টোল আদায়ের ফাঁড়ি। বুলডাক থেকে কান্দাহার পর্যন্ত ৩ ঘন্টার মটর ভ্রমণ পথ। এই ৩ ঘন্টা চলার পথে ছিল ৪২টি চাঁদা আদায় কেন্দ্র।

(দি ইকনমিস্ট, লন্ডন ; অক্টোবর ৫, ১৯৯৬)।

তালেবানদের কাবুল দখলের পূর্বে রাজধানী সরকারের পূর্ণ কর্তৃত্ব ছিল কাবুলের বাইরে আফগানিস্তানের মাত্র ১৬ মাইল রাজপথের উপর। আফগানিস্তানের ৩০টি বিমান বন্দরের মধ্যে মাত্র দশটিতে কেন্দ্রীয় সরকারের সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে ছিল (এ. এফ. পি)।

তালেবানদের হাতে কাবুল শহরের কোন একটি মানুষ গুরুতর আহত হয়নি (টাইম ইন্টারন্যাশনাল, অক্টোবর ১৪, ১৯৯৬)। নজিবুল্লাহ, তার ভাই, দুই দেহরক্ষী ভিন্ন অন্য কোন মানুষের মৃত্যু বা অঙ্গহানী হয়নি। রাজধানী কাবুল ভিন্ন তালেবানদের হাতে অন্য কোন একটি শহর পতনের পরও সেখানে বিজয়োত্তর কোনরূপ অপরাধ সংঘটিত হয়নি। সহিংসতা হয়নি। সাধারণ মানুষের উপর কোন জুলুম হয়নি। কোন দ্রব্যসামগ্রী তালেবানদের প্রয়োজনে লুণ্ঠিত হয়নি, যা হয়ে থাকে আধুনিক বিশ্বের ইতিহাসে যে কোন সময়ে বিজয়ীদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার পর।

বসনীয়া, গ্রজনী ও ফিলিস্তিনে যা ঘটেছে, তার শতকরা এক ভাগও তালিবান অধিকৃত আফগানিস্তানে সংঘটিত হয়নি।

শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুফল কাবুলের বাজার দ্রব্য সামগ্রীতে প্রতিদিনই প্রতিফলিত হয়ে উঠছে। বাজারে জন সমাগম হচ্ছে। জিনিসপত্রের বেচা-কেনা এখন অনেক বেড়েছে। অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহে একটি রুটির মূল্য ছিল ১০,০০০ আফগানিয়া (৭ সেন্ট), ২য় সপ্তাহে তা নেমে দাঁড়িয়েছে ৫০০ আফগানিয়ায় (নিউজ উইক, অক্টোবর, ১৪, ১৯৯৬, পৃঃ ১৪)।

তালেবানদের জনপ্রিয়তার কারণ হলো তাদের ন্যায় বিচার। তারা যেখানেই গমন করেন, ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করেন। কতকগুলো শাস্তি তারা প্রকাশ্যে দিয়ে

থাকেন। বিবাহিত ব্যভিচারীদের বিরুদ্ধে শাস্তির আইন করা হয়েছে, কিন্তু কোন শহরে তা বাস্তবায়নের প্রয়োজন পড়েনি। চুরির জন্য হাত কাটার বিধান করা হয়েছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত কারো হাত কাটার আদেশ হয়নি।

এক বছর পূর্বে তালেবানদের হাতে হেরাতের পতন হয়েছে। দু'বছর আগে ১৯৯৪ সনের অক্টোবর মাসে তালেবানগণ কান্দাহার দখল করেন। কিন্তু কোন ইসলামী বিধান অপপ্রয়োগের খবর পাওয়া যায়নি। ব্যভিচারের শাস্তি হত্যা এবং চুরির শাস্তি হাত কাটার বিধান সৌদি আরবে কয়েক যুগ থেকে চলে আসছে। কিন্তু মৌলবাদের অপবাদ দিয়ে এভাবে তাদেরকে কলংকিত করা হয় না।

২৩

তালিবান ও মানবাধিকার

পাশ্চাত্যের মানুষ তালিবান নিয়ন্ত্রিত আফগানিস্তানে শাশ্বত মানবাধিকার লংঘিত হওয়ায় ক্ষুব্ধ। এমনেস্টি ইন্টারন্যাশনালকে ১৯৮২ সনের পর আফগানিস্তানে প্রবেশ পর্যন্ত করতে দেয়া হয়নি। তালিবান কর্তৃক কাবুল অধিকারের পর এমনেস্টি ইন্টারন্যশনাল কাবুলে প্রবেশ করার অধিকার পায়। এসেই যোগ দেন তালেবানদের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের মহড়ায়।

তালেবানগণ কাবুল বা অন্য কোন প্রাদেশিক শহরের জনতাকে মেরে পিটিয়ে ঘরছাড়া করেনি, বরং তাদের নেতা মোল্লা মোহাম্মদ উমর জনসাধারণকে নিজ নিজ শহরে থাকতে অনুরোধ করেছেন।

(সাপ্তাহিক নিউজ ইউক, অক্টোবর ১৪, ১৯৯৬)

তালেবানদের আগমনের পূর্বে যে কাবুল নগরীতে কোন শান্তি ছিল না সে কাবুল নগরী এখন শান্ত। জনগণের মধ্যে বিরাজ করছে প্রশান্তি। তবু পাশ্চাত্যের তথাকথিত মানবাধিকারীদের নিকট কাবুল বসবাসের অনুপযুক্ত। কারণ তালেবানদের হৃদয়ে আছে ইসলামী চেতনা দেহে ইসলামী পোশাক।

মুসলিম দেশে পাশ্চাত্যের যুবক-যুবতী, বুড়ো-বুড়িরা পর্যন্ত উরু দেখিয়ে চলাফেরা করে। ফ্রান্সের মতো সভ্য দেশে তারা মুসলিম শিশু ও স্কুলছাত্রী মেয়েদের মাথায় রুমাল দেয়া সহ্য করতে পারে না। এটা হলো তাদের দেশে মানবাধিকার ও সহনশীলতার নমুনা।

২৭শে সেপ্টেম্বর ১৯৯৬ কাবুল পতনের পর তিনটি বেপর্দা মেয়েকে তালেবানরা লাঠি দিয়ে ঠেলা দিয়েছেন। ইসলাম বিরোধী পত্রিকাগুলোতে খবর বের হয়েছে, মেয়েদের লাঠি পেটা করেছে। সেরূপ মেয়েদের সংখ্যা সারা কাবুলে হলো মাত্র ৩ জন।

তালেবানরা মেয়েদের শালীন পোশাক পরিধান করতে নির্দেশ দিয়েছেন। সেখানকার মহিলারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে কেউ চাদর ব্যবহার করছে, কেউ ব্যবহার করছে বোরকা। যদিও ওদেরকে শান্তি-শৃঙ্খলাজনিত কারণে বাইরে আসতে নিষেধ করা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে কাবুল রেডিও থেকে এটাও ঘোষণা করা হয়েছে যে, কোন কর্মজীবী মহিলাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়নি।

আরো ঘোষণা করা হয়েছে যে, মহিলাদের মধ্যে যারা অফিস করতে পারছেন না, তাদেরকেও বেতন দেয়া হবে এবং বেতন বাড়ীতে পৌঁছে দেয়া হবে। ইসলামের দুশমনদের নিকট ধর্ষণ বা হত্যা মানবতা বিরোধী কাজ নয়, কিন্তু নারীদের ইজ্জত ও নিরাপত্তা রক্ষা, সম্মানজনক দূরত্ব রক্ষা করা তাদের নিকট মানবতা বিরোধী কাজ।

আফগানিস্তানে নারীদের অধিকারের কথা বলে পাশ্চাত্যের সভ্য মানুষ। নারীদের প্রতি পাশ্চাত্যের সভ্য মানুষদের দৃষ্টিভঙ্গি কি ? পরিবারের আয় বৃদ্ধির জন্যে বিবাহিত ভদ্র মহিলারাও স্বামী ভিন্ন অন্যদেরকে দেহ দান করে। পড়ালেখার খরচ আদায় করার জন্য ১৮% কন্যাকে তাদের পিতাকে দেহ দান করতে হয়।

আফগানিস্তানের মহিলা স্বাক্ষরতার হার হলো ৪% (নিউজউইক সেপ্টেম্বর ৩০, ১৯৯৬)। এই শিক্ষিত ৪% মহিলার ১%ও সরকারী এবং বেসরকারি চাকরিতে নেই। পাশ্চাত্য দুনিয়ার উদারতা এবং দরদ ৯৬% আফগান মহিলাদের জন্য নয়। তাদের দৃষ্টি হলো সমগ্র জনসংখ্যার ০.৪% উগ্রবাদী ও প্রতি ২৫০০ জন আফগানবাসীর মধ্যে একজন পাশ্চাত্য ঘেঁষা মহিলার জন্য।

এই স্বল্পসংখ্যক মহিলাদের স্বার্থের কথা চিন্তা করে ইউনিসেফ, সেভ দি চিলড্রেন, অন্যান্য সাহায্য সংস্থার অনেকেই তাদের সমস্ত সাহায্য বন্ধ করে দিয়েছে। পাশ্চাত্য দুনিয়ার সাহায্য সংস্থার লক্ষ্য আফগানিস্তানের দুঃস্থ মানবতা নয়, তাদের উদ্দেশ্য হলো বিভিন্নভাবে তালেবানদের ভাবমূর্তিকে নষ্ট করা এবং তাদেরকে ঘায়েল করা।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ১৯৯৫ সনের ৩৪৭ পৃষ্ঠার অপরাধ পরিসংখ্যান (এফ বিআই কর্তৃক প্রকাশিত) থেকে দেখা যায় যে, যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৯৫ সনে ভায়োলেন্স, অপরাধ হয়েছে প্রতি ১৮ সেকেন্ডে একটি, হত্যা সংঘটিত হয়েছে মিনিটে একটি এবং নারী ধর্ষণ প্রতি ৫ মিনিটে একটি (দৈনিক ইনডিপেনডেন্ট, ঢাকা, অক্টোবর ১৪, ১৯৯৬)। নারী অধিকার যে পাশ্চাত্যে এই মানের, তারা নারী অধিকার হরণের অজুহাতে তালেবানদের ভাবমূর্তি বিনষ্ট করার অপচেষ্টা করছে।

দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ আনবিক শক্তি যুক্তরাষ্ট্র বা যুক্তরাজ্যের বৃহৎনগরী নিউইয়র্ক বা লন্ডনের প্রকাশ্য রাস্তায় নিত্য নৈমিত্তিক যে সকল ঘটনা ঘটে, তার একটিও তালিবান অধ্যুষিত এলাকায় ঘটেনি।

ডঃ নজিবুল্লাহর ফাঁসি

১৯৯২ খৃষ্টাব্দের ১৫ই এপ্রিল আফগান মুজাহিদদের হাতে কাবুলের পতনের পর ডঃ নজিবুল্লাহ কাবুলস্থ জাতিসংঘ ভবনে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ১৯৯২ খৃষ্টাব্দের ১৬ই এপ্রিল থেকে ১৯৯৬-এর ২৭শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চার বছর পাঁচ মাস তিনি জাতিসংঘ ভবনে অবস্থান করে আসছিলেন। ২৭শে সেপ্টেম্বর ১৯৯৬ তালিবান বাহিনীর নিকট কাবুলের পতনের পর ২৮-০৯-১৯৯৬ তালিবানগণ ডঃ নজিবুল্লাহ এবং তার ভাই শাহপুর আহমদ জাঁইকে প্রেসিডেন্ট প্রাসাদের সম্মুখে আরিয়ানা স্কোয়ারের একটি ট্রাফিক লাইট পোস্টের সাথে ঝুলিয়ে ফাঁসি দেন এবং তাদের কৃত অপকর্মের প্রায়শ্চিত্ত দেখে মজলুম কাবুলবাসী যাতে তৃপ্ত হয়, সেজন্য তাদের লাশ একদিন ঝুলিয়ে রাখা হয়।

কাবুলের প্রধান সড়ক আরিয়ানা স্কোয়ারে হাজর হাজার আফগান বিদেশী প্রভুদের পদলেহী ডঃ নজিবুল্লাহ ও তার সহযোগীর ফাঁসিতে ঝুলন্ত অবস্থা অবলোকন করেন।

তালিবান কেন্দ্রীয় পরিষদ এবং ধর্মীয় নেতাগণ ডঃ নজিবুল্লাহর বিরুদ্ধে আদালতে যে সমস্ত অভিযোগ আনয়ণ করেন, তার মধ্যে ছিল খুন, জনগণের অধিকার হরণ এবং জনগণের ইসলামী চেতনা-বিরোধী কমিউনিস্ট মানস প্রবর্তন। উল্লেখ্য, কমিউনিস্ট শাসনকালে আফগানিস্তানে ১২ লক্ষ হতে ১৫ লক্ষ মুসলিম নিহত হয়।

তালেবানগণ যে কট্টর ইসলামপন্থী তা জাতিসংঘের জানা ছিল। ১৯৯২ খৃঃ থেকে ডঃ নজিবুল্লাহ জাতিসংঘ ভবনে তাদের অতিথি ছিলেন। ইচ্ছা থাকলে জাতিসংঘের কর্মকর্তাগণ যেকোন সময় তাঁকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিতে পারতেন।

তরুণ তালেবানগণ যে নজিবুল্লাহকে নিয়ে ফাঁসি দিতে পারেন এটা অনুমান করা জাতিসংঘ কর্তৃপক্ষের জন্য কষ্টকর ছিল না। তালেবানগণ যে ইরানের চেয়েও কঠোর মনোভাবাপন্ন, তা ১৯৯৫ সনের সেপ্টেম্বর মাসে তালিবান

বাহিনী কর্তৃক হেরাত দখলের পরেই ছিল সুস্পষ্ট। ডঃ নজিবুল্লাহকে যখন জাতিসংঘের ভবন থেকে বের করা হয়, তখন জাতিসংঘের দপ্তরের নিরাপত্তা প্রহরী বা অপর কেউ মৌখিকভাবে অথবা দৈহিকভাবে বাধা দিয়েছিলেন বা ছাড়ার অনুরোধ করেছিলেন এমন কোন খবরও পত্র-পত্রিকায় দেখা যায়নি। ডঃ নজিবুল্লাহ ছিলেন প্রকৃতিগতভাবে নিষ্ঠুর চরিত্রের। তাকে যারা জানে, তার প্রতি সহানুভূতি সেরূপ কম লোকেরেই ছিল।

কাবুলে জাতিসংঘ দূত মিঃ নরবার্ট হিলকে উপরোক্ত বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি কোন মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকেন।

নজিবুল্লাহর দাফন

সমগ্র দুনিয়ার পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে যে, তালেবানগণ ডঃ নজিবুল্লাহকে কাবুলের আরিয়ানা স্কোয়ারে প্রকাশ্যে ফাঁসি দিয়েও ক্ষান্ত হয়নি, অধিকন্তু তারা নির্দেশ জারি করে যে, ডঃ নজিবুল্লাহর মৃতদেহ সমাহিত করা যাবে না।

আসল সত্য এই যে, ডঃ নজিবুল্লাহকে ফাঁসি দেয়া হয়েছে ২৮-০৯-১৯৯৬ তারিখ শনিবার। তাকে তিন দিন ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলিয়ে রাখার খবরও পাশ্চাত্য খবর মাধ্যমের বানোয়াট। ২৯-০৯-১৯৯৬ তারিখে ডঃ নজিবুল্লাহ এবং তার ভাই শাহপুর আহমদ জাঁই-এর মৃতদেহ দাফনের জন্যে আহমদ-জাঁই গোত্র প্রধানের নিকট হস্তান্তর করা হয়। ডঃ নজিবুল্লাহ ছিলেন আহমদ জাঁই গোত্রভুক্ত। ডঃ নজিবুল্লাহ ভাতৃদ্বয়কে পাকটিয়া প্রদেশে তার নিজস্ব শহর গারদেশ নগরে কবর দেয়া হয়।

ডঃ নজিবুল্লাহ অবশ্যই মানুষ ছিলেন। তার ফাঁসিতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শোকাভিভূত। নজিবুল্লাহ এবং তার ভাই শাহপুর আহমদ জাঁই এবং তাদের দেহরক্ষী হাবশীর মৃত্যুতে মানবাধিকার লংঘিত হয়েছে সত্য, কিন্তু নজিবুল্লাহর কারণে যে আফগানিস্তানের ১২-১৫ লক্ষ লোক নিহত হলো, মনে হয় পাশ্চাত্যের মানবাধিকারের মুখোশধারীদের দৃষ্টিতে তারা মানুষ ছিল না। কারণ তারা ছিল মুসলিম এবং ইসলামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ।

২৪

আফগান ভুমিতে সাম্রাজ্যবাদী খেলা

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপে শুরু হয় উন্নয়নের জাগরণ। এশিয়ার অধিকাংশ রাষ্ট্রই ইউরোপিয়ান রাষ্ট্রসমূহের দাসত্ব ভারতের ন্যায় বরণ করে নিতে অথবা আফগানিস্তানের ন্যায় তাদের সার্বভৌমত্ব বিসর্জ্জন দিয়ে আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে স্বাধীনতা বজায় রাখতে বাধ্য হয়। আফগানিস্তানের অবস্থান হলো বৃটিশ কলোনী ভারত এবং রাশিয়ার জার সাম্রাজ্যের মাঝখানে। দু'টি বৃহৎ ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মধ্যবর্তী অবস্থানই আফগান পররাষ্ট্র নীতির বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে।

অতি তুচ্ছ বিষয়ে আত্মমর্যাদাবোধের কারণে অনেক ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদী প্রতিবেশীদের মধ্যে সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে। এই সংঘাত এত ব্যয়বহুল হয়ে পড়ে যে, জাতীয় মর্যাদাবোধের জন্য দেশবাসীকে বড় বেশী খেসারত দিতে হয়।

ফ্রান্স ও বৃটেনকে ইংলিশ চ্যানেল জলপথে আলাদা করে রাখলেও নিকটতম প্রতিবেশী হিসেবে ফ্রান্সের সঙ্গে বৃটেনের ঠোকাঠুকি লেগেই থাকতো। এখনও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাদের পারস্পরিক ঈর্ষাবোধ সুস্পষ্ট।

ইংরেজদের একটি শঙ্কা ছিল যে, আফগানিস্তানে বৃটিশ শাসন প্রসারিত হলে এর প্রতিক্রিয়া শুভ নাও হতে পারে। এর ফলে তাদেরকে ইউরোপের অন্যতম বৃহৎ রাষ্ট্রশক্তি জার শাসিত রাশিয়ার মুখোমুখি হতে হতো। রাশিয়ার জার সাম্রাজ্য খোরাসান-আফগানিস্তান সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

রাশিয়ার একটি বিশেষ অর্থনৈতিক প্রয়োজন ছিল আরব সাগরের তীরে কোন একটি বাণিজ্য বন্দর। কিন্তু এ সুযোগ রাশিয়াকে দিতে বৃটিশ কিছুতেই রাজি ছিল না। পশ্চিম প্রান্তের বসফরাস, দাদানেলস প্রণালী বা পূর্ব প্রান্তের ভোলগার মোহনা ভ্লাডিভস্টক হয়ে দক্ষিণ এশিয়ার সাথে বাণিজ্য করা ছিল অপেক্ষাকৃত ব্যয়বহুল এবং সময় সাপেক্ষ। তাই আরব সাগরের উষ্ণ জলের তৃষা ছিল রুশ হৃদয়ে তীব্র।

এই তৃষ্ণা প্রতিরোধে বৃটিশের প্রয়োজন ছিল আফগানিস্তানে একটি শক্তিশালী সরকার, জনগণের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা চেতনা এবং আত্মমর্যাদাবোধ। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের প্রয়োজন ছিল তাদের ভারতীয় সাম্রাজ্য এবং জার

সাম্রাজ্যের মাঝখানে এমন একটি 'বাফার এস্টেট' বা দেয়াল-রাষ্ট্র যে রাষ্ট্রের অধিবাসীগণ সাম্রাজ্যবাদী উষ্মা এবং গোলাগুলীর চাঁনমারি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

বৃটিশ অর্থ ও অস্ত্র আফগান রক্তে রঞ্জিত হলে রাশিয়া আরব সাগরের তৃষ্ণা নিবারণে স্বাভাবিক কারণে সংযত হবে। আর এটাই ছিল বৃটিশের কায়েমি স্বার্থ।

বৃটিশগণ আফগানিস্তানে কোন অর্থনৈতিক সমৃদ্ধশালী রাষ্ট্র চাইত না। তাদের সাম্রাজ্যের অন্যত্র যেভাবে ঘটেছিল, পাশ্চাত্য শিক্ষা, সংস্কৃতি প্রসার এবং উন্নতির ছোঁয়াও আফগানিস্তানের লাগুক, তা বৃটিশের কাম্য ছিল না। তাদের স্বার্থ ছিল যে আফগানিস্তান অনুন্নত থাকুক, দরিদ্র থাকুক, কিন্তু তাদের মধ্যে আত্মমর্যাদাবোধ প্রবল থাকুক। আফগানিস্তানে খৃষ্ট ধর্ম প্রচারেও বৃটিশরা তেমন উৎসাহ প্রদর্শন করেনি। যেমন করেছিল ভারতে এবং তাদের সাম্রাজ্যে অন্যত্র।

বৃটিশ জাতি সমগ্র ভারত পদানত করেছিল। ভারত দাসত্ব স্বীকার করতে বাধ্য হয় বৃটিশ সরকার বা বৃটিশ জাতির নিকট নয়। বরং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী নামে একটি ব্যবসায়ী কোম্পানীর নিকট। আফগানিস্তানে বৃটিশ সাম্রাজ্য বিস্তার করা কষ্টকর হলেও অসম্ভব ছিল না। ইতিপূর্বে বহু বিদেশী শাসক স্বল্পকালের জন্য হলেও আফগানিস্তানে প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিল। আফগানিস্তানকে প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে আনা বিশেষ কারণে বৃটিশ স্বার্থের অনুকূল ছিল না।

আফগানিস্তানের নামমাত্র স্বাধীনতা স্বীকার করলেও আফগানিস্তানকে তারা ব্যবহার করেছিল সাম্রাজ্যের একটি সীমান্ত প্রদেশ হিসেবে। এটা ছিল তাদের ভারতীয় সীমান্তের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের অংশ বিশেষ।

ভারতের বৃটিশ সাম্রাজ্য পাঞ্জাব ও বেলুচিস্তান পর্যন্ত বিস্তার হওয়ার পর বৃটিশের স্বার্থ ছিল আফগানিস্তানে আফগানদের একটি নিজস্ব সরকার। নিজেদের মধ্যে সংগ্রাম করে গোত্র প্রধানগণের যিনি এগিয়ে থাকতেন, তাকেই বৃটিশ সরকার অস্ত্র ও অর্থ যোগান দিয়ে সরকার প্রধান হতে সাহায্য করতো এবং বৃটিশের অনুগত করে রাখতে চেষ্টা করতো।

তাদের বশংবদ আমীরের মধ্যে আনুগত্য দুর্বল হয়ে পড়লে বৃটিশ সিংহ ক্ষমতার অন্য কোন প্রতিদ্বন্দ্বীর উপর সওয়ার হতো। বৃটিশ কূটনীতি, অস্ত্রনীতির সাহায্যে তাদের আনুগত্যহীন শাসককে দুর্বল করে তাকেই পুনরায় শাসন ক্ষমতায় থাকতে অনেক ক্ষেত্রে সাহায্য করতো। কোন আমীরকে পরাজিত করার পর পুনরায় ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করতে বৃটিশরা বারবার সাহায্য করেছে। এমনটি তখনই করেছে যখন বিশ্বাস করেছে যে, বৃটিশের অনুগত যে রাজা বা আফগান আমীর প্রয়োজনবোধে আফগান রক্ত রুশ প্রভাব প্রতিরোধে ঝরাতে সম্মত হবে।

আফগান আমীরগণ বৃটিশের সহায়তায় ক্ষমতায় থাকলেও তাদেরকে বৃটিশের প্রতি প্রকাশ্যে দুর্ব্যবহার করতে এবং রাশিয়ার প্রতি সদয় এবং অতিথি

বৎসল হতে দেখা গেছে। আমীর দোস্ত মোহাম্মদ বৃটিশের অনুগত থাকা সত্ত্বেও আফগান জনগণের জাতীয় গৌরব এবং আত্মমর্যাদার কারণে বৃটিশ সরকারকে উপেক্ষা করেছেন।

আফগান চরিত্রে বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রবণতা অতীতকাল থেকে ছিল অত্যন্ত প্রবল। তারা অতি তুচ্ছ কারণে জীবন বাজী রেখে মরণ সংগ্রামে অবতীর্ণ হতো। বন্দুক, রাইফেল পিস্তল ছিল তাদের হাতের লাঠি এবং মেসওয়াকের মত। গোত্রীয় অহংকারবোধ ছিল তাদের মধ্যে তীব্র। ছেলে-মেয়ের বিয়ে সংক্রান্ত ব্যাপারে দুই গোত্র তীব্র লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়ে জীবন দিয়ে দিতো।

গোত্রীয় মর্যাদাবোধ, অহংকার, স্বার্থ নিয়ে সংগ্রাম ও মৃত্যুবরণ করা ছিল তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। সকলে মিলে একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য তাদের আগ্রহ ছিল খুবই দুর্বল।

ইসলাম প্রচারের পূর্বে হেজাজ এবং নজদে, আরবদের মধ্যে কোন সরকার ছিল না। আফগানিস্তানে বিদেশী সরকার প্রতিষ্ঠিত হলেও বহু শতাব্দী পর্যন্ত বিশেষ করে আহমদ শাহ আবদালী দুররানীর পূর্ব পর্যন্ত তাদের কোন নিজস্ব সার্বভৌম সরকার ছিল না। আনুগত্য ও বন্ধুত্বের দ্রুত পরিবর্তনশীলতা আফগান চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

২৫

আফগান বৈদেশিক সম্পর্কের ক্রম বিবর্তন

আফগান বাদশাহ আহমদ শাহ আবদালী দুররানীর শাসনকালে আফগানিস্তান ছিল এশিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সামরিক শক্তি। পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে (১৭৬১ খৃঃ) বিজয়ের মাধ্যমে তার সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব দেশে-বিদেশে স্বীকৃত হয়। আহমদ শাহ আবদালী দুররানীর পর দুররানী বংশের শাসনকালে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত আফগানিস্তান ছিল স্বাধীন সাবভৌম রাষ্ট্র। দুররানী বংশের পরই আফগান বৈদেশিক সম্পর্কে দুর্দিন নেমে আসে। বারাকজাই মোহাম্মদ জাঁই বংশের রাজত্বকালে আফগানস্তিান সার্বভৌমত্ব হারিয়ে ফেলে।

আবদালী-দুররানী বংশের পর আফগানিস্তানের শাসন ক্ষমতায় আসে মোহাম্মদজাঁই বারাকজাঁই বংশ। এ বংশের প্রথম নৃপতি ছিলেন দোস্ত মোহাম্মদ খান (১৮২৬/১৮৩৪-৬৩ খৃষ্টাব্দ)। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে সরদার পায়েন্দা খানের পুত্র দোস্ত মোহাম্মদ কাবুলে ক্ষমতা দখল করলেও ১৮৩৪ পূর্বে তার ক্ষমতা আফগানিস্তানের ক্ষুদ্র অংশে সীমিত ছিল।

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দ হতে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতের শাসনকর্তা ছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী। এ কোম্পানীর কূটনৈতিক প্রতিনিধি আলেকজান্ডার বার্নসকে উপেক্ষা করে রাশিয়ান কূটনৈতিক প্রতিনিধি জেনারেল স্টলীটভকে কাবুল সরকার কর্তৃক অধিকতর সম্মান প্রদর্শনের কারণে ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড অকল্যান্ড ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন।

কাবুলের রাজা দোস্ত মোহাম্মদ খান হতে সন্তোষজনক ব্যাখ্যা না পেয়ে তিনি প্রথম বৃটিশ আফগান যুদ্ধ (১৮৩৯-৪২ খৃঃ) শুরু করেন। বৃটিশ বাহিনী কাবুল দখল করে। কাবুলের আমীর দোস্ত মোহাম্মদ পলায়ন করেন বুখারায় এবং তার পুত্র আকবর খান বৃটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকেন। ইংরেজগণ আহমদ শাহ আবদালীর প্রপৌত্র এবং আফগানিস্তানের সিংহাসনচ্যুত এবং বিতাড়িত প্রাক্তন আমীর সুজা শাহকে কাবুলের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করে (১৮৩৯-৪২ খৃঃ)। বিজয় গর্বে গর্বিত বৃটিশ বাহিনী সুজা শাহকে পুতুলরাজ হিসেবে ব্যবহার করে। জাত্যাভিমানী আফগানগণ অপমানিত বোধ করে বৃটিশের পুতুল সম্রাট সুজা শাহকে হত্যা করে।

এর পূর্বে দোস্ত মোহাম্মদ বৃটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বিজয়ের সম্ভাবনা ক্ষীণ ভেবে 'নিজারো' পাহাড়ের পাওয়ানদারা উপত্যকায় বৃটিশ সেনাপতি সার রবার্ট সেলের নিকট বিনা যুদ্ধেই ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে আত্মসমর্পণ করেন। দোস্ত মুহাম্মদ এবং তার

পুত্র গোলাম হায়দারকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ভারতে নির্বাসনে প্রেরণ করে। কিন্তু তার জ্যৈষ্ঠ পুত্র আকবর খান ১৮৪২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যান। প্রজাদের নিকট সুজা শাহের হত্যাকাণ্ডের পর বৃটিশ সরকার দোস্ত মোহাম্মদকে কাবুলের আমীর হিসেবে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে (১৮৪৩ খৃঃ)।

১৮২৬ সনে রাশিয়া এবং আফগানিস্তান একটি পারস্পরিক নিরপেক্ষতা এবং অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষর করে। আফগানিস্তানকে বৃটিশ প্রভাবিত দেখে রাশিয়া পারস্যের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নের চেষ্টা করে। তারা পারস্য সম্রাটকে হেরাত দখলের উৎসাহ দেয় (১৮৩৯)। কিন্তু তা সফল হয়নি।

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে দোস্ত মোহাম্মদ শিখদের সঙ্গে একযোগ হয়ে গুজরাটের যুদ্ধে ইংরেজের বিরুদ্ধে যোগ দেন। কিন্তু তা সফল হয়নি। দোস্ত মুহাম্মদ কোন প্রকারে প্রাণ নিয়ে পালাতে সক্ষম হন।

১৮৫৪ সনে রাশিয়ান আগ্রাসী মনোভাবের কারণে ক্রিমিয়ার যুদ্ধ ঘটে। এ যুদ্ধে তুরস্ক, ফ্রান্স, বৃটেন যুদ্ধ করে রাশিয়ার বিরুদ্ধে। বৃটিশ জেনারেল লর্ড ডালহৌসি আফগানিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নের চেষ্টা করেন। ১৮৫৫ সনে দোস্ত মোহাম্মদের সঙ্গে পেশোয়ারে এক সন্ধি হয়। এ সন্ধি চুক্তিতে দোস্ত মোহাম্মদের

পুত্র গোলাম হায়দার স্বাক্ষর করেন। এ চুক্তির মূল কথা হলো আফগান সংহতি এবং ঐক্যের বিরুদ্ধে বৃটিশ কোন পদক্ষেপ নেবে না। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী এবং আফগান সরকার পরস্পরের বন্ধুর বন্ধু এবং শত্রুর শত্রু হবে।

১৮৫৬ সনে রাশিয়ান প্ররোচনায় পারস্য আফগানিস্তানের হাত থেকে হেরাত দখল করে নেয়। আফগানিস্তানের পক্ষ হয়ে বৃটিশ পারস্যের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। তিন মাস যুদ্ধের পর শান্তি স্থাপিত হয়। পারস্য ভবিষ্যতে আফগানিস্তান এবং হেরাতে বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করবে না – এই মর্মে সন্ধি হয়।

এঙ্গলো রুশ সম্পর্ক

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে Russian Declaration-এর মাধ্যমে রাশিয়া ঘোষণা করে যে আফগানিস্তান থাকবে তাদের প্রভাব প্রলয়ের বাইরে। তখন পর্যন্ত জারের সাম্রাজ্য সীমানা আফগানিস্তানের সীমানার কাছাকাছি আসেনি। কিন্তু ক্রমশঃ জার মুসলিম মধ্য এশিয়া দখল করতে থাকে।

রাশিয়া তিব্বতের দিকে তার দৃষ্টি সম্প্রসারিত করে। চুম্বি উপত্যকায় বৃটিশ কর্মকর্তা প্রেরনের বিষয়টিতে রাশিয়া মৃদু প্রতিবাদ জানায়।

১৯০০ খৃষ্টাব্দে রাশিয়া আফগানদের সাথে একটি অরাজনেতিক সম্পর্ক স্থাপন করার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে। এ ঘোষণায় বৃটিশ সরকার মনে করে যে, জার মধ্য এশিয়া দখল করার পর আফগানিস্তানে কূটনৈতিক এবং রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করতে চায়।

বাদশাহ আমানুল্লাহর পিতা আফগান আমীর হাবিবুল্লাহ খান (১৯০১-১৯১৯ খৃঃ) ১৮ লক্ষ টাকা অর্থাৎ এক লক্ষ ষাট হাজার পাউন্ড (পাউন্ড ১,৬০,০০০) বৃটিশ সরকার হতে নিয়ে বার্ষিক অনুদান বা রাজস্ব হিসেবে বৃটিশ সরকারকেই তার পক্ষ হয়ে আফগান বৈদেশিক সম্পর্ক পরিচালনার দায়িত্ব ইজারা দিয়ে চুক্তি করেন (২১ মার্চ, ১৯০৫)। এই চুক্তি আমির হাবিবুল্লাহ এবং লর্ড কার্জনের সময়ে স্বাক্ষরিত হলেও তার পিতা আমীর আবদুর রহমানের (১৮৮০-১৯০১ খৃঃ) আমল থেকেই এ প্রথা চলে এসেছিল। আবদালী বংশের পরবর্তী বারাকজাঁই আমলে আফগান আমীর বা রাজা স্বাধীন হলেও তারা ছিলেন বৃটিশের প্রভাবাধীন। আফগানিস্তান স্বাধীন ছিল, কিন্তু সার্বভৌম ছিল না। রুশ-জাপানীজ যুদ্ধে রাশিয়ার পরাজয়ের পর তিব্বত ও আফগানিস্তানে রাশিয়ার উৎসাহ কমে যায়। রাশিয়া জাপানের পরবর্তী মোকাবিলার জন্যে নিজস্ব শক্তি বৃদ্ধিতে উৎসাহী এবং বৃটিশ সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নে আগ্রহী হয়। বৃটিশ সরকার বুয়র যুদ্ধের (১৮৯৯-১৯০২) কারণে কিছুটা ক্লান্ত হয়ে পড়ে। রাশিয়া

এবং বৃটেন দু'দেশই ইউরোপের জার্মান শক্তির অভ্যুদয়ে চিন্তাগ্রস্ত হয় এবং বৃটেন এবং রাশিয়ার মধ্যে মৈত্রী সম্পর্ক উন্নয়নে আগ্রহী হয়। রুশ জার বৃটিশরাজ এডওয়ার্ডের সঙ্গে সাক্ষাতে আগ্রহী হন।

রুশ রাজধানী সেন্ট পিটার্সবার্গে বৃটিশ রাজদূত স্যার আর্থার নিকলসন ১৯০৬ সনের জুন মাসে রাশিয়ান পররাষ্ট্রমন্ত্রী উসভলসকির সঙ্গে বৃটিশ সম্পর্ক গভীরতর করার লক্ষ্যে গভীর আলোচনা শুরু করেন।

আলোচনাশেষে আগষ্ট ১৯০৭ রুশ-বৃটিশ সেইন্ট পিটার্সবার্গ কনভেশন স্বাক্ষরিত হয়। এতে সিস্তান অঞ্চল আফগানিস্তান এবং পারস্যের মধ্যে বিভক্তি স্বীকৃত হয়। চুক্তিতে পারস্যে রুশ প্রভাব স্বীকার করে নেয়া হয়। আফগানিস্তান তার প্রভাব বলয়ের বাইরে থাকবে বলে রাশিয়া একটি আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেয়। রাশিয়া আফগানিস্তানে কোন এজেন্ট বা প্রতিনিধি পাঠাবে না বলে একমত হয়। বৃটিশ সরকারের মাধ্যমে রাশিয়া আফগানিস্তানের সঙ্গে বৈদেশিক সম্পর্ক সংরক্ষণ করবে বলে সমঝোতা হয়।

বৃটিশ পক্ষ থেকে স্বীকৃত হয় যে, বৃটেন আফগানিস্তানের কোন অংশ দখল করবে না এবং এর আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কোন হস্তক্ষেপ করবে না—যদি আমীর আবদুর রহমানের সঙ্গে বৃটেনের যে সম্পর্ক ছিল এবং আমীর হাবিবুল্লাহর সঙ্গে ২১ শে মার্চ ১৯০৫ সনে যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, তা আফগানিস্তান মেনে চলে। রাশিয়া এবং বৃটেন দু'পক্ষই তিব্বতে চীন সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে নেয়।

আফগান আমীর হাবিবুল্লাহ (১৯০১ - ১৯১৯ খৃঃ) সেন্ট পিটার্সবার্গ কনভেনশন, ১৯০৭-তে ক্ষুব্ধ হন। এ কনভেনশন প্রতিস্বাক্ষরের জন্যে যখন আমীর হাবিবুল্লাহর কাছে প্রেরণ করা হয়, তা তিনি স্বাক্ষর করেননি, তবে তা প্রত্যাখ্যান করতেও সাহস করেননি। বিষয়টি চিন্তা করে দেখার জন্য সময় নিয়েছিলেন।

তার দেশ সম্বন্ধে বৃটেন এবং রাশিয়া এমন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলেন, অথচ আমীর হাবিবুল্লাহর সঙ্গে কোন আলোচনাই করলেন না। এরূপ উপেক্ষায় আমীর হাবিবুল্লাহ ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু কিছু করার মত শক্তি তার ছিল না। তিনি নিজেই ইতিপূর্বে ১৮ লক্ষ টাকার বিনিময়ে তার দেশের পররাষ্ট্রীয় বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার বৃটেনকে দিয়েই চুক্তি স্বাক্ষর করেছিলেন।

অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতাব্দীতে সুদূর ইউরোপীয় জাতিসমূহ এশিয়া-আফ্রিকার অধিকাংশ দেশকে তাদের দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে নেয়। বর্তমানে রাজনৈতিক দাসত্ব বিদূরিত হলেও সাংস্কৃতিক দাসত্বের শৃঙ্খল আরো দৃঢ় হয়েছে।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে রুশ-জাপান যুদ্ধে জাপানের নিকট ইউরোপীয় শক্তি রাশিয়ার পরাজয়ের পর এশিয়ার দেশসমূহে কিছুটা আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে (১৯১৪-১৮) ইউরোপীয় শক্তিসমূহ দুর্বল হয়ে পড়ে। এ দুর্বলতার প্রেক্ষাপটে এশিয়ার জাতিসমূহের মাঝে রাজনৈতিক চেতনা জাগ্রত হয় এবং স্বাধীনতার স্বপ্ন সৃষ্টি হয়।

১৯২১ সনে স্বাক্ষরিত হয় একটি রুশ-আফগান মৈত্রী চুক্তি। ১৯২৬ সনে যোশেফ স্টালিনের আমলে স্বাক্ষরিত হয় রুশ-আফগান চুক্তি। ১৯৩১ সনে স্বাক্ষরিত হয় পুনরায় একটি মৈত্রী চুক্তি। এরপর ১৯৪৬, ১৯৪৭, ১৯৪৮ সনে প্রতি বছর একটি করে স্বাক্ষরিত হয় রুশ আফগান মৈত্রী চুক্তি।

১৯৭৮ সনে স্বাক্ষরিত হয় রুশ আফগান শান্তি ও মৈত্রী চুক্তি। একটি বৃহৎ রাষ্ট্র যদি একটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্রকে এভাবে এতগুলো মৈত্রী চুক্তিতে আষ্টেপৃষ্ঠে আবদ্ধ করে নেয়, তবে চুক্তির জটাজাল ছিন্ন করে তার বেরিয়ে আসা কষ্টকর হয়। মৈত্রী এবং বন্ধুত্ব হতে পারে সমানে সমানে। হাতি এবং ঘোড়ার প্রেম ঘোড়ার জন্যে বিপজ্জনক। হাতির প্রেমের আলিঙ্গনে ঘোড়ার প্রাণবায়ু দেহে থাকে না, শূন্যে মিলিয়ে যায়। আফগানিস্তান এবং রুশ মৈত্রীর পরিণতি কি ভিন্নতর হয়েছে?

২৬

ইরান, পাকিস্তান ও তালিবান

ইরান

আফগানিস্তানের ঠিক পশ্চিমে অবস্থিত ইরান। ইরান মনে হয় তালেবানদের প্রতি বিরূপ। ইরানীরা শিয়া। তালিবানরা সুন্নী। ইরানীরা আফগানিস্তানের সুন্নী মুজাহিদ আন্দোলন বিভিন্নভাবে সফলতার দ্বারপ্রান্তে এগিয়ে নিতে সাহায্য করেছিলেন। সে সাহায্য ছিল কম্যুনিস্টদের বিরুদ্ধে। ভিন্ন মতাবলম্বী কোন সুন্নী গ্রুপের বিরুদ্ধে নয়।

হেরাতের শিয়াগণ আধুনিক শিক্ষা-দীক্ষায় উন্নত। পোশাক-পরিচ্ছদে অধিকতর পাশ্চাত্যমুখী। আর্থিকভাবেও সম্পদশালী। তাদের অনেকের পক্ষে কট্টরপন্থী তালিবান শাসন মেনে নেয়া কষ্টকর।

হাজারা অধ্যুষিত হাজারাজাদ অঞ্চলে তালেবানগণ তাদের পূর্ণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠা করেনি। তবু দেখা যায় জাতিসংঘে ইরানী প্রতিনিধিরা হাজারাদের নিরাপত্তা সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

(Far Eastern Economic Review, Octobe r. 10. 1996).

ইরান ইতিপূর্বে রব্বানী সরকারকে এবং আফগানিস্তানের বিভিন্ন গ্রুপকে কমবেশী বিবিধ সাহায্য করেছে। তালেবানদের সঙ্গে ইরানের সংযোগ হেরাত দখলের পরেও হয়নি বা বিন্দুমাত্র নিবিড় মনে হয় না।

১৯৯৫ সনের সেপ্টেম্বর মাসে তালেবানরা হেরাত দখল করেন। হেরাতের গভর্নর ইসমাইল খান প্রায় ৮ হাজার সমর্থক নিয়ে পূর্ব ইরানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইসমাইল খান, বোরহানুদ্দিন রব্বানী, আবদুর রশিদ দোস্তাম এবং আহমদ শাহ মাসুদের জোটে যোগ দিয়েছেন। মৌলভী ইয়ার মোহাম্মদ খান নিযুক্ত হয়েছেন হেরাতের তালিবান গভর্নর।

আফগানিস্তানের শিয়া মোজাহেদীন গ্রুপ হিযবে ওহাদাত নেতা করিম খলিলী বোরহানুদ্দিন রব্বানী ও রশীদ দোস্তামের সমর্থক। শিয়ানেতা আবদুল আলী মাজারী তালেবানদের হাতে নিহত হন। ইরানের প্রেসিডেন্ট আলী আকবর হাশেম রাফসানজানী এবং ইরানের শীর্ষ ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনী প্রকাশ্যভাবে তালেবানদের প্রতি তাদের বিরূপ মনোভাব ব্যক্ত করেছেন।

বিগত ১০ অক্টোবর ১৯৯৬ হিজব-ই ওহাদাতের শিয়া মুসলিমনেতা করিম খলিলী, উজবেকনেতা আবদুর রশীদ দোস্তাম, তাজিকনেতা আহমদ শাহ মাসুদ পারস্পরিক মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষর করেন।

ইরান ১৯–৩০শে অক্টোবর, ১৯৯৬ আফগানিস্তানের উপর একটি শান্তি সম্মেলন আহবান করে। এতে OIC-এর ৫৩ সদস্য দেশ এবং আরো অনেক সংস্থাকে অংশগ্রহণ করার জন্য আহবান জানানো হয়। তালিবান এ সম্মেলনে যোগ দেয়নি।

ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আলী আকবর বেলায়েতী জাতিসংঘে রাশিয়ান পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইয়েভজেনী প্রাইমাকভ (Yevegeny Primakov)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সাধারণ স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনা করেছেন। তার আলোচনার মধ্যে তালেবানদের সম্পর্কে ইরানের নীতি সংক্রান্ত আলোচনা হয়েছে বলেও অনেকের বিশ্বাস। তালেবানগণ তাদের জেহাদে ইরানের সমর্থন পাচ্ছে না।

ক্ষমতাচ্যুত প্রেসিডেন্ট বোরহানুদ্দিন রব্বানীর তালিবান বিরোধী একটি সাক্ষাৎকার ইরানী টেলিভিশনে প্রচারিত হয়। ইরান টেলিভিশন আফগানিস্তানের ভিতরে এসে বোরহানুদ্দিন রব্বানীর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন। এই সাক্ষাৎকারের মূল বক্তব্য ছিল যে, বোরহানুদ্দিন তালেবানদের বিরুদ্ধে সকল শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করেছেন এবং লড়াই পরিচালনার জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ কাউন্সিল গঠন করেছেন। আবদুর রশীদ দোস্তাম হবেন তালিবান বিরোধী জোটের ভাইস প্রেসিডেন্ট।

সমগ্র ইরানের ইমামদের এক সমাবেশে ইরানের আধ্যাত্মিকনেতা আয়াতুল্লাহ আলী খোমেনী তালেবানদের তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি তাদের ইসলামী জ্ঞান সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করেন এবং মনে করেন যে, তালিবান ইসলামের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করছে। তিনি সন্দেহ করেন যে, এই অঞ্চলে ইরানী প্রভাব প্রতিহত করার লক্ষ্যে আমেরিকা, সৌদি আরব ও পাকিস্তান তালেবানদের পক্ষে কাজ করে যাচ্ছে।

পাকিস্তান

পাকিস্তান চায় মধ্য এশিয়ার সঙ্গে ব্যবসা করতে। শান্তিপূর্ণ আফগানিস্তান না হলে তাদের পক্ষে মালামাল প্রেরণ করা সম্ভব নয়।

ইরানের সঙ্গে মধ্য এশিয়ার ব্যবসা বেশ জমে উঠেছে। শুধু ব্যবসা নয়, বিভিন্ন 'জয়েন্ট ভেনচার' প্রকল্প ইরান ও মধ্য এশিয়ার রাষ্ট্রসমূহ গ্রহণ করছে। আফগানিস্তানে শান্তি প্রতিষ্ঠা বিলম্বিত হওয়ায় পাকিস্তানের ব্যবসারও ক্ষতি হচ্ছে। যারাই আফগানিস্তানের রাস্তা-ঘাট নিরাপদ রাখতে পারবে, তাদেরকে সমর্থন করা পাকিস্তানী স্বার্থের অনুকূল।

আমেরিকার লসএঞ্জেলস ভিত্তিক ইউনোকল কোম্পানী এবং সৌদি আরবে কাজ করতে অভিজ্ঞ ডেল্টা অয়েল কোম্পানী তুর্কমেনিস্তান হতে হেরাত-কান্দাহার হয়ে কোয়েটা পর্যন্ত তেল এবং গ্যাসের পাইপ লাইন নির্মাণে আগ্রহী এবং উদ্যোক্তা। এ প্রকল্পে ২০ বিলিয়ন ডলার সৌদি এবং আমেরিকান অর্থ বিনিয়োগ নিশ্চিত। কিন্তু আফগানিস্তানের শান্তি প্রতিষ্ঠা না হলে তা সম্ভব নয়।

পাকিস্তান মধ্য এশিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নে অত্যধিক আগ্রহী। জালালাবাদ হয়ে পেশোয়ার-কাবুল রোড এবং চমন হয়ে কোয়েটা-কান্দাহার রোড নির্মাণে পাকিস্তান অত্যন্ত উদগ্রীব। এ দু'টি রাস্তা হয়ে গেলে পাকিস্তানী দ্রব্যাদি সহজে কাবুল হয়ে মধ্য এশিয়ায় প্রেরিত হতে পারে। পাকিস্তান কান্দাহার এবং হেরাত হয়ে তুর্কমেনিস্তানের মধ্য দিয়ে মধ্যে এশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপনে প্রয়াসী। তুর্কমেনিস্তানে গ্যাস, তেল আফগানিস্তানের মাধ্যমে পাকিস্তানে সরবরাহ হতে পারে।

পাকিস্তান সীমান্তে শিয়া-সুন্নী রায়টে বোরহানুদ্দিন-রব্বানী গ্রুপের কিছুটা ইন্ধন ছিল বলে পাকিস্তান কর্তৃপক্ষের কেউ কেউ মনে করে।

পাকিস্তান তালেবানদের প্রতি সহানুভূতিশীল মনে করেই ১৯৯৫ সনে রব্বানী সমর্থক আফগানগণ কাবুলে পাকিস্তান দূতাবাসে হামলা চালায়। প্রতিবাদ করে কোন প্রতিকার না হওয়ায় পাকিস্তান দূতাবাস বন্ধ করে দেয়।

বেনজীর শাসনামলের পাকিস্তানের তথ্যমন্ত্রী নাসিরুল্লাহ বাবর একজন পাঠান। তার পক্ষে ব্যক্তিগতভাবে পুশতুন সমর্থক হওয়া বিচিত্র নয়।

আফগানিস্তানের হেলমন্দ প্রদেশ পপি উৎপাদন কেন্দ্র। পপি হতে হেরোইন তৈরি হয়। আফগানিস্তানে প্রতি বছর ২ হাজার হতে আড়াই হাজার টন আফিম উৎপন্ন হতে পারে। এই কেন্দ্রটি এখন তালেবানদের দখলে। এ অঞ্চল তালেবানদের দখলে না থাকলে আফিম উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং তা পাকিস্তানের মাধ্যমে রপ্তানী হবে। পাকিস্তানের মাধ্যমে যতবেশী হেরোইন বিশ্বে রপ্তানী হবে পাকিস্তানের সামাজিক জীবনের উপর তা তত বেশী হুমকি হয়ে দাঁড়াবে।

পাকিস্তানের পক্ষে তালেবানদের সম্পর্কে বেশী উৎসাহী হওয়া কষ্টকর। তালেবানরা অধিকাংশই পুশতুন গোত্রভুক্ত। পুশতুন গোত্রীয় তালেবানদের সাহায্য করা হলে তাজিক গোত্রভুক্ত রব্বানী-মাসুদ এবং উজবেক গোত্রীয় আবদুর রশীদ দোস্তামের অসন্তুষ্ট হবার কথা।

তা ছাড়া পুশতুনদেরকে বেশী সাহায্য করার মধ্যে পাকিস্তানের ঝুঁকিও আছে। পাকিস্তানের পাঠানরা পুশতুন গোত্রভুক্ত। আফগানিস্তান এবং পাকিস্তানের পুশতুন গোত্রভুক্ত অঞ্চল নিয়ে পাকতুনিস্তান নামে একটি পৃথক রাষ্ট্র গঠনের চিন্তা-ভাবনাও কোন কোন পাকিস্তানী পাঠানদের মধ্যে আছে। পুশতুন তালেবানদের বিজয় ও সাফল্যে পাকিস্তানী পুশতুনরাও আনন্দিত। এ আনন্দ গোত্রীয় ঐক্যে পরিণত হলে পাকিস্তানের জন্য বিপদের সম্ভাবনা আছে।

কাবুলের ক্ষমতাশীন থাকা সত্ত্বেও বোরহানুদ্দিন রব্বানী এবং আহমদ শাহ মাসুদের পক্ষে সারা আফগানিস্তানে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়নি। মুজাহিদদের মধ্যে নৈতিক শৃঙ্খলা বজায় রাখাও কাবুল সরকারের পক্ষে সম্ভব হয়নি। মুজাহিদ শিবিরে নারী নির্যাতনের অভিযোগও উঠেছে। পাকিস্তান প্রথম দিকে আফগানিস্তানের সকল মুজাহিদ গ্রুপকেই কম-বেশী পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন।

২৭

রাশিয়া, মধ্য এশিয়া ও তালিবান

রাশিয়া

মধ্য এশীয় মুসলিম রাষ্ট্রসমূহকে কুটনীতিবিদগণ রাশিয়ার তলপেট বলেও আখ্যা দিয়ে থাকেন। এ অঞ্চল সম্পর্কে উদাসীন থাকা রাশিয়ার পক্ষে সম্ভব নয়।

সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট বরিস ইয়েলসিনের নির্দেশে তালিবান

সমস্যা আলোচনাকল্পে কাজাকিস্তানের রাজধানী আলমাআতায় কমনওয়েলথ অব ইনডিপেনডেন্ট স্টেটসমূহের একটি সম্মেলন ৪ঠা অক্টোবর ১৯৯৬ সনে অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলন উদ্বোধন করেন রুশ প্রধানমন্ত্রী ভিক্টর চেরনোমিবুদিন। এ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন কাজাক প্রেসিডেন্ট নূর সুলতান নাজারবায়েভ, কিরঘিজিস্তান প্রেসিডেন্ট আসগর আকায়েব, উজবেক প্রেসিডেন্ট ইসলাম করিমভ, তাজিক প্রেসিডেন্ট এনামালে রাখমানভ (ইমাম আলী রহমান), তাজিক প্রধানমন্ত্রী ইয়াহিয়া আজিমভ প্রমুখ। তুর্কমেনিস্তান প্রেসিডেন্ট সফর মুরাদ তুর্কমেনবোসী নিয়াজভের অনুপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়।

রাশিয়া তালেবানদের প্রতি সম্পূর্ণ বিরোধী ভাবাপন্ন। সোভিয়েতঘেঁষা তাজিকিস্তান এবং মধ্য এশিয়ার অন্যান্য মুসলিম দেশের সরকারসমূহ কমবেশী ইসলামপন্থীদের বিরোধিতার সম্মুখীন। তারা আফগান তালেবানদের থেকে প্রেরণা পায় বলেই সন্দেহ করা হয়ে থাকে। তাজিকিস্তানের ইসলামী ভাবাপন্নরা সফল হলে মধ্য এশিয়ার অন্যান্য রাষ্ট্রে তার প্রভাব পড়তে পারে এই ভয়ে রাশিয়া ভীত।

১৯৯৬ সনের জুন মাসে রুশ সরকার মধ্য এশিয়ার সীমান্তে ২৫ মাইল ব্যাপী একটি 'নো-ম্যানস ল্যান্ড' সৃষ্টির প্রস্তাব দেয়। উদ্দেশ্য যে, এই প্রস্তাবিত জনহীন অঞ্চলে ইসলামী জঙ্গীরা শিকড় গাড়তে পারবে না।

বোরহানুদ্দিন রব্বানী, আহমদ শাহ মাসুদ ও গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ার আফগানিস্তানে তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়েছেন। তারা রাশিয়া হতে ব্যাপক সাহায্য পান। তালেবানদের তুলনায় তাঁরা রুশদের নিকট অধিকতর গ্রহণযোগ্য।

জোটকে সমর্থনযোগ্য মনে করে।

যদিও বিভিন্ন আফগান মুজাহেদীন গ্রুপ রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, ১৯৯৫ সন হতে দেখা যায় বোরহানুদ্দিন রব্বানীর গ্রুপ রাশিয়া হতে বেশ কিছু সামরিক সাহায্য পাচ্ছে। এটা অবহিত হয়ে আমেরিকা তাদের সমর্থক আরেকটি গ্রুপ পাওয়ার চেষ্টা করছে।

তাজিকিস্তান

তাজিকিস্তানের অবস্থান আফগানিস্তানের উত্তরে। তাজিকিস্তানের বর্তমান প্রেসিডেন্ট (১৯৯৬) হলেন ইমাম আলী রাখমানভ। তাজিকিস্তানের দক্ষিণাংশে মুজাহিদ আন্দোলন চলছে। তাজিক সরকার মনে করে যে, আফগানিস্তানের মুজাহিদরাই তাজিকিস্তানের ইসলামী আন্দোলনের প্রেরণার উৎস।

তাজিক সরকার আফগান মুজাহিদের ভয়ে এত ভীত যে, তারা এ বিষয়ে রাশিয়ার সাহায্য চেয়েছে। আফগান-তাজিক সীমান্ত পাহারা দেওয়ার জন্য রাশিয়া ১৫ হাজার রুশসেনা তাজিক সরকারের হাতে ন্যস্ত করেছে। আফগানিস্তানে তালেবানদের ক্ষমতা দখলে তাজিক প্রেসিডেন্ট ইমাম আলী রাহমান (রাখমানভ) অত্যন্ত ভীত।

আফগানিস্তানের তাজিকগণের কেউ কেউ বৃহত্তর তাজিকিস্তানের পক্ষপাতি। অর্থাৎ তাজিক গোত্রভুক্ত আফগান এলাকা এবং রাশিয়ান তাজিকদের নিয়ে একরাষ্ট্র গঠনের চিন্তা-ভাবনা অনেকের আছে। তাজিকিস্তানের বর্তমান সরকার ইসলামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ তাজিকদের আফগানিস্তান থেকে যত দূরে রাখতে পারেন, ততই তাজিকিস্তানের জন্য নিরাপদ মনে করে।

বোরহানুদ্দিন রব্বানী এবং আহমদ শাহ্ মাসুদ তাজিক গোত্রভুক্ত। রব্বানী-মাসুদ জোট এবং তালেবানদের মধ্যে সংঘর্ষ ব্যাপক আকার ধারণ করলে তালিবান অপেক্ষা রব্বানী জোটকে সাহার্য করা তাজিক প্রেসিডেন্ট ইমাম আলী রাহমান এবং তার অনুসারীদের পক্ষে স্বাভাবিক। রব্বানী-মাসুদ জোট ইতিমধ্যেই তাজিক রাজধানী দুশানবে (Dushanbe) সঙ্গে যোগাযোগ ঘনিষ্টতর করার চেষ্টা করছেন। ১০ই মে, ১৯৯৭ দুশানবেতে ইরানী প্রেসিডেন্ট আলী আকবার হাশেমী রাফসানজানী তাজিক প্রেসিডেন্ট ইমাম আলী রাখমানভ এবং বুরহানুদ্দিন রব্বানী পারস্পরিক স্বার্থ সংক্রান্ত বিষয়ে এক বৈঠকে মিলিত হন।

তুর্কমেনিস্তান

তুর্কমেনিস্তানের অবস্থান আফগানিস্তানের পশ্চিম-উত্তরে এবং উজবেকিস্তান ও ইরানের মধ্যবর্তী অঞ্চলে। তুর্কমেনিস্তান সংলগ্ন আফগান এলাকায় বসবাস করছে তুর্কমেন গোত্রভুক্ত আফগানরা। আফগানি তুর্কমেনরা চিরকাল পুশতুনদের দ্বারা শোষিত হয়েছে। তালেবানগণ মূলতঃ পুশতুন। এখন তুর্কমেনিস্তান নিজেকে আফগানিস্তানের অন্তর্ভুক্ত তুর্কমেনদের রক্ষক মনে করেন। তালিবান অধিকৃত হেরাত প্রদেশের প্রাক্তন গভর্নর ইসমাইল খান ইরান সীমান্তে বসবাস করলেও তুর্কমেন প্রেসিডেন্ট সফর মুরাদ তুর্কমেনবোসী নিয়াজভ সরকারের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করছেন।

১৯৯৭ সনের ১২-১৫ই মে মাসের তুর্কমেন রাজধানী আশকাবাদে ১৯৮৫ সনে প্রতিষ্ঠিত দশজাতিভুক্ত Economic Co-operation Organisation-এর সম্মেলন আঞ্চলিক সমস্যা বিশেষ করে আফগান সমস্যা আলোচনার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয়। এতে আফগানিস্তানের প্রতিনিধিত্ব করেন বুরহানুদ্দিন রব্বানী। তুর্কমেন প্রেসিডেন্ট মুরাদ নিয়াজভ আফগানিস্তানের উপর দিয়ে ১২৮০ কি (৮০০ মাইল) গ্যাস লাইন নির্মাণে উৎসাহী। এ গ্যাস লাইন নির্মিত হলে তুর্কমেন গ্যাস ফিল্ড হতে প্রতি বছর ২০ বিলিয়ন মিটার (৭০০ ট্রিলিয়ন কিউটিক ফিট) গ্যাস প্রতি বছর পাকিস্তানের নিকট বিক্রয় করা সম্ভব হবে। এ গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনেও তালিবান সরকার যথাযোগ্য স্বীকৃতি পায়নি।

উজবেকিস্তান

আফগানিস্তানের উত্তরে অবস্থিত উজবেকিস্তান। উজবেক গোত্রের এক বিরাট অংশের বাসস্থান আফগানিস্তানে। ভাষাগত এবং গোত্রগত ঐক্যের কারণে সীমানার দু'পাড়ের উজবেকদের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে।

আফগানিস্তানের উজবেকনেতা সেনাপতি আবদুর রশীদ দোস্তাম মূলতঃ ছিলেন কমিউনিস্ট প্রেসিডেন্ট নজিবুল্লাহর সমর্থক। অবস্থা বেগতিক দেখে তিনি মুজাহিদদের দলে ভিড়ে যান। প্রথমে তিনি সমর্থন করেন বোরহানুদ্দিন রব্বানীকে। পরে বোরহানুদ্দিন রব্বানী এবং হেকমতিয়ার-এর সাথে মতবিরোধ হলে তিনি হেকমতিয়ারকে সমর্থন করেন।

উজবেকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হলেন ইসলাম **করিমভ। তি**নি স্বাভাবিক কারণেই উজবেক গোত্রীয় জেনারেল আবদুল রশীদ দোস্তামকে সাহায্য করে থাকেন। এ সাহায্যের মধ্যে গোলা-বারুদ, কামান, বন্দুক ও ট্যাংক ছাড়া জঙ্গী বিমানও রয়েছে। তাঁর সামরিক বিশেষজ্ঞরাও দোস্তামের এলাকায় কাজ করে থাকেন।

উজবেক প্রেসিডেন্ট ইসলাম করিমভ আফগানিস্তানে মৌলবাদী ইসলামী উত্থানে সাংঘাতিকভাবে ভীত। তিনি আফগান সীমান্তে রুশ প্রস্তাবিত ২৫ মাইল প্রশস্ত জনহীন 'বাফার জোন' স্থাপনে বিশ্বাসী।

উজবেক প্রেসিডেন্ট ইসলাম করিমভ মাসুদ-রব্বানী জোট এবং জেনারেল আবদুর রশীদ দোস্তামের সমর্থক। কারণ তালিব অপেক্ষা রশীদ দোস্তাম, আহমদ শাহ মাসুদ এবং রব্বানী অধিকতর উদারপন্থী।

তালেবানরা আবদুর রশীদ দোস্তামকে আফগানিস্তানের উজবেক এলাকার সাতটি প্রদেশে স্বায়ত্তশাসন দিয়ে সমঝোতার পক্ষপাতী ছিল। কিন্তু আবদুর রশীদ দোস্তাম তাতে রাজা হননি। প্রাক্তন কমিউনিস্ট আবদুর রশীদ দোস্তাম এখনো ঐ ধরনের ইসলামে বিশ্বাস করেন না, যে ধরনের ইসলামে তালেবানরা বিশ্বাসী। তালেবানরা সমগ্র আফগানিস্তানে একটি ইসলামী রাষ্ট্র গঠনের পক্ষপাতি। ইসলামী রাষ্ট্র গঠন ইস্যুতেই আবদুর রশীদ দোস্তামের সঙ্গে তালেবানদের সংঘর্ষ বেঁধে উঠেছে।

আফগানিস্তানের উত্তরাংশে পড়েছে হিন্দুকুশ সালাং ট্যানেল। এর উত্তর দিকে অবস্থিত মাজার-ই শরীফ। তালিবানদের দ্বারা কাবুল দখলের পরেও আবদুর রশীদ দোস্তামের নিয়ন্ত্রণাধীন মাজার-ই শরীফের জীবনযাত্রায় কোন প্রভাব পড়েনি। বাড়ীর উপর থেকে স্যাটেলাইট টিভির এন্টেনা পরিলক্ষিত হয়। রেস্তোরাঁ সমূহে আমেরিকান মুভি বা ভিডিও প্রদর্শিত হয়। হাসি-ঠাট্টায় প্রকম্পিত হয় দিগ্বিদিক। পাশ্চাত্য জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত মাজার-ই শরীফের অধিবাসীরা ধর্মীয় কড়াকড়ির প্রতি উদাসীন।

২৮

বন্ধুহীন তালেবান

তালেবানগণ কি তাদের মনজিলে মাকসুদে পৌঁছতে সক্ষম হবে? শহীদ সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী (রঃ) সীমান্তের পঞ্চতীরে খেলাফত কায়েম করে আমীরুল মুমেনীন হিসেবে শপথ নিয়ে কি কামিয়াব হতে পেরেছিলেন? জামালউদ্দিন আফগানী (রঃ) তাঁর উদ্দেশ্য সাধনে কি সফল হয়েছেন? হযরত ইমাম হুসাইন (রাঃ) কি খেলাফত পুনরুদ্ধারে কামিয়াব হয়েছিলেন? তালিবানরা কি তাদের লক্ষ্য অর্জনে অধিকতর সফলতা অর্জন করবে?

দুনিয়াদারীর হিসেবের অঙ্কে তাদের দুনিয়াদারী পূর্ণ সফলতা না-ও হতে পারে। আল্লাহ আকবার!

আল্লাহ সবকিছু করতে পারেন। তিনি তাঁর নবী ইব্রাহীম (আঃ) ও মুসা (আঃ)-কে সকল প্রতিকূলতার মাঝেও সফলতা দিয়েছিলেন।

ভারত

তালেবানদের হাতে কাবুলের পতনের কিছুক্ষণের মধ্যেই ভারতীয় কূটনীতিকগণ কাবুল ত্যাগ করেন। ভারত খোলাখুলিভাবেই তালিবান বিরোধী।

ডঃ নজিবুল্লাহর স্ত্রী, দু'কন্যা এবং পরিবারবর্গকে ভারত রাজনৈতিক আশ্রয় প্রদান করেছে। তারা আগেও অভিযোগ করেছিলেন যে, আফগান বিদ্রোহীরা অধিকৃত কাশ্মীরে উত্তেজনা সৃষ্টির জন্য কিছুটা দায়ী।

তালেবানদের বিজয়ে ভারত ভীত ও শঙ্কিত। আফগান মুজাহিদগণ মিশর ও কাশ্মীরের মুসলমানদের ইসলামী আন্দোলনের অনুপ্রেরণার উৎস। তালিবানদের সাফল্য ভারতের বিরুদ্ধে কাশ্মীরীদেরকে উৎসাহিত এবং প্রত্যয়ী করে তুলতে পারে। এতে অশান্ত কাশ্মীর আরো অশান্ত হয়ে উঠতে পারে।

ইরান, ভারত, রাশিয়া প্রকাশ্য এবং খোলাখুলিভাবে বিভিন্ন কারণে তালেবানদের সমালোচনা করেছে। ভারত, ইরান, রাশিয়া এবং তার মিত্রদের আফগানিস্তানে বিবাদমান পক্ষগুলোর মধ্যে রব্বানী-মাসুদ জোটের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়াই অনেকটা স্বাভাবিক।

আফগানিস্তান এবং তালেবানদের সম্পর্কে রাশিয়া, ইরান, ভারত, তুর্কমিনিস্তান, উজবেকিস্তানে কিরঘিজিস্তান, কাজাকিস্তান ও তাজিকিস্তানের নীতি একইরূপ হবে বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা।

(Far Eastern Economic Review, October-10, 1996).

এ ধারণা বাস্তব বিবর্জিত এবং ভুল হওয়ার কারণ স্বল্প। তালেবানদের তাওয়াক্কুল এবং ইখলাস আছে, কিন্তু কূটনীতি এবং হেকমত তারা অনুসরণ করে না। হেকমত ছাড়া বর্তমান দুনিয়ায় বন্ধু পাওয়া খুবই কষ্টকর। ১৯৯৬ সনের ২৭শে সেপ্টেম্বর কাবুল দখল এবং আফগানিস্তানের তিন চতুর্থাংশ তালিবান সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকলেও দুনিয়ার মুসলিম অথবা অমুসলিম একটি রাষ্ট্রও তালিবান সরকারকে স্বীকৃতি দেয়নি।

২৯

স্বনির্ভরতা, পরমত সহিষ্ণুতা এবং সমঝোতা

আর্থিক নির্ভরতা

সমগ্র আফগানিস্তানব্যাপী বিস্তৃত রয়েছে হিন্দুকোশ, সোলাইমান, তুর্কীস্তান পেয়ারাপোমিসার্স প্রভৃতি পর্বতমালার শাখা প্রশাখা এবং মালভূমি। পার্বত্য এলাকার প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য হলো ফল। সমভূমিতে শষ্য উৎপাদনের পরিমাণ সীমিত। খনিজ সম্পদ লুকিয়ে আছে গীরিকন্দরে। এ সম্পদ আহরণের জ্ঞান অতীতে আর্ফগানদের ছিল না। এখনো উন্নীত হয়নি। ফলে ইতিহাসের কোন অধ্যায়েই আফগানিস্তান আর্থিক দিক দিয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল না।

পৃথক রাষ্ট্র হির্সেবে নয়, অন্য একটি রাষ্ট্রের সম্পূরক প্রদেশ হিসেবে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল আফগানিস্তান। সম্পদের অপ্রতুলতা হেতু একটি পৃথক রাষ্ট্র হিসেবে অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য প্রতিরক্ষা, আইন শৃঙ্খলা রক্ষা, প্রশাসন ইত্যাদির ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থ সরবরাহ করা ছিল দরিদ্র জনগণের পক্ষে কঠিন। বৈদেশিক অর্থ ব্যতীত রাষ্ট্রীয় অস্তিত্ব বজায় রাখা আফগানিস্তানের জন্য ছিল দুরূহ। জাতীয় অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার ঐতিহ্য আফগানিস্তানে গড়ে উঠেনি।

পেশাদার সৈনিক

পার্বত্য এলাকা বলে কঠোর পরিশ্রমী, সুস্বাস্থ্যবান' এবং সাহাসী যোদ্ধা হিসেবে আফগানগণ বিজেতাদের পছন্দনীয় ছিল। আফগানিস্তানের উপর দিয়ে বহু বিজয়ী বাহিনী চলাচল করেছে। বিজয়ীদের সেনা বাহিনীতে যোগ দিয়ে সক্ষম আফগান যুবাবৃদ্ধ বিজিত সম্পদের অংশ পেয়েছে। বৃহৎ রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্র নায়কদের সৈন্য সংগ্রহের কেন্দ্র ছিল আফগানিস্তান।

কোন দেশবিদেশের সেনাবাহিনীতে কাজ করার সুযোগ না পেলে জনগণ নিজেদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে অতি তুচ্ছ কারণে লিপ্ত হয়। অর্থনৈতিক উন্নয়নের কর্মসূচী আফগানিস্তানে গৃহীত হয়নি।

সহিষ্ণুতা ও সমঝোতা

ইউরোপীয় আফগান বন্ধুদের নীতি ছিল আফগানদেরকে দারিদ্র্যের মধ্যে রেখে আইনহীনতা, ব্যক্তিগত অহংকারবোধ, গোত্রীয় স্বাতন্ত্র্য, ধর্মীয় অনুভূতির

মধ্যে বিকশিত হওয়ার সুযোগ দেয়া। বিদেশী সাহায্য না পেলে আফগানগণ চরম দারিদ্র্য, বস্ত্রহীনতা, পুষ্টিহীনতার মধ্যেই গড়ে উঠতো।

নাদির শাহ, আহমদ শাহ দুররানী এবং সুলতান মাহমুদ ছিলেন আফগানদের জাতীয় বীর এবং রাজন। তারা ভিন্ন রাষ্ট্র জয় করে বিজিত সম্পদের মাধ্যমে দেশের সমৃদ্ধি ঘটিয়েছিলেন। বিজয়ী রাজার অভাব ঘটলে আফগান অর্থনৈতিক জীবনে নেমে এসেছে দারিদ্য এবং মন্দা।

বৃহৎ সমাজ এবং রাষ্ট্রের অংশভূক্ত ছিল না বলে আফগানদের পক্ষে বৃহত্তর প্রেক্ষিতে ব্যক্তিগত অভিমত ও চিন্তা চেতনায় অন্যের সঙ্গে আপোষকারী হওয়া কঠিন হয়ে পড়ে।

নিজেদের পৃথক এবং স্বতন্ত্র রাষ্ট্র ছিল না বলে রাষ্ট্রের জন্য ত্যাগ, তীতিক্ষা, পরমতসহিষ্ণুতা, দেশের জন্যে ব্যক্তিগত মত এবং স্বার্থ কোরবানীর ঐতিহ্য দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত হয়নি।

ভারতের শের শাহ সুরী বংশ এবং লোদী বংশের সুলতানগণ ছিলেন আফগান। সমগ্র আফগান ইতিহাসে আহমদ শাহ আবদালী ভিন্ন অন্য কোন উল্লেখযোগ্য স্বাধীন, প্রাজ্ঞ, প্রশাসক দেখা যায় না। অন্যান্য আফগান রাজগণ আফগানী হলেও আফগান ভূমি-পুত্র ছিলেন না। তারা ছিলেন ইরানিয়ান, তুর্কী, মোঙ্গল বা অন্য কোন জাতের।

নাদির শাহ এবং আবদালি শাহের পূর্বে আফগানদের নিজস্ব স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র ছিল না। তাদের দেশের অংশ বিশেষ কখনো ছিল পারস্য সাম্রাজ্যের অংশ, কখনো মুঘল সাম্রাজ্য, কখনো আরব বা অন্য কোন সাম্রাজ্যের অধীন। বৃহৎ রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্র নায়কদের সৈন্য সংগ্রহ কেন্দ্র ছিল আফগানিস্তান।

জীবন দেয়া এবং জীবন নেয়া, তুচ্ছ বিষয়ে ঝগড়া ফ্যাসাদে লিপ্ত হওয়া এবং পরিণামে অহংবোধের জন্যে কোরবানী দেয়া অন্যতম আফগান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

৩০
তালিবান সরকারের কূটনৈতিক স্বীকৃতি

তালিবান সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জনৈক মুখপাত্র কাবুল থেকে ২৬-০৫-১৯৯৭ তারিখে এক বিবৃতিতে বলেন—'তালিবান সরকার আফগানিস্তানের সমগ্র অংশের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছে। তালিবান সরকারকে দেশের বৈধ সরকার হিসেবে সকলের স্বীকৃতি প্রদান করা উচিত। আমরা কাবুলে দূতাবাস খুলতে সকল রাষ্ট্রকে আহ্বান জানাই। যেসব দেশ

কাবুলে দূতাবাস খুলবে এবং দেশের পুনর্গঠনে সাহায্য করবে; তাদের প্রতি আফগানিস্তানের ইসলামিক সরকার বন্ধুত্বের হস্ত সম্প্রসারিত করবে।'

(এ এফ পি ২৭-০৫-১৯৯৭)

কাবুলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অপর এক বিবৃতিতে বলা হয়— 'আমরা জাতি সংঘ, ইসলামী সম্মেলন সংস্থা, জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন, অর্থনৈতিক সহযোগিতা সংস্থার প্রতি আফগানিস্তানের আসন আমাদের কাছে হস্তান্তরের আহ্বান জানাচ্ছি।

(এ, পি ; এ, এফ, পি - ২৮-০৫-১৯৯৭)

আফগানিস্তানের তালিবান সরকার অন্যান্য দেশের প্রতি আফগানিস্তানের ইসলামী সরকারকে স্বীকৃতি দানের জন্য বারবার আহ্বান জানাচ্ছে। কিন্তু বিশ্ব বিবেক বধির, নির্বাক।

পাকিস্তানের স্বীকৃতি

২৫শে মে, ১৯৯৭ পাকিস্তান সরকার তালিবান সরকারকে কূটনৈতিক স্বীকৃতিদানের ঘোষণা দেন। কূটনৈতিক স্বীকৃতির প্রেক্ষাপট এবং কারণ ব্যাখ্যা করে পাকিস্তানের সাবেক রাষ্ট্রপতি ফিল্ড মার্শাল আয়ুব খানের পুত্র, জাতীয় পরিষদের সাবেক স্পীকার এবং পাকিস্তান সরকারের বর্তমান পররাষ্ট্রমন্ত্রী গওহর আইয়ুব ইসলামাবাদে একটি বিবৃতি দান করেন। এতে বলা হয়েছে, 'সুদীর্ঘ ১৮ বছর যাবত আফগানিস্তানের জনগণ অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্টের মধ্যে তাদের দিনগুলো অতিবাহিত করেছে। এ সময় যুদ্ধবিগ্রহে তাদের দেশটিকে ক্ষত-বিক্ষত দেখতে পেয়েছে। প্রতিবেশী দেশ হিসেবে পাকিস্তানকেও আফগানিস্তানের সংঘাত-সংঘর্ষের প্রত্যাক্ষ পরিণতি ভোগ করতে হয়েছে।

আফগানিস্তানে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠাই হচ্ছে আমাদের নীতির লক্ষ্য। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমরা আফগানিস্তানে এক ব্যাপকভিত্তিক সরকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আন্তঃআফগান সংলাপ অনুষ্ঠানের সকল প্রচেষ্টার প্রতি আমাদের সমর্থন প্রদান করেছি। আফগানিস্তানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করাই হচ্ছে আমাদের নীতি। আমরা সর্বদাই এই নীতি কড়াকড়িভাবে অনুসরণ করেছি। অধিকাংশ দেশের মতই পাকিস্তান সরকার কাবুলের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণকারী বিভিন্ন সরকারের সাথে সম্পর্ক বজায় রেখে চলেছে।'

আফগানিস্তানে বোরহানুদ্দিন রব্বানীর সরকার বহু আগেই তাদের বৈধতা হারিয়েছে এবং কাবুল থেকেও এই সরকার বহিষ্কৃত হয়েছে। দুঃখের বিষয়, এর পরেও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় রব্বানী সরকারের প্রতিই স্বীকৃতি অব্যাহত রাখে। এখন এ অবস্থার পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়েছে।

১৯৯৬ সালের ডিসেম্বরে জাকার্তায় ইসলামী সম্মেলন সংস্থাভুক্ত দেশসমূহের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের একটি সম্মেলন হয়। এ সম্মেলনে রব্বানী সরকারের প্রতিনিধিকে বহিষ্কার করা হয় এবং আফগানিস্তানের আসন শূন্য রাখা হয়। পাকিস্তান সরকার ওআইসি সম্মেলনের এ যুগান্তকারী সিদ্ধান্তের প্রশংসা করেছে।

আফগানিস্তানের উত্তরাঞ্চলের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী থেকে প্রমাণ হয়, উজবেক ও তাজিক অধিনায়করা তাদের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন এবং তালিবান পক্ষে যোগ দিয়েছেন। প্রাপ্ত খবরে জানা গেছে, শিবারগানের পতনের পর তালিবান বাহিনী ও জেনারেল আব্দুল মালিক পাহলোয়ানের বাহিনী সম্মিলিতভাবে মাজার-ই শরীফে প্রবেশে সক্ষম হয়। এ সময় তাদেরকে খুব সামান্যই প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয়েছে। অর্থাৎ রক্তপাত খুবই কম হয়েছে।

বর্তমান আফগানিস্তান সরকার ২৬টি প্রদেশের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেছে এবং আফগানিস্তানের বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীকে নিয়ে যথাযথভাবে এই সরকার গঠিত হয়েছে।

১৯৯৪ সালে আফগানিস্তানের দৃশ্যপটে তালিবানদের অভ্যুদয় ঘটে। তখন থেকে তাদের অগ্রযাত্রা শুরু হয়। আফগান জনগণ তাদের প্রতি ব্যাপক সমর্থন জানাতে থাকে। জনগণ যুদ্ধবাজ নেতাদের অত্যাচারের হাত থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা গোপন করেনি। যুদ্ধবাজ নেতাদের মধ্যকার সংঘর্ষ ও গৃহযুদ্ধে সাধারণ মানুষের জান-মাল, সহায়-সম্পত্তি নিরাপদ ছিল না।

পাকিস্তান সরকার তালিবান বাহিনীর একটি বিবৃতি আগ্রহের সাথে লক্ষ্য করেছে। এতে বলা হয়, তালিবানরা নিরপেক্ষতা বজায় রাখে এবং অন্য দেশের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করার নীতি কড়াকড়িভাবে মেনে চলে এবং তারা তাদের আভ্যন্তরীণ বিষয়েও অন্য দেশের হস্তক্ষেপ কামনা করে না। তালিবান নেতৃত্ব আফগানিস্তানে শান্তি ও স্থিতিশীলতা পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রতি উচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছে এবং আফগানিস্তানে পুনর্বাসন এবং পুনর্গঠনের জন্য আন্তর্জাতিক সহায়তা চেয়েছে।

শান্তিপূর্ণ পন্থায় আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে আফগানিস্তানে যাতে একটি ব্যাপকভিত্তিক সরকার গঠিত হতে পারে, সে জন্য পাকিস্তান এতদিন যাবত নয়া সরকারকে স্বীকৃতি দেয়া স্থগিত রেখেছিল।

আমি আনন্দের সাথে ঘোষণা করি যে, পাকিস্তান সরকার এখন ইসলামী রাষ্ট্র আফগানিস্তানকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

নয়া সরকার স্বীকৃতির সকল শর্ত পূরণ করে। বর্তমানে তালিবান সরকার সে দেশের অধিকাংশ এলাকায় কার্যকর নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেছে। এই সরকারের মধ্যে সে দেশের সকল জাতি-গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব রয়েছে।

এ অঞ্চলে শান্তি ও নিরাপত্তার স্বার্থে ইসলামী রাষ্ট্র আফগানিস্তানের সরকার ও জনগণের সাথে পাকিস্তানের অর্থবহ ও সহযোগিতার সম্পর্ক স্থাপিত হবে। আমি আশা করি, আফগানিস্তানের সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর প্রেক্ষিতে জাতিসংঘ, ওআইসি এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ ও ইসলামী রাষ্ট্র আফগানিস্তানের নয়া সরকারকে স্বীকৃতি দানের ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

সৌদি আরবের স্বীকৃতি

পাকিস্তান কর্তৃক আফগানিস্তানের তালিবান সরকারকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দানের পর দিনই সউদী সরকার তালিবান সরকারকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি প্রদান করে। অন্যান্য রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃতিদান এখন অব্যাহত থাকবে।

সউদী আরব ২৬শে মে, ১৯৯৭ তালিবান সরকারকে স্বীকৃতির ঘোষণা দেয়। জেদ্দায় অনুষ্ঠিত মন্ত্রী পরিষদের বৈঠকের পর সউদী তথ্যমন্ত্রী ফুয়াদ ইবনে আবদুস সালাম আল-ফারসী বলেন 'মন্ত্রী পরিষদের বৈঠকে আফগানিস্তানের ঘটনা প্রবাহ পর্যালোচনার পর সউদী আরব স্বীকৃতি দানের সিদ্ধান্ত নেয়। সউদী সরকার আশা করেন যে, তালিবান সরকার আমাদের ভ্রাতৃপ্রতিম দেশ আফগানিস্তানে শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা, শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা এবং দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক জোরদারে সক্ষম হবেন।

(এএফপি - ২৭-০৫-১৯৯৭ এ পি এ - ২৭-০৫-১৯৯৭ ইনকিলাব ২৮ শে, ১৯৯৭)

সংযুক্ত আরব আমিরাত

সংযুক্ত আরব আমিরাত ২৮শে মে, ১৯৯৭ তালিবান সরকারকে স্বীকৃতি দান করেন।

যুক্তরাষ্ট্র

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র John Dinger 27-05-1997 এক বিবৃতিতে বলেন "We acknowledge that the Taliban now controls much of Afghanistan's territory. We urge the Taliban and other Afghan groups to join together to establish a broadly representative Government that will protect the rights of Afghans.

(AFP 27-5-1997)

যুক্তরাষ্ট্র ২৭শে মে ১৯৯৭ মঙ্গলবার তালিবানদের ব্যাপকভিত্তিক ইসলামী সরকার গঠনের আহ্বান জানায়। এর একটি অর্থ হচ্ছে তালিবানদের প্রতি স্বীকৃতিদানের আহ্বান প্রচ্ছন্নভাবে প্রত্যাখ্যান করা।

বাংলাদেশ

বাংলাদেশ আফগানিস্তান তালিবান সরকারকে বিশেষ স্বীকৃতি দানে ওআইসি-এর সদস্যবৃন্দ বিশেষ করে ইরানের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করছে। বাংলাদেশ ৫২ সদস্য বিশিষ্ট ওআইসি এবং জাতিসংঘের সিদ্ধান্ত অনুসারে স্বীকৃতির প্রশ্নে কার্যকরী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে বলে মনে হয়।

(দৈনিক ইনডিপেনডেন্ট ২৮-০৫-১৯৯৭)

ইরান

ইরান ঘোষণা করে যে, জাতিসংঘ কর্তৃক তালিবান সরকারকে স্বীকৃতি দান পর্যন্ত তারা তালিবানদের স্বীকৃতি দানের জন্যে অপেক্ষা করবে।

সেপ্টেম্বর ১৯৯৬ তালিবান কর্তৃক কাবুল দখলের পর সাবেক প্রেসিডেন্ট বুরহানুদ্দিন রাব্বানী যুদ্ধবাজ জেনারেল আবদুর রশীদ দোস্তাম, শিয়া হেজবে ওয়াহাদাত উপদল এবং হিজবে ইসলামী নেতা গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ারের সঙ্গে বন্ধুতামূলক চুক্তি করেন। এ জোট ইরান, পূর্বশত্রু রাশিয়া এবং ভারতের সমর্থন লাভে সক্ষম হন। তাদের নিকট তালিবান অপেক্ষা দোস্তাম-রব্বানী-মাসুদ জোট অনেক বেশী সহনীয় এবং গ্রহণযোগ্য।

আফগানিস্তানে প্রত্যাখ্যাত হলেও তালিবান বিরোধীগণ বাহির থেকে উড়ে এসে আফগানিস্তানে হস্তক্ষেপের বাসনা যে পোষণ করেন না, তা নয়। আফগানবাসীদের শায়েস্তা করার জন্যে তালিবান বিরোধীদের সাহায্য করে তারা আফগানিস্তানে যুদ্ধ বিগ্রহ জিইয়ে রাখতে পারেন।

ভারতীয় স্বীকৃতি

১৯৯৬ সনের নভেম্বর মাসে ভারতের তদানিন্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইন্দর কুমার গুজরাল ঘোষণা করেন যে, তারা রব্বানী সরকারকেই আফগানিস্তানের বৈধ সরকার বলে স্বীকার করেন।

১৯৯৭ সনের এপ্রিল মাসে ভারতে অনুষ্ঠিত নন এলাইন্ড মুভমেন্ট এবং মন্ত্রী পর্যায়ের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে রব্বানী সরকারের প্রতিনিধিকে আহবান করা হয়।

১৯৯৭ সনের মে মাসে তালিবান সরকারকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দানের প্রশ্নে ভারত কূটনীতির আশ্রয় গ্রহণ করে। ভারত তালিবান সরকারকে স্বীকৃতি দিবে কি না এ প্রশ্নের জবাবে ভারত সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জনৈক মুখপাত্র বলেন—'আমরা রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেই, সরকারকে নয়।' একাধিক সরকার রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির দাবিদার হলে তারা কোন সরকারকে স্বীকৃতি দেবেন ভারতীয় মুখপাত্র তা উল্লেখ করেননি।

১৯৯৬ সনের সেপ্টেম্বর মাসে তালিবান সরকার কর্তৃক কাবুল দখলের পর ভারত সরকার মধ্য এশিয়ায় ইসলামী পুনর্জীবনের সম্ভাবনার উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।

(সিন হুয়া/বয়টার ২৬-০৫-১৯৯৭)

নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত জোট নিরপেক্ষ সম্মেলনে তালিবান সরকারকে আমন্ত্রণ জানান হয়নি অথচ বুরহানুদ্দিন সরকারকে আমন্ত্রণ করা হয়েছে। বুরহানুদ্দিন রব্বানীকে আমন্ত্রণ করা আভ্যন্তরীণ ব্যাপার যদি মনে না করা হয়, তাকে যদি বহিস্থঃ শক্তি মনে করা হয়, তা ভিন্ন কথা।

ওআইসি

ওআইসি সম্মেলনে তালিবান এবং রব্বানী কোন সরকারকে সদস্য হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়নি বরং সদস্য পদ স্থগিত রাখা হয়েছে। এতে সংস্থার কিছুটা নিরপেক্ষতা সূচিত হয়।

রাশিয়া

তালিবান অগ্রযাত্রায় রাশিয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। এক বিবৃতিতে রুশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানায়, সাবেক সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রগুলোতে আফগানিস্তানের এ সংঘাত বিস্তার লাভ করলে তারা হস্তক্ষেপ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে।

রুশ বিবৃতিতে বলা হয়—'রুশ নেতৃবৃন্দ বলেছেন যে, স্বাধীন রাষ্ট্রঃসমূহের কমনওয়েলথের (সিআইএস) সীমানা লংঘন করা হলে সিআইএস-এর যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা চুক্তিকে তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর করা হবে।'

রাশিয়ার এ আশঙ্কা দূর করার জন্য তালিবান পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন—'আমি বিশ্ববাসী ও প্রতিবেশী দেশগুলোকে এ আশ্বাস দিচ্ছি যে, তালিবান সরকার অন্য রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করার নীতিকে কঠোরভাবে মেনে চলছে।'

(বার্তা সংস্থা এপিপি ২৫-০৫-১৯৯৭ ; ইনকিলাব ২৬-০৫-১৯৯৭)

বৃহৎ এবং প্রতিবেশী শক্তিবর্গ ঘোষণা করে থাকেন যে, তারা আফগানিস্তানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবেন না এবং অন্যদেরকেও তা না করার জন্যে আবেদন জানান। অথচ তাদের কর্মকাণ্ড এ আবেদনের বিপরীত।

দশ জাতিভুক্ত অর্থনৈতিক সহযোগিতা সংস্থা

বিগত ১৩-০৫-১৯৯৭ এবং ১৪-০৫-১৯৯৭ মঙ্গল ও বুধবার তুর্কমেনিস্তানের রাজধানী আশকাবাদে দশ জাতিভুক্ত আঞ্চলিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা সংস্থা (Economic Co-operation Organization) এর দু'দিন ব্যাপী শীর্ষ সম্মেলন হয়। এতে বুরহারদ্দিন রব্বানীকে আহ্বান করা হয় এবং তালিবান সরকারকে যোগদানের আমন্ত্রণ না জানাবার কারণে প্রতিবাদ সত্ত্বেও তালিবান সরকারকে আহ্বান জানান হয়নি। যদি বুরহানুদ্দিন রব্বানী এবং তালিবান সরকার কাউকে সম্মেলনে আমন্ত্রণ জানান না হতো, তবে বলা যেতো যে প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহ নিরপেক্ষ। কিন্তু এক পক্ষকে নিমন্ত্রণ করা হলে প্রতিবেশী শক্তিকে নিরপেক্ষ বলা যায় না।

যদিও আফগানিস্তানের তথাকথিত বন্ধুবর্গ আফগানিস্তানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার কথা সব সময়ই বলে আসছেন, কিন্তু তালিবান বিরোধী হস্তক্ষেপ সফল হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে তাদের হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা যে পুরো মাত্রায় রয়েছে, তা বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে।

১৯৯৬ সালের নভেম্বর মাসে তাসখন্দে এক শীর্ষ সম্মেলনে রুশ জেনারেল আলেকজান্ডার লেবেদ (রুশ নিরাপত্তা পরিষদের সাবেক প্রধান) তালিবানরা যাতে আক্সাস নদী অতিক্রম না করতে পারে, সে জন্য দোস্তামকে সামরিক সমর্থন দেয়ার জন্য মধ্য এশিয়ার দেশগুলোর প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন। আক্সাস নদী সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত মধ্য এশীয় রাষ্ট্রগুলো থেকে আফগানিস্তানকে বিভক্ত করে রেখেছে।

(ইনকিলাব ২৩-০৫-১৯৯৭ and Asia Times)

কোন দেশে একাধিক সরকার থাকলে বিদেশী রাষ্ট্রসমূহে সে দেশের বৃহত্তর অংশ এবং রাজধানী যে সরকারের দখলে থাকে, তাকেই স্বীকৃতি দিয়ে থাকে। শুধুমাত্রা তালিবান সরকারকে স্বীকৃতি দানের ক্ষেত্রে দেখা যায় বিশ্ব বিবেকের অস্বাভাবিক বিকৃতি।

৩১

তালিবান বিজয়ের শেষ বাঁকে

শীতের মৌসুমে হিন্দুকুশ পর্বত বরফে ঢাকা থাকার কারণে ১৯৯৬ সনের ডিসেম্বর হতে ১৯৯৭ সনের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত উত্তর আফগানিস্তানে তালিবান অগ্রযাত্রা কিছুটা স্থিমিত হয়ে পড়ে। ১৯৯৭ সনের ফেব্রুয়ারী মাসের পর থেকে দোস্তামের এলাকায় তালিবানদের চাপ বাড়তে থাকে।

কাবুল, কান্দাহার, জালালাবাদ এবং হেকমতিয়ারের ঘাঁটি জাবালুস সিরাজ ইত্যাদি দখল করতে অস্ত্র বা রক্ত বেশী খরচ করতে হয়নি। তালিবানদের আচার-আচরণ, জীবনযাত্রা, নিষ্ঠা, ইখলাস দেখা বা জানার পর বিরোধী দলের সেনারা তাদের মুখোমুখী হলেই দুর্বল হয়ে পড়েন। প্রায় স্থানেই দেখা গেছে যে, মুজাহিদ সৈন্যগণ বিনা যুদ্ধেই তালিবানদের পথ ছেড়ে দিয়েছেন।

জেনারেল আব্দুর রশীদ দোস্তাম ভাবলেন, তার অঞ্চলেও তালিবানদের বিনা যুদ্ধে রাজ্য জয়ের ধারা অব্যাহত থাকতে পারে। তাই তিনি যারা স্বপক্ষ ত্যাগ করতে পারেন বলে ভয় করেছেন, তাদেরকে অপসারণের বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করেন।

সাদ্দাম হোসেনের ন্যায় আবদুর রশীদ দোস্তাম তার সন্দেহভাজন জেনারেলদের গুপ্তহত্যার মাধ্যমে অপসারণের নীতিও অনুসরণ করেন। অনেককেই দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত করে মৃত্যুদন্ড দান করেন। এতে তার সেনাপতিগণও ভীত হয়ে পড়েন।

সাবেক উজবেক জেনারেল আবদুল মালিক পাহলোয়ানের ভীতির কারণ ছিল আরো বেশী। কারণ তার ভাই জেনারেল রাসুল পাহলোয়ানকে দোস্তাম ১৯৯৬ সনের গুপ্তঘাতকের মাধ্যমে হত্যা করান। তার সঙ্গে দোস্তামের মতপার্থক্য এবং নীতিগত বিরোধিতা ছিল।

আব্দুল মালিক ভয় পেলেন যে, ভ্রাতৃস্নেহে দুর্বল সন্দেহে বিনা দোষে দোস্তামের বজ্রপাত তার মাথার উপরও নিপতিত হতে পারে। বিন্দুমাত্র ত্রুটি বা ভুলের জন্যে তার পরিণতিও ভাই-এর মত হতে পারে। তিনি তার সেনাকমান্ডার এবং আত্মীয় গুল মোহাম্মদ পাহলোয়ানের সঙ্গে পরামর্শ করে তালিবান পক্ষে যোগ দেয়ার সিদ্ধান্ত নেন।

গুল মোহাম্মদ পাহলোয়ান তালিবান পক্ষ সমর্থনের শপথ নিয়ে সেটেলাইট টেলিফোনে তালিবান কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং দোস্তামবাহিনীর বিরুদ্ধে জেহাদের ঘোষণা দেন। আতঙ্কগ্রস্থ দোস্তামের বাহিনীর এক অংশকে গ্রেফতার করে তালিবান বাহিনীর নিকট সমর্পণ করে তালিবানদের আস্থাভাজন হন। বন্দীদেরকে তিনি কান্দাহারে পাঠিয়ে দেন।

তালিবান সরকার দোস্তাম ছাড়া অন্যান্য আত্মসমর্পণকারী সৈন্যদের জন্যে সাধারণ ক্ষমা এবং গ্রেফতারকারীদের ইসলামী আদালতে বিচার করা হবে বলে ঘোষণা দেন। এতে দোস্তাম বাহিনীর সেনারা মনে করে যে, আত্মসমর্পণ করে সাধারণ ক্ষমার সুযোগ গ্রহণ করাই ইসলাম শরীয়তের আদালতে শাস্তি পেয়ে জাহান্নামে যাওয়া অপেক্ষা অনেক ভালো।

জেনারেল আবদুল মালিক পাহলোয়ান

১৯শে মে ১৯৯৭ সোমবার দোস্তাম-রব্বানী জোট ত্যাগ করে জেনারেল আবদুর রশীদ দোস্তামের ঘনিষ্ট সহকর্মী এবং জেনারেল আবদুল মালিক পাহলোয়ান তালিবানদের স্বপক্ষে তার পক্ষে গণ সমক্ষে ঘোষণা করেন এবং সেনাবাহিনীসহ তালিবানদের পক্ষে যোগ দেন।

স্বপক্ষ ত্যাগের কারণ সম্পর্ক জেনারেল আবদুল মালিক বলেন, জাতীয় ঐক্যের খাতিরেই তিনি আবদুর রশীদ দোস্তামের বিরুদ্ধে গমন করেন। তিনি ঘোষণা করেন, দু'টি প্রদেশের নিয়ন্ত্রণ তার হাতেই আছে। তিনি দোস্তাম বাহিনীর পাঁচ হাজার সৈনিককে বন্দী করেছেন বলেও দাবী করেন ।

তালিবান সরকারের অস্থায়ী তথ্য ও সংস্কৃতিমন্ত্রী আমীর খান মুক্তাকী ২০শে মে ১৯৯৭ কাবুলে এক সরকারী সম্মেলনে ঘোষণা করেন। জেনারেল আবদুল মালিকের সেনাবাহিনীকে ইসলামী সেনাবাহিনীর অন্তভুক্ত করা হয়েছে। ফারিয়াব প্রদেশের রাজধানী মায়মানা শহরে তালিবান এবং উজবেক সৈন্যদের উপস্থিতি লক্ষণীয় হয়ে ওঠে।

ফারিয়াব প্রদেশ দখল

তালিবান বাহিনী ১৯শে মে ১৯৯৭ ফারিয়ার প্রদেশের রাজধানী মায়মানায় প্রবেশ করে। জনতা ফারিয়াব প্রদশে তালিবানদের সাদা পতাকা উড়িয়ে দেয়। ফারিয়ার প্রদেশ ছিল জেনারেল আবদুল মালিকের প্রভাবাধীন এবং মাজার-ই-শরীফের পথে প্রধান ঘাঁটি। মাজার-ই শরীফ আক্রমণ করতে হলে ফারিয়াব প্রদেশে রাজধানী মায়মানা হয়েই যেতে হয়। ফারিযাবের পতনের ফলে তালিবানদের পক্ষে মাজার-ই শরীফ আক্রমণ করা খুবই সহজ হয়।

শেবির পাশ, বাদগিস ও সার-ই পুল প্রদেশ দখল

সালাঙ পাশ-এর ন্যায় মাজার-ই শরীফের পথে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ গিরিপথ হলো শেবির পাশ। ফারিয়াব প্রদেশে ৬ মাসের বেশী সময় তালিবান বাহিনী জেনারেল আবদুল মালিক পাহলোয়ান এবং শিয়া হেজবে ওয়াহদাত নেতা ইসমাইল খান তীব্র লড়াইয়ে রিত ছিল। প্রায় ৭-৮ মাস যাবত যুদ্ধ করে তালিবান বাহিনী বাদগিস প্রদেশের অর্ধেক দখল করে নিয়েছিল।

জেনারেল আবদুল মালিকের স্বপক্ষ ত্যাগের ঘোষণার সাথে সাথেই বাদগিস প্রদেশের প্রতিরক্ষা ব্যূহ ভেঙ্গে পড়ে। তালিবান বাহিনী স্বল্প চেষ্টায় বাদঘিস প্রদেশের বাকী অর্ধেক দখল করে নেয়। ১৯শে মে সোমবার তালিবান বাহিনীর অগ্রযাত্রার পক্ষে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিবস।

ফারিয়াব প্রদেশে শেবির পাশের নিয়ন্ত্রণ ছিল শিয়াপন্থী হিজবে ওয়াহাফাত গ্রুপের হাতে। তাদের সঙ্গে তালিবান বাহিনীর প্রচণ্ডতম সংঘর্ষ ঘটে। এতে শতাধিক লোক নিহত এবং শত শত আহত হয়। ফারিয়াব প্রদেশ এবং শেরির পাশ তালিবান হাতে এসে যাওয়ায় হেরাতের সাবেক গভর্নর ইসমাইল খানের পক্ষে পলায়ন কষ্টকর হয়ে ওঠে। ১৯শে মে, ১৯৯৭ সোমবার তিনি বাদগিশ প্রদেশে তালিবান বাহিনী কর্তৃক গ্রেফতার হন। তালিবানগণ ইসমাইল খানের কয়েক হাজার সৈন্যকে গ্রেফতার করে।

রাজধানী মায়মানাসহ ফারিযাব প্রদেশ, সার-ই পুল প্রদেশ, বাদগিস প্রদেশ দখল করে তালিবান এবং জেনারেল মালিক বাহিনী কর্তৃক দোস্তাম বাহিনীকে নিরস্ত্র করা হয়। মাজার-ই-শরীফের দিকে তালিবান বাহিনীর অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকে।

সেনাসদর দপ্তর শেবেরগণের পতন

জেনারেল আবদুল মালিকের স্বপক্ষ ত্যাগের ফলে আব্দুর রশীদ দোস্তামের মনোবল ভেঙ্গে যায়। তিনি পলায়নের বিষয় চিন্তা করতে থাকেন। ১৯শে মে, ১৯৯৭ ফারিয়াব সার-ই পুল, বাদগিস প্রদেশ তালিবান হস্তে পতিত হওয়ার পর জেনারেল দোস্তাম ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে তার নিজ শহর এবং সেনাবাহিনীর সদর দফতর শেবেরগানে চলে যান। এ শহরটি বলখ-এর লাগ পশ্চিমে জাউজান প্রদেশে অবস্থিত। শেবেরগানের চারদিকে রক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়। দোস্তাম শেবারগনের একটি রেস্ট হাউজে আশ্রয় নিয়েছেন বলেও খবর বের হয়।

১৯শে মে মায়মানা ফারিয়াব প্রদেশের রাজধানী পতনের ৫ দিন পর ২৪ মে, ১৯৯৭ শনিবার কাবুল হতে ৮০ মাইল পশ্চিমে সেনাসদর দফতর

শেবেরগনের পতন ঘটে। শেবেরগনের পতনের পর বলখ প্রদেশের যুদ্ধবাজ নেতা আবদুর রশীদ দোস্তাম পলায়ন করেন।

শেবেরগণ পতনের পর মাজার-ই শরীফের জনগণের মধ্যে উল্লাস সৃষ্টি হয় এবং দোস্তাম বাহিনীর মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

মাজার-ই শরীফের জনগণ ভয় করে যে, সেনাসদর দপ্তর তালিবান দখলের পর দোস্তাম সেনারা মাজার-ই শরীফকে তাদের শেষ ঘাঁটি বানাবার চেষ্টা করবে। তাতে যুদ্ধ নগরীতে ছড়িয়ে পড়বে। তাই জনগণ স্বতঃ প্রবৃত্ত হয়ে মাজার-ই শরীফের রাস্তায় রাস্তায় বেরিকেড এবং প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

তিনটি সামরিক বিমানের ডিফেকশান

শেবেরগান পতনের পর দোস্তামের বিমান বাহিনীর তিনজন সিনিয়র পাইলট ইউসুফ শাহ, আবদুল হাফিজ এবং আব্দুল জলিল স্বপক্ষ ত্যাগ করে তালিবান পক্ষে যোগ দেন।

মাজার-ই শরীফ বিমান ঘাঁটি হতে পাইলট জেনারেল আবুল হাফিজ এবং আবদুল জলিল তাদের বিমান নিয়ে ফারিয়াব প্রদেশের রাজধানী মাইমানায় অবতরণ করেন। পস্তুভাষী ইউসুফ শাহ তার এল-৩৯ জঙ্গী বিমানটি নিয়ে কান্দাহারে চলে আসেন। আসার পথে তিনি জাউজান প্রদেশের সেনাসদর দপ্তর সেবেরগান বিমানঘাঁটিতে কয়েকটি বোমা বর্ষণ করেন। কিন্তু আতঙ্কগ্রস্ত বিমানঘাঁটি রক্ষীরা কোন বিমান বিধ্বংসী কামান দাগেনি।

কান্দাহারে তালিবান সদর দফতরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ইউসুফ শাহ তার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন এবং বলেন—'তাজিক, উজবেক, এবং অন্যান্য গোষ্ঠির লোকজন উত্তরাঞ্চলে তালিবান বিজয়ের অপেক্ষায় আছেন।'

(এ পি, এ এফ পি ২৪-০৫-১৯৯৭) ইনকিলাব ২৫-০৫-১৯৯৭)

কুন্দুজ প্রদেশের পতন

২৪শে মে শনিবার মাজার-ই শরীফ পতনের পরদিনই ২৫শে মে, ১৯৯৭ রবিবার তালিবানগণ কুন্দুজ শহর দখল করে। তালিবান সৈনিক প্রদেশের সর্বত্র যেখানে প্রবেশ করতে পেরেছে সর্বত্র তারা স্থানীয় জনগণের মোবারকবাদ পান। পুরো প্রদেশটি বিনা যুদ্ধে তালিবান দখলে এসে যায়।

(এ, পি, এ, এফ, পি, রয়টার, বিবিসি ২৫-০৬-১৯৯৭)

মাজার-ই শরীফ

দোস্তামের পলায়নের খবর শোনার পরই মাজার-ই শরীফের জনগণ তালিবানদের সাদা পতাকা তাদের নগরীতে উত্তোলন করেন। নিকটস্থ তালিবান সেনারা বিনা বাধায় মাজার-ই শরীফে প্রবেশ করে।

২৪শে মে ১৯৯৭ শনিবার দোস্তামের নিজের শহর এবং সেনা সদর দপ্তরের শেবেরখানের পতনের খবর মাজার-ই শরীফে পৌঁছার কয়েক ঘন্টার মধ্যেই মাজার-ই শরীফ তালিবান দখলে এসে যায়।

২৫শে ১৯৯৭ রবিবার প্রায় ২৫০০ তালিবান যোদ্ধা মাজার-ই শরীফে প্রবেশ করে। মাজার-ই শরীফ প্রথম দখল করে উজবেক সেনাপতি জেনারেল আবদুল মালিক পাহলোয়ানের সৈন্যদল।

দলে দলে সেনাদের আত্মসমর্পন

তালিবান নেতা মোল্লা মুহাম্মদ উমর বিরোধী নেতাদের প্রতি আত্মসমর্পণের আহবান জানান। অন্যথায় তারা ইসলামী বিধানমতে বিচারের সম্মুখীন হবেন ঘোষণা করেন। যারা স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করবে, তারা কোন শাস্তির সম্মুখীন হবেন না এবং তাদের জানমালের হেফাজত করা হবে। যাদেরকে বন্দী করা হবে তাদের বিচার হবে বলে ঘোষণা দেয়া হয়।

মোল্লা উমর বিরোধী নেতা আবদুর রশীদ দোস্তাম এবং আহমদ শাহ মাসুদকে আফগানিস্তানের রক্তক্ষয় বন্ধ এবং জনগণকে ধোঁকা না দেয়ার আহবান জানান। তালিবান নেতা ঘোষণা করেন যে, তারা রক্ত ক্ষয় বন্ধ না করলে এবং জনগণের তহবিল অপচয় করতে থাকলে ইসলামী আদালতে তাদের বিচার হবে।

মোল্লা উমর প্রতিবেশী দেশগুলোকে আফগানিস্তানের আভ্যন্তরীণ বিষয় থেকে দূরে থাকার আহবান জানান।

(ইনকিলাব ২১/০৫/৯৭ ইং)

কৌশলগত সালাঙ্গ সুড়ঙ্গ পথ

২৫শে মে, ১৯৯৭ রাতের বেলা তালিবান যোদ্ধারা কৌশলগত সালাঙ সুরঙ্গ পথ দখল করে নেয়। কাবুল হতে উত্তর আফগানিস্তান এবং মধ্য এশিয়ায় যোগাযোগের মহা সড়ক পথে এ সুরঙ্গ পথটি অবস্থিত।

(সিনহুয়া/রয়টার ঃ ইনকিলাব ২৭-০৫-১৯৯৭)

কয়েক মাস আগে তালিবান অগ্রযাত্রায় ভীত হয়ে রব্বানী-দোস্তাম সরকার হিন্দুকুশ পর্বতের পাথর কেটে তৈরী এ সুরঙ্গ পথটি ডিনামাইট ফাটিয়ে পাথর গুঁড়িয়ে বন্ধ করে দেয়।

তাখার প্রদেশ দখল

বুরহানুদ্দিন রব্বানীর প্রধান ঘাঁটি ছিল উত্তরাঞ্চলের তাখার প্রদেশ। তালিবানগণ ২৬শে মে, ১৯৯৭ তাখার দখল করে নেয়। তালিবান মুখপাত্র ওয়াকিল আহমদ এক বিবৃতিতে ২৭শে মে, ১৯৯৭ কাবুলে বলেন, তাখারের অধিকাংশ জনতা রব্বানীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে এবং তারা ঘরবাড়ীর উপর তালিবানদের সাদা পতাকা উড়িয়ে তালিবানদের খোশআহমেদ জানিয়েছে। বিনা যুদ্ধে এবং বিনা বাধায় রব্বানী সরকারের প্রধান নগরী তালিবানদের দখলে এসে যায়।

রব্বানী ও দোস্তামের পলায়ন

বলখ প্রদেশের রাজধানী এবং যুদ্ধবাজ জেনারেল আবদুর রশীদ দোস্তামের প্রধান ঘাঁটি মাজার-ই শরীফের পতনের পর বুরহানুদ্দিন রব্বানী প্রথমে তাজিকিস্তানের রাজধানী দুশানবে পলায়ন করেন। তথা হতে তিনি ইরান চলে যান।

(এ পি/রয়টার ২৭-০৫-১৯৯৭ দৈনিক ইনকিলাব ২৮-০৫-১৯৯৭ ইন্টার ফ্যাক্স নিউজ এজেন্সী ২৭-০৫-১৯৯৭)

আহমদ শাহ মাসুদ

আবদুর রশীদ দোস্তাম তুরস্কে (২৫-০৫-১৯৯৭) এবং বুরহানুদ্দিন রব্বানী দুশানবে হয়ে ইরানে পালিয়ে গেলে তার প্রতিরক্ষামন্ত্রী আহমদ শাহ মাসুদ পানশির উপত্যকায় অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন। তিনি ২৭শে মে ১৯৯৭ মঙ্গলবার ওয়ারলেসের মাধ্যমে তালিবান নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে বলেন, তিনি তালিবান সরকারের প্রতিরক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে শান্তি আলোচনায় বসতে রাজী আছেন। তালিবান প্রধান মোল্লা উমর সঙ্গে সঙ্গেই এ প্রস্তাবে রাজী হন।

তালিবান প্রতিরক্ষামন্ত্রী মোল্লা ওবায়দুল্লাহকে আহমদ শাহ মাসুদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেন।

তালিবান মুখপাত্র ওয়াকিল আহমদ কাবুলে বলেন—'শান্তি আলোচনা যথাশীঘ্র সম্ভব শুরু হবে, আশা করা যায়। আমাদের প্রতিরক্ষামন্ত্রী দু'একদিনের মধ্যেই আলাপ-আলোচনা শুরু করবেন।'

আহমদ শাহ মাসুদ এ শান্তি আলোচনার পূর্বে কোন শর্ত আরোপ করেননি। তবে তিনি শান্তির প্রস্তাব দিয়েই তালিবানদের প্রতি আঘাত হানতে সব প্রস্তুতি খতম করেন। পানশির উপত্যকা এবং চারিখার প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে তিনি আকস্মিক আক্রমণ পরিচালনা করেন।

জেনারেল আব্দুল মালিকের পৃষ্ঠপ্রদর্শন

জেনারেল আবদুর রশীদ দোস্তাম কম্যুনিস্ট পক্ষ ত্যাগ করে মুজাহেদীন পক্ষে যোগ দিয়েও বলখ প্রদেশ এবং মাজার-ই শরীফে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। জেনারেল আব্দুল মালিক পাহলোয়ান আশা করেছিলেন তালিবান সরকারের আনুগত্য স্বীকার করার পর তিনিই উত্তরাঞ্চলের ক্ষমতায় থাকবেন। কিন্তু তালিবান সরকার তা না করে মোল্লা আব্দুর রাজ্জাককে বলখ প্রদেশ এবং উত্তরাঞ্চলের আমীর নিযুক্ত করেন। দ্বিতীয়তঃ জেনারেল আব্দুল মালিকের উজবেক বাহিনীকে নিরস্ত্র করার প্রক্রিয়াও সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয়।

একজন সেনাকে নিরস্ত্র করা বা এমন দায়িত্ব দেয়া যেখানে সে অস্ত্র ধরতে পারবে না তা অপমানের সামিল। অপমানটা বস্ত্র পরিহিতকে বিবস্ত্র করার কাছাকাছি। সাধারণতঃ বিদ্রোহী বা অপরাধী বা অবিশ্বস্ত সেনাদেরকে নিরস্ত্র করা হয়। এ দুটো হুকুম একসঙ্গে জারি হওয়ার জেনারেল আব্দুল মালিকের নেতৃত্বে উজবেক বাহিনী তালিবানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে ২৭শে মে, ১৯৯৭ মঙ্গলবার অপরাহ্ন থেকে।

প্রায় আড়াই হাজার তালিবান মাজার-ই শরীফে পৌঁছেছিল। তাদের পক্ষে বিরাট উজবেক বাহিনীর বিদ্রোহ সঙ্গে সঙ্গে দমন করা কঠিন। উজবেক সেনাবাহিনীকে নিরস্ত্র করার সিদ্ধান্ত মাজার-ই শরীফের সাধারণ জনতার উপরও বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। আবদুর রশীদ দোস্তাম এবং তার সঙ্গীগণ পলায়নের সময় অস্ত্রাগারের অস্ত্রশস্ত্র সমর্থক জনতার নিকট বিতরণ করে যান।

তালিবান বাহিনী যেখানেই তাদের প্রশাসন কায়েম করেছে তারা জনতার নিকট থেকে অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার করেছে। মাজার-ই শরীফে তা করতে গিয়ে তালিবান বাহিনী অস্ত্রধারী উজবেক জনতার রুদ্ররোষে পরিণত হয়। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে প্রাচীন উজবেক-পস্তু গোত্রীয় বিরোধের অতীত স্মৃতি।

তালিবান বিরোধী বিদ্রোহ বা রায়টে উভয় পক্ষে শতাধিক ব্যক্তি নিহত হয়েছে। বিনা রক্তপাতে এবং জন সমর্থনে ক্ষমতা দখলই তালিবান নেতা মোল্লা

মোহাম্মদ উমরের নীতি। কাবুল, কান্দাহার, জালালাবাদ, হেরাত, জাবালুস ও সিরাজ ইত্যাদি তালিবান কর্তৃক দখলের সময় তাই দেখা গেছে। তালিবান যেভাবে সর্বনিম্ন রক্তপাত বা বিনা রক্তপাতে নগরীর পর নগরী দখল করেছে, এরূপ ঘটনা আধুনিক ইতিহাসে বিরল।

মাজার-ই শরীফে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে লিপ্ত না হয়ে তালিবান বাহিনী নিকটবর্তী শহর পুল-ই খুমরীতে জমায়েত হওয়ার চেষ্টা করছে। নিকটবর্তী প্রদেশসমূহে তালিবান প্রশাসনের সুবাতাস প্রবাহিত হওয়া শুরু হলে মাজার-ই শরীফ অচিরে পুনরায় তালিবান দখলে এসে যাবে আশা করা যায়।

এদিকে আবদুর রশীদ দোস্তাম জেনারেল আব্দুল মালিকের নিকট প্রস্তাব পাঠিয়েছেন পুনরায় একযোগে কাজ করার জন্যে। তালিবান সরকার এতো নিবেদিত প্রাণ যে, সকল বিরোধী শক্তি এক জোট হলেও তাদের শেষরক্ষা হবে না। আফগানে ইসলামী হুকুমাত কায়েম হবে হবেই ইন্‌শা আল্লাহ!

খেলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য তিনটি পর্যায়

১. দাওয়াতে দ্বীন।

২. শক্তি সঞ্চয় না হওয়া পর্যন্ত হয়রত বেলাল ও হযরত খাব্বাব (রাঃ)-দের মতো ধৈর্যের সাথে কাজ করে যাওয়া।

৩. শক্তি ও কেন্দ্র হওয়ার পর বাতিলের বিরুদ্ধে লড়াই করা।

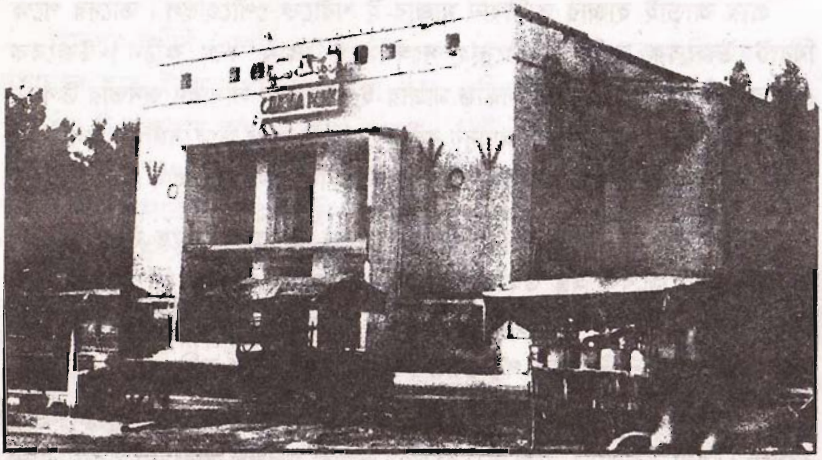

কাবুলের সেকালের সিনেমা হল বর্তমানে সমাজসেবা কার্যালয়

আফগানিস্তান ও তালিবান

এ.জেড.এম.শামসুল আলম